lQe¡l ¢nÒf…Z

h¢ˆjQ¾c Q--¡f¡dÉ¡u

লেখক পরিচিতি

২৬ জুন, ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেদিনীপুর স্কুল, হুগলি কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে লেখাপড়া করেন। ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাস করেন।

কর্মজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। কবি ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়। সরকারি চাকরিতে ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। তিনি ইংরেজিতে উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। তবে খুব তাড়াতাড়িই তাঁর সাহিত্যচর্চা বাংলা ভাষাতে ফিরে আসে। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়।

তাঁর প্রধান রচনাবলী হচ্ছে-

উপন্যাস : দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৯৬৬), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাজসিংহ (১৮৮৮), দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), আনন্দমঠ (১৮৮২)।

সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অবদান ভাষার ক্ষেত্রে। বাংলা গদ্যকে তিনি জড়তা থেকে মুক্ত করে গতিশীল ও সুষমামণ্ডিত করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) নামে একটি বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

৮ এপ্রিল ১৮৯৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ পরিচিতি

'রচনার শিল্পগুণ' বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাবিষয়ক চিন্তা সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। রচনা কীভাবে শিল্পসম্মত হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে লেখক তাঁর মতামত রেখেছেন।

রচনার দুটি প্রধান গুণ - অর্থব্যক্তি ও প্রাঞ্জলতা। লেখক রচনা করেন পাঠককে লক্ষ করে। পাঠকের জন্য অর্থব্যক্তি বা শব্দচয়ন এমন হতে হবে যা পাঠক বুঝতে পারেন। একইভাবে প্রাঞ্জলতা হচ্ছে - যা সহজে বোঝা যায়। রচনাটি পাঠক বুঝতে পারলেই লেখকের রচনা সার্থক।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি -

- রচনার উদ্দেশ্য লিখতে পারবেন।
- রচনায় শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- শব্দ-ব্যবহার সম্পর্কে উদাহরণ দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

তোমার যাহা বলিবার প্রয়োজন, রচনায় তাহা যদি প্রকাশ করিতে না পারিলে, তবে রচনা বৃথা হইল। অর্থব্যক্তির বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে দুই একটা সঙ্কেত আছে।

যে কথাটিতে তোমার কাজ হইবে, সেই কথাটি ব্যবহার করিবে। তাহা শুনিতে ভাল নয়, কী বিদেশি কথা, এরূপ আপত্তি গ্রাহ্য করিও না। এক সময়ে লেখকদিগের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করিবে না। কিন্তু

এখনকার উৎকৃষ্ট লেখকেরা প্রায়ই এ নিয়ম ত্যাগ করিয়াছেন। যে কথাটিতে মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তাহারা সেই কথাই ব্যবহার করেন।

একটি উদাহরণ দিতেছি। তুমি কোন আদালতের ইশতিহারের কথা লিখিতেছ। আদালত হইতে যে সকল আজ্ঞা, সকলের জানিবার জন্য প্রচারিত হয়, তাহাকে ইশতিহার বলে। ইহার আর একটি নাম 'বিজ্ঞাপন'। বিজ্ঞাপন সংস্কৃত শব্দ, ইশতিহার বৈদেশিক শব্দ, এজন্য অনেকে বিজ্ঞাপন শব্দ ব্যবহার করিতে চাহিবেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনের একটু দোষ আছে, তাহার অনেক অর্থ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকর্তা গ্রন্থ লিখিয়া গ্রন্থের পরিচয়ের জন্য প্রথম যে ভূমিকা লেখেন তাহার নাম বিজ্ঞাপন। দোকানদার আপনার জিনিস বিক্রয়ের জন্য খবরের কাগজে বা অন্যত্র যে খবর লেখে, তাহার নাম বিজ্ঞাপন। সভা কি রাজকর্মচারীর রিপোর্টের নাম বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন শব্দের এইরূপ গোলযোগ আছে। এস্থলে আমি ইশতিহার শব্দই ব্যবহার করিব। কেননা, ইহার অর্থ সকলেই বুঝে, লৌকিক ব্যবহার আছে। অর্থেরও কোন গোল নাই।

দ্বিতীয় সঙ্কেত এই যে যদি এমন কোন শব্দই না পাইলাম যে তাহাতে আমার মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তবে যেটি উহারই মধ্যে ভাল, সেইটি ব্যবহার করিব। ব্যবহার করিয়া তাহার পরিভাষা করিয়া অর্থ বুঝাইয়া দিব। দেখ 'জাতি' শব্দ নানার্থ। প্রথম জাতি অর্থে হিন্দু সমাজের জাতি; যেমন- ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত ইত্যাদি। দ্বিতীয় জাতি অর্থে দেশ বিশেষের মনুষ্য যেমন- ইংরেজি জাতি, ফরাসি জাতি, চীন জাতি। তৃতীয়, জাতি অর্থে মনুষ্যবংশ; যেমন- আর্য জাতি, সেমীয় জাতি, তুরাণী জাতি ইত্যাদি। চতুর্থ, জাতি অর্থে কোন দেশের মনুষ্যদিগের শ্রেণীবিশেষ মাত্র; যেমন- য়িহুদায় দশ জাতি ছিল। পঞ্চম, নানা জাতি পক্ষী, কুক্কুরের জাতি বলিলে যে অর্থ বুঝায়, তাই। ইহার মধ্যেও কোন অর্থ প্রকাশ করিতে গেলে, জাতি ভিন্ন বাংলায় অন্য শব্দ নাই। এস্থলে জাতি শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু ব্যবহার করিয়া তাহার পরিভাষা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, কোন অর্থে জাতি শব্দ ব্যবহার করা যাইতেছে। বুঝাইয়া দিয়া উপরে যেমন- দেওয়া গেল, সেইরূপ উদাহরণ দিলে আরও ভাল হয়।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

অর্থব্যক্তি – অর্থের প্রকাশ, **সংস্কৃতমূলক শব্দ** – সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত শব্দ, **ব্যক্ত হয়** – প্রকাশিত হয়, **আদালত** – বিচারালয়, **ইশতিহার** – বিজ্ঞাপন, **আজ্ঞা** – আদেশ, **গ্রন্থকর্তা** – গ্রন্থের রচয়িতা, **রিপোর্ট** – প্রতিবেদন, **লৌকিক** – লোক সম্পর্কীয়, সাংসারিক, **নানার্থ** – নানারকম অর্থ, **পরিভাষা** – বিদেশি শব্দের উপযুক্ত স্বদেশী ভাষা।

কাহিনী সংক্ষেপ

যা বলা প্রয়োজন, রচনায় যদি তা প্রকাশিত না হয়, তবে রচনাটি ব্যর্থ।

যে কথায় মনোভাব ঠিকভাবে প্রকাশিত হয় সে কথাই ব্যবহার করা দরকার। শুনতে ভাল নয় অথবা বিদেশি শব্দ বলে কোন শব্দ বাদ দেওয়া ঠিক নয়। যে শব্দের অর্থ সকলে বোঝে, সে শব্দই ব্যবহার করতে হবে। যদি মনের ভাব প্রকাশের জন্য সঠিক শব্দ না পাওয়া যায়, তবে যেটি অপেক্ষাকৃত ভাল, সেটিই ব্যবহার করতে হবে। দরকার হলে এ শব্দের পরিভাষা ব্যবহার করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. বঙ্কিমচন্দ্র কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
   ক. ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে

২. ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়?
   ক. রাজসিংহ খ. দুর্গেশনন্দিনী
   গ. কপালকুণ্ডলা ঘ. বিষবৃক্ষ

৩. 'রচনার শিল্পগুণ' প্রবন্ধটির লেখক কে?
   ক. সৈয়দ মুজতবা আলী খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
   গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪. কিসের বিশেষ নিয়ম নাই .....।
ক. অর্থব্যক্তির খ. অর্থব্যাপ্তির
গ. অর্থের গভীরতার ঘ. অর্থব্যঞ্জনার

৫. 'ইশতিহার' শব্দের অর্থ কোনটি?
ক. ব্যবহার খ. প্রচার
গ. বিজ্ঞপ্তি ঘ. প্রেরক

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. তোমার যাহা বলিবার প্রয়োজন, রচনায় তাহা যদি প্রকাশ করিতে না পারিলে, তবে ..... হইল।
২. ..... বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে দুই একটা ..... আছে।
৩. এক সময় লেখকদিগের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, ... শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করিবে না।
৪. যে কথাটিতে ..... ঠিক ব্যক্ত হয়, তাহারা সেই কথাই ..... করেন।
৫. আদালত হইতে যে সকল আজ্ঞা, সকলের ..... জন্য প্রচারিত হয়, তাহাকে ..... বলে।
৬. দোকানদার আপনার জিনিস বিক্রয়ের জন্য খবরের কাগজে বা অন্যত্র যে খবর লেখে, তাহার নাম .....।
৭. ব্যবহার করিয়া তাহার ..... করিয়া অর্থ বুঝাইয়া দিব।
৮. জাতি শব্দ .....।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন।

ক.

১. গ, ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ২. খ, দুর্গেশনন্দিনী ৩. ঘ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪. ক, অর্থব্যক্তির ৫. গ, বিজ্ঞপ্তি

খ.

১. রচনা বৃথা ২. অর্থব্যক্তির, সঙ্কেত ৩. সংস্কৃতমূলক ৪. মনের ভাব, ব্যবহার
৫. জানিবার, ইশতিহার ৬. বিজ্ঞাপন ৭. পরিভাষা ৮. নানার্থ

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- রচনার প্রাঞ্জলতা বলতে কী বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- রচনাকে প্রাঞ্জল করার কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

প্রাঞ্জলতা রচনার বড় গুণ। তুমি যাহা লিখিবে লোকে পড়িবামাত্র যেন তাহা বুঝিতে পারে। যাহা লিখিলে, লোকে যদি তাহা না বুঝিতে পারিল, তবে লেখা বৃথা, কিন্তু অনেক লেখক এ কথা মনে রাখেন না। কতকগুলি নিয়ম আর কতকগুলি কৌশল মনে রাখিলে রচনা খুব প্রাঞ্জল করা যায়। দুই রকমই বলিয়া দিতেছি।

একটি বস্তুর অনেকগুলি নাম থাকিতে পারে, যেমন- আগুনের নাম অগ্নি, হুতাশন অথবা হুতভুক, অনল, বৈশ্বানর, বায়ুসখা ইত্যাদি। এখন, আগুনের কথা লিখিতে গেলে ইহার মধ্যে কোন নামটি ব্যবহার করিব? যেটি সবাই জানে, অর্থাৎ আগুন বা অগ্নি। যদি বলি, হুতভুক সাহায্যে বাষ্পীয় যন্ত্র সঞ্চালিত হয়, তবে অধিকাংশ বাঙালি আমার কথা বুঝিবে না। যদি বলি যে, অগ্নির সাহায্যে বাষ্পীয় যন্ত্র চলে, সকলেই বুঝিবে।

অনর্থক কতকগুলো সংস্কৃত শব্দ লইয়া সন্ধি সমাসের আড়ম্বর করিও না– অনেকে বুঝিতে পারে না। যদি বলি 'মীনক্ষোভাকুল কুবলয়' তোমরা কেহ কি সহজে বুঝিবে? আর যদি বলি, 'মাছের তাড়নে যে পদ্ম কাঁপিতেছে' তবে কে না বুঝিবে?

অনর্থক কথা বাড়াইও না। অল্প কথায় কাজ হইলে বেশি কথার প্রয়োজন কি? 'এবম্বিধ বিবিধ প্রকার ভয়াবহ ব্যাপারের বশীভূত হইয়া, যখন সূর্যদেব পূর্বগগনে অধিষ্ঠান করিয়া পৃথিবীতে স্বীয় কিরণমালা প্রেরণ করিলেন, তখন আমি, সেই স্থান পরিত্যাগপূর্বক, অন্যত্র গমন করিলাম।' এরূপ না বলিয়া যদি বলি, 'এইরূপ অনেক বিষয়ে ভয় পাইয়া, যখন সূর্য উঠিল তখন আমি সেস্থান হইতে চলিয়া গেলাম', তবে অর্থের কোন ক্ষতি হয় না, অথচ সকলে সহজে বুঝিতে পারে।

জটিল বাক্য রচনা করিও না। অনেকগুলি বাক্য একত্র জড়িত করা হইলে বাক্য জটিল হয়। যেখানে বাক্য জটিল হইয়া আসিবে, সেখানে জটিল বাক্যটি ভাঙ্গিয়া ছোঁ ছোঁ সকল বাক্যে সাজাইবে। উদাহরণ দেখ:

'দিন দিন পল্লীগ্রামে সকলের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অল্পকাল মধ্যে অনেক পল্লীগ্রাম যে জলহীন হইবে এবং তদ্ধেতুক যে কৃষিকার্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে, এরূপ অনুমান করিয়াও অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি তাহার প্রতিবিধানে যত্ন করেন না, দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি।'

এই বাক্য অতি জটিল। সহজে বুঝা যায় না। কিন্তু ছোঁ ছোঁ বাক্যে ইহাকে বিভক্ত করিয়া লইলে কত সহজ হয় দেখ- 'দিন দিন পল্লীগ্রামে সকলের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অল্পকাল মধ্যে অনেক পল্লীগ্রাম জলহীন হইবে। পল্লীগ্রাম সকল জলহীন হইলে কৃষিকার্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে। অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি ইহা অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু অনুমান করিয়াও তাহারা ইহার প্রতিবিধানের যত্ন করেন না। ইহা দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি।

একটি বাক্যের স্থানে ছয়টি হইয়াছে। কিন্তু বুঝিবার আর কোন কষ্ট নাই। যেখানে স্থূল কথাঁটা বুঝিতে কঠিন, সেখানে উদাহরণ প্রয়োগে বড় পরিষ্কার হয়। সুতরাং উদাহরণের আর পৃথক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। স্থূল বাক্যটি বড় সংক্ষিপ্ত হইলে অনেক সময়ে বুঝিবার কষ্ট হয়। এমন স্থলে সম্প্রসারণ করিবে। 'অশ্ব' শব্দটির উদাহরণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

অশ্ব, শৃঙ্গহীন উদ্ভিদভোজী চতুষ্পদ বিশেষ।

ইহাতে অনেক কথা বুঝিবার কষ্ট আছে। যাহা যাহা বুঝিবার কষ্ট তাহা সম্প্রসারিত বাক্যগুলিতে পরিষ্কার হইয়াছে। আর এক প্রকারের উদাহরণ দেখ:

মনে কর, এ বৎসর বৃষ্টি কম হইয়াছে। লোকে বলে 'ঊন বর্ষায় দুনো শীত'। 'অর্থাৎ যেবার বৃষ্টি কম হয় সেবার শীত বেশি হয়। মনে কর, তুমি সে কথা জান না। এমন অবস্থায় ভাদ্র মাসে তোমাকে যদি কেহ বলে এ বৎসর শীত বেশি হইবে, তাহা হইলে তুমি তাহার কথার মর্ম কিছু বুঝিতে পারিবে না, হয়ত তাহাকে পাগল মনে করিবে। কিন্তু সে যদি নিজ বাক্যের সম্প্রসারণ করিয়া বলে, "যে যে বৎসর কম বর্ষা হইবে সেই সেই বৎসর বেশি শীত হইয়াছে দেখা গিয়াছে। এ বৎসর কম বর্ষা হইয়াছে। অতএব এ বৎসর বেশি শীত হইবে।" তাহা হইলে বুঝিবার কষ্ট থাকে না।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

প্রাঞ্জলতা – যা সহজে বোঝা যায়, **অগ্নি, হুতাশন, হুতভুক, অনল, বৈশ্বানর, বায়ুসখা** – এগুলো আগুনের প্রতিশব্দ, **বাষ্পীয় যন্ত্র** – বাষ্প দ্বারা চালিত যন্ত্র, **আড়ম্বর** – সমারোহ, **এবম্বিধ** – এ প্রকারের, **অধিষ্ঠান করিয়া** – উপস্থিত থেকে, **কিরণমালা** – সূর্যের আলোর মালা, **তদ্ধেতুক** – তার কারণে, **দেশহিতৈষী** – দেশের মঙ্গল কামনা করেন যিনি, **প্রতিবিধান** – উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, **স্থূল কথা** – মোঁ কথা।

কাহিনী সংক্ষেপ

প্রাঞ্জলতা রচনার সবচেয়ে বড় গুণ। রচনাকে প্রাঞ্জল করার কয়েকটি নিয়ম ও কৌশল আছে।

একটি শব্দের অনেক প্রতিশব্দ থাকতে পারে। এগুলোর যেটি সবচেয়ে সহজে বোঝা যায় সেটি ব্যবহার করতে হবে।

সংস্কৃত সন্ধি ও সমাসযুক্ত পদের প্রয়োজন নেই।

জটিল বাক্য ব্যবহার না করে ছোঁ ছোঁ বাক্যে মনের ভাব প্রকাশ করতে হবে। যেখানে মূলকথাটি বুঝতে অসুবিধা হয় সেখানে উদহারণ দেওয়া যায়। স্থূল বাক্যটি বেশি সংক্ষিপ্ত হলে তাকে সম্প্রসারিত করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. প্রাঞ্জলতার বৈশিষ্ট্য কি?
   ক. পড়ামাত্র বুঝতে পারা — খ. যা বলতে চাই তা বলতে পারা
   গ. লেখবার সময় শব্দ বাছাই করা — ঘ. সুন্দর করে লেখা

২. বাক্য জটিল হয় কখন?
   ক. বাক্যে কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হলে — খ. বাক্যে সমাসবদ্ধ শব্দ ব্যবহার করলে
   গ. অনেকগুলো বাক্য একত্র করা হলে — ঘ. বাক্যে কয়েকটি ভাগ থাকলে

৩. 'ঊন বর্ষায় দুনো শীত' কথাটির অর্থ কি?
   ক. যে বছর বৃষ্টি হয় সেবার শীতও কম হয়
   খ. যেবার বৃষ্টি বেশি হয় সেবার শীত কম হয়
   গ. যেবার বৃষ্টি বেশি হয় সেবার শীতও বেশি হয়
   ঘ. যেবার বৃষ্টি কম হয় সেবার শীত বেশি হয়

৪. কোনটি অগ্নি শব্দের সমার্থক নয়?
   ক. বায়ুসখা — খ. বৈশ্বাসর
   গ. হুতাসুক — ঘ. মার্তণ্ড

৫. লেখক অনর্থক কোন শব্দের সন্ধি ও সমাসের আড়ম্বর করতে বারণ করেছেন।
   ক. বাংলা শব্দের — খ. ইংরেজি শব্দের
   গ. সংস্কৃত শব্দের — ঘ. বিদেশি শব্দের

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন।

১. ..... রচনার বড় গুণ।
২. অনর্থক কতকগুলো ..... শব্দ লইয়া .... আড়ম্বর করিও না।
৩. অনেকগুলি বাক্য একত্র জড়িত করা হইলে বাক্য ..... হয়।
৪. যেখানে ..... কথাটি বুঝিতে কঠিন, সেখানে ..... প্রয়োগে বড় পরিষ্কার হয়।
৫. ঊন বর্ষায় ..... শীত।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক.

১. ক. পড়ামাত্র বুঝতে পারা — ২. গ. অনেকগুলো বাক্য একত্র করা হলে।
৩. ঘ. যেবার বৃষ্টি কম হয় সেবার শীত বেশি হয় — ৪. ঘ. মার্তণ্ড — ৫. গ. সংস্কৃত শব্দের

খ.

১. প্রাঞ্জলতা — ২. সংস্কৃত, সন্ধি সমাসের — ৩. জটিল — ৪. স্থূল, উদাহরণ — ৫. দুনো

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. রচনার শিল্পগুণ কী? রচনার দুটি শিল্পগুণ ব্যাখ্যা করুন।
২. রচনার অর্থব্যক্তি ও প্রাঞ্জলতার উদাহরণ দিন।
৩. 'রচনার শিল্পগুণ' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. লেখক বিজ্ঞাপন শব্দের পরিবর্তে 'ইশতিহার' লিখতে চান কেন?
২. লেখক সংস্কৃত পদের সন্ধি-সমাসের আড়ম্বর করতে বারণ করেছেন কেন?
৩. জটিল বাক্য রচনা করতে বারণ করা হয়েছে কেন?
৪. বাক্য সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন হয় কেন?

গ. ব্যাখ্যা করুন

১. যে কথাটিতে তোমার কাজ হইবে, সেই কথাটি ব্যবহার করিবে।
২. প্রাঞ্জলতা রচনার বড় গুণ। তুমি যাহা লিখিবে লোকে পড়িবামাত্র যেন তাহা বুঝিতে পারে।
৩. অল্প কথায় কাজ হইলে বেশি কথার প্রয়োজন কি?

প্রশ্ন : রচনার শিল্পগুণ কী? রচনার দুটি শিল্পগুণ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : যে গুণ দিয়ে রচনার শিল্পমূল্য বৃদ্ধি পায় তাই রচনার শিল্পগুণ। লেখক রচনা করেন অন্যের জন্য। লেখকের মনের কথাটি সহজে পাঠকের কাছে রসমধুর হয়ে ধরা পড়ে বিষয়ের বিন্যাসে, উপস্থাপনার কৌশলে। আঙ্গিকের অনন্যতায়, শব্দ ব্যবহারের চাতুর্যে। শিল্পগুণ হচ্ছে রচনার প্রাণ।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বলিষ্ঠ গদ্যলেখক বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ করে দুটি শিল্পগুণের কথা বলেছেন। এর একটি অর্থব্যক্তি ও অন্যটি প্রাঞ্জলতা। এ দুটি গুণের সমন্বয়েই রচনা হয়ে উঠতে পারে আকর্ষণীয়। এ গুণ দুটির ব্যাখ্যা আমরা এভাবে করতে পারি। অর্থব্যক্তি - 'অর্থব্যক্তি' শব্দের অর্থ, 'অর্থের প্রকাশ'। লেখক বলেছেন - 'যে কথাটিতে তোমার কাজ হইবে, সেই কথাটি ব্যবহার করিবে।' অর্থাৎ আমার মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশের জন্য উপযুক্ত শব্দটি খুঁজে বের করতে হবে। এক সময় লেখকদের ধারণা ছিল তাঁরা শুধু সংস্কৃতমূলক শব্দ ব্যবহার করবেন। কিন্তু তাঁরা এখন আর তা করেন না।

যে শব্দটি দিয়ে মনের ভাব বা অর্থের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটে সে শব্দটিই ব্যবহার করতে হবে। শব্দটি সংস্কৃত না অসংস্কৃত, দেশি না বিদেশি এ নিয়ে মাথা ঘামান উচিত নয়। 'ইশতিহার' শব্দটি বিদেশি। 'বিজ্ঞাপন' সংস্কৃত শব্দ। আদালতের কাজের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র 'ইশতিহার শব্দটিই যথার্থ বলে মনে করেছেন। কারণ 'বিজ্ঞাপন' শব্দটির অর্থ একটি নয় অনেক। তাই আদালতের আদেশ ও নির্দেশ বোঝানোর জন্য 'ইশতিহার' শব্দটিই যথার্থ।

প্রাঞ্জলতা - রচনার আরেকটি গুণ প্রাঞ্জলতা। 'প্রাঞ্জলতা' শব্দের অর্থ যা সহজে বোঝা যায়। রচনাটি যদি পাঠক বুঝতেই না পারে, তাহলে রচনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সেজন্যই লেখক বলেছেন - "তুমি যাহা লিখিবে লোকে পড়িবামাত্র যেন তাহা বুঝিতে পারে।"

প্রাঞ্জলতার জন্য লেখক কিছু নিয়ম ও কৌশলের কথা বলেছেন। এগুলো হল - অপরিচিত শব্দ ব্যবহার না করে পরিচিত শব্দ ব্যবহার করা, জটিল বাক্য ব্যবহার না করে ছোঁ ও সরল বাক্য ব্যবহার করা, প্রয়োজনে পরিভাষা ব্যবহার করা ও উদাহরণ দেওয়া। লেখক রচনার এসব বিধি-নিয়ম মেনে চললেই রচনা প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে।

শিল্পগুণ সমৃদ্ধ রচনার আবেদন চিরকালীন। পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয় এ রকম শিল্পগুণসম্পন্ন রচনার জন্য অর্থব্যক্তি ও প্রাঞ্জলতা দুটি বড় গুণ।

প্রশ্ন : রচনার অর্থব্যক্তি ও প্রাঞ্জলতার উদাহরণ দিন।

উত্তর : যে রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করলে রচনা পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় হয় তাই রচনার শিল্পগুণ। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র সুনির্দিষ্টভাবে রচনার দুটি শিল্পগুণের কথা বলেছেন। এর একটি অর্থব্যক্তি ও অন্যটি প্রাঞ্জলতা। লেখক এ দুটি গুণের পক্ষে একাধিক উদাহরণ দিয়েছেন ও মন্তব্য করেছেন।

আমরা এবার অর্থব্যক্তি ও প্রাঞ্জলতার উদাহরণ উপস্থাপন করব।

অর্থব্যক্তি- 'অর্থব্যক্তি' শব্দটির অর্থ, অর্থের প্রকাশ। মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার নামই অর্থব্যক্তি। অর্থ সুচারুভাবে প্রকাশের বিশেষ কোন নিয়ম নাই। কিন্তু লেখক কয়েকটি সঙ্কেতের কথা বলেছেন। অর্থব্যক্তি বা অর্থ প্রকাশের প্রধান উপকরণ যথার্থ শব্দ। যে শব্দ ব্যবহারে অর্থ পরিপূর্ণ প্রকাশ পায় তাই ব্যবহার করতে হবে। সংস্কৃত বা অসংস্কৃত দেশি বা বিদেশি- এরকম বাছবিচারের কোন প্রয়োজন নাই। শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখতে হবে মনের ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হচ্ছে কিনা। আদালত থেকে জানার জন্য যে আদেশ-নির্দেশ প্রচারিত হয় তাকে বলে 'ইশতিহার'। 'ইশতিহার' বিদেশি শব্দ। বিজ্ঞাপন 'সংস্কৃত' শব্দ। কিন্তু লেখক 'বিজ্ঞাপন' শব্দটি এক্ষেত্রে ব্যবহারে আগ্রহী নন। কারণ বিজ্ঞাপন শব্দের নানান অর্থ। বিজ্ঞাপন শব্দে যে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে 'ইশতিহার' শব্দে তা নেই। তাই লেখক 'ইশতিহার' শব্দটিই ব্যবহার করতে চান।

প্রাঞ্জলতা- প্রাঞ্জলতা শব্দের অর্থ - যা সহজে বোঝা যায়। যা লেখা হল তা যদি সহজে পাঠক বুঝতে পারে তবেই রচনার সার্থকতা। রচনাকে প্রাঞ্জল করার জন্য কিছু নিয়ম-কানুন লেখককে মেনে চলতে হয়। এ নিয়মগুলো হচ্ছে পরিচিত নামের ব্যবহার, জটিল বাক্য ব্যবহার না করা, প্রয়োজনে পরিভাষা ব্যবহার করা ও উদাহরণ দেওয়া।

প্রাঞ্জলতা সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন- আগুনের অনেকগুলো প্রতিশব্দ বা নাম আছে। সেগুলো হচ্ছে- অগ্নি, হুতাশন, হুতভুক, অনল, বৈশ্বানর, বায়ুসখা ইত্যাদি। এর মধ্যে অগ্নি বা আগুন শব্দটিই আমাদের কাছে বেশি পরিচিত। তাই এ দুটো শব্দ ব্যবহার করলে আমরা সহজে বুঝতে পারি। কিন্তু অন্য শব্দগুলো অধিকাংশ বাঙালির কাছে দুর্বোধ্য। তাই সে শব্দগুলো ব্যবহার করলে রচনা প্রাঞ্জল হবে না।

রচনার অর্থব্যক্তি ও প্রাঞ্জলতার উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি রচনা পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করতে হলে যথার্থ অর্থব্যক্তি ও প্রাঞ্জলতা- রচনার দুটি অপরিহার্য গুণ।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : লেখক বিজ্ঞাপন শব্দের পরিবর্তে 'ইশতিহার' লিখতে চান কেন?

উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রচনার শিল্পগুণ' একটি অসাধারণ প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে তিনি রচনার শিল্পগুণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে রচনায় শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে বলতে যেয়ে লেখক 'ইশতিহার' শব্দটির প্রসঙ্গ টেনেছেন।

'ইশতিহার' বিদেশি শব্দ। বিজ্ঞাপন সংস্কৃত শব্দ। তবুও আদালতের আদেশ-নির্দেশ প্রচারের জন্য ইশতিহার শব্দটিকেই লেখক ব্যবহারযোগ্য মনে করেছেন। বিজ্ঞাপন শব্দটির একাধিক অর্থ আছে। যেমন- লেখক তাঁর বইয়ের ভূমিকাকে বিজ্ঞাপন বলতে পারেন। খবরের কাগজে বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। আবার রাজকর্মচারী যে রিপোর্ট দেন সেটাকেও বিজ্ঞাপন বলা যায়। তাই বিজ্ঞাপন শব্দটি দিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু 'ইশতিহার' বললে আর গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে না। এ কারণে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞাপন লেখার পরিবর্তে 'ইশতিহার' লিখতে চান।

প্রশ্ন : লেখক সংস্কৃত পদের সন্ধি-সমাসের আড়ম্বর করতে বারণ করেছেন কেন?

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বলিষ্ঠ গদ্যলেখক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'রচনার শিল্পগুণ' নামক প্রবন্ধে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের কথা বলেছেন। এক সময় অনেক লেখকই সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে ভালবাসতেন। কিন্তু এখন আর সে প্রবণতা নাই। লেখক বলেছেন কঠিন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার না করতে। তাছাড়া সংস্কৃত শব্দের সন্ধি ও সমাসের ফলে শব্দটি আরও কঠিন হয়ে পড়ে। লেখক একটি উদাহরণও দিয়েছেন। 'মীনক্ষোভাকুল কুবলয়' বললে প্রায় কেউই বুঝবেন না। কিন্তু যদি বলা যায় 'মাছের তাড়নে যে পদ্ম কাঁপছে' তাহলে সকলেই বুঝতে পারে। যেহেতু রচনার প্রধান উদ্দেশ্য অন্যের কাছে নিজের মনের ভাব সহজে বুঝিয়ে দেওয়া তাই সহজভাবেই লেখা উচিত। সহজ, বোধগম্য ও প্রাঞ্জল করার জন্যই সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বর বা বাহুল্য পরিত্যাগ করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন : লেখক জটিল বাক্য রচনা করতে বারণ করা হয়েছে কেন?

উত্তর : রচনার উদ্দেশ্য লেখক যা বলতে চান তা সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। অর্থের সহজ প্রকাশ ও প্রাঞ্জলতার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র জটিল বাক্য রচনা করতে বারণ করেছেন। জটিল বাক্যে একাধিক বাক্যের সমাবেশ হয়। ফলে যেমন- বাক্যটি দীর্ঘ হয় তেমনি অর্থও জটিল হয়ে ওঠে। জটিল বাক্য রচনা করে যদি ছোঁ ছোঁ বাক্যে একই মনোভাব প্রকাশ করা হয় তবে তা পাঠক সহজেই বুঝতে পারে। উদাহরণ দিয়ে কথাটি পরিষ্কার করা যায়।

দিন দিন পল্লীগ্রামে সকলের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অল্পকাল মধ্যে অনেক পল্লীগ্রাম যে জলহীন হইবে এবং তদ্ধেতুক যে কৃষি কার্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে, এরূপ অনুমান করিয়াও অনেক দেশ হিতৈষী ব্যক্তি তাহার প্রতিবিধানে যত্ন করেন না, দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি।"

এ দীর্ঘ বাক্যটি যদি ছোঁ ছোঁ বাক্যে রূপান্তর করা যায় তাহলে এরকম হবে - 'দিন দিন পল্লীগ্রামের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে। যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অল্পকাল মধ্যে অনেক পল্লীগ্রাম জনহীন হইবে। পল্লীগ্রাম জলহীন হইলে কৃষিকার্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে, অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি ইহা অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু অনুমান করিয়াও তাহারা ইহার প্রতিবিধানে যত্ন করেন না। ইহা দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি।'

ছোঁ বাক্য দিয়েই রচনার প্রাঞ্জলতা বৃদ্ধি পায়। এজন্যই লেখক জটিল ও দীর্ঘ বাক্য রচনা করতে বারণ করেছেন।

ব্যাখ্যা উত্তর

১. যে কথাটিতে তোমার কাজ হইবে, সেই কথাটি ব্যবহার করিবে।

উত্তর : উদ্ধৃত বাক্যটি সুলেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রচনার শিল্পগুণ' নামক প্রবন্ধ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে লেখক অর্থ প্রকাশের সহজ উপায় সম্পর্কে বলেছেন।

লেখক রচনা করেন পাঠকের জন্য। পাঠক যাতে সহজে লেখকের কথা বুঝতে পারে সেজন্য শব্দ নির্বাচন করতে হয় সাবধানে। লেখক বলেছেন অর্থ প্রকাশের জন্য দেশি-বিদেশি, সংস্কৃত-অসংস্কৃত যে কোন শব্দই ব্যবহার করা যায়। শুধু দেখতে হবে কোন শব্দটি দিয়ে সঠিকভাবে মনোভাব প্রকাশ করা যায়।

আলোচ্য অংশটুকু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রগতিশীল মনের পরিচয় আছে। শব্দ ব্যবহার ও সাহিত্য রচনা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এ উদার মনোভাব লেখকদের জন্য চিরস্মরণীয়।

২. প্রাঞ্জলতা রচনার বড় গুণ। তুমি যাহা লিখিবে লোকে পড়িবামাত্র যেন তাহা বুঝিতে পারে।

উত্তর: উদ্ধৃত অংশটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রচনার শিল্পগুণ' নামক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে রচনার প্রাঞ্জলতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

প্রাঞ্জলতা যে কোন রচনার একটি প্রয়োজনীয় শিল্পগুণ। রচনার প্রাঞ্জলতা না থাকলে অনেক গুরুতর বিষয়ও অজানা থেকে যায়। লেখক যা লেখেন তা পাঠকের জন্য। পাঠক না বুঝতে পারলে রচনার কোন মূল্য নেই। প্রাঞ্জলতা হচ্ছে সেই গুণ, যার জন্য রচনাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়। লেখকের যা বক্তব্য পাঠকের কাছে অনায়াসে তা ধরা পড়ে। দুরূহ শব্দ, জটিল বাক্য এসব পরিহার করতে হয়। অবশ্য প্রয়োজনীয় অথচ জানা শব্দ ব্যবহার করলে, প্রয়োজনে পরিভাষা ব্যবহার ও উদাহরণ দিলে রচনাটি সহজেই প্রাঞ্জল হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক যে দুটি গুণের কথা বলেছেন, প্রাঞ্জলতা তার মধ্যে অন্যতম। প্রাঞ্জলতা না থাকলে যে কোন রচনাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়তে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

Afh rj¡
j£l jn¡llg ®q¡-pe

লেখক পরিচিতি

১৩ নভেম্বর, ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেন কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর মুয়াজ্জম হোসেন ও মাতার নাম দৌলতননেসা। কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও কৃষ্ণনগরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কিছুকাল লেখাপড়া করেন। কর্মজীবনে মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার ও ফরিদপুরের পদমদী এস্টেটে চাকুরি করেন। ছাত্রজীবনেই মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যচর্চার শুরু হয়।

মীর মশাররফ হোসেন উনিশ শতকের বাংলাগদ্য লেখকদের অন্যতম। তাঁর প্রতিভা ছিল বিভিন্নমুখী। তিনি উপন্যাস, নাঁক, প্রহসন, কাব্য, প্রবন্ধ ও আত্মজীবনী রচনা করেছেন। কারবালার বিষাদময় কাহিনী নিয়ে রচিত উপন্যাস 'বিষাদসিন্ধু' সেকালে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

মীর মশাররফ হোসেনের প্রধান রচনাবলী

উপন্যাস : রত্নবতী, বিষাদসিন্ধু, উদাসীন পথিকের মনের কথা, গাজী মিয়ার বস্তানী।

নাঁক : বসন্তকুমারী, জমিদার দর্পণ।

আত্মজীবনী : আমার জীবন, বিবি কুলসুম বা আমার জীবনীর জীবনী।

প্রবন্ধ : গোজীবন।

কাব্য : গোরাই ব্রীজ বা গোরাই সেতু।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেন ইন্তেকাল করেন।

পাঠ পরিচিতি

১. 'অপূর্ব ক্ষমা' গদ্যাংশটি মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'বিষাদসিন্ধু' থেকে চয়ন করা হয়েছে। হয়রত মুহম্মদ (স) এর দৌহিত্র ইমাম হাসান বিষ প্রয়োগে নিহত হন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত ইমাম হাসান বিষ প্রদানকারী স্ত্রী জাএদাকে ক্ষমা করেন। এ কাহিনীটিকেই লেখক 'অপূর্ব ক্ষমা' নামকরণ করে বর্ণনা করেছেন। অপূর্ব ক্ষমা - সংযম ও উদারতার এক অপূর্ব চিত্র।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি -

- মৃত্যুপথযাত্রী ইমাম হাসান সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- হাসান ও হোসেনের মৃত্যু সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটি লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
- ক্রুদ্ধ হোসেন সম্পর্কে একটি বিবরণ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

অনুজের হস্ত ধরিয়া হাসান নিজ শয্যার উপরে বসাইয়া মুখে বারবার চুম্বন দিয়া বলিতে লাগিলেন, ভাই, আমি যে কষ্ট পাইতেছি তাহা মুখে বলিবার শক্তি নাই। পূর্ব আঘাত, পূর্ব পীড়া এই উপস্থিত যন্ত্রণায় সকলি ভুলিয়া গিয়াছি। দেখত, আমার মুখের বর্ণ কি পরিবর্তিত হইয়াছে?

ভ্রাতার মুখপানে দৃষ্টিপাত করিয়া হোসেন কাঁদিতে লাগিলেন। আর আর সকলে বলিতে লাগিল, আহা! জ্যোতির্ময় চন্দ্রবদনে বিষাদনীলিমার রেখা পড়িয়াছে।

এই কথা শুনিয়া হাসান অনুজকে বলিলেন, ভাই, বৃথা কাঁদিয়া লাভ কী? আমার আর বেশি বিলম্ব নাই; চিরবিদায়ের সময় অতি নিকট। মাতামহ যাহা বলিয়াছিলেন, সকলি প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভাই, মাতামহ সশরীরে ঈশ্বরের আদেশে একবার ঈশ্বরের স্থানে নীত হইয়াছিলেন। সেখানে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে অতি রমণীয় দুইটি ঘর সুসজ্জিত দেখিলেন। একটি

সবুজ বর্ণ, আর একটি লোহিত বর্ণ। কাহার ঘর, প্রহরীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরী উত্তর করিল, আপনার অন্তরের নিধি হৃদয়ের ধন এবং নয়নের পুত্তলি হাসান- হোসেনের জন্য দুইটি ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরী কাঁপিয়া নতশির হইল, কোন উত্তর করিল না। জিব্রাইল সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তিনিই মাতামহকে বলিলেন, আয় মুহম্মদ! দ্বারবান কারণ প্রকাশে লজ্জিত হইতেছে, আমি প্রকাশ করিব। আজ আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাই বলিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছি। নিদারুণ গুপ্ত কথা হইলেও আজ আমি আপনার নিকটে ব্যক্ত করিব। ঐ দুইটি ঘর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হইবার কারণ কি উহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন। সবুজ বর্ণ গৃহ আপনার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র হাসানের জন্য; লোহিতবর্ণ কনিষ্ঠ হোসেনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আপনার অভাবে একদল পিশাচ শত্রুতা করিয়া হাসানকে বিষ পান করাইবে এবং মৃত্যুসময়ে হাসানের মুখ সবুজ বর্ণ হইবে। তন্নিমিত্ত ঐ গৃহটি সবুজ বর্ণ। ঐ শত্রুগণ অস্ত্রদ্বারা আপনার কনিষ্ঠ দৌহিত্র হোসেনের মস্তকছেদন করিবে। ঐ রক্তমাখা মুখের চিহ্নই লোহিতবর্ণের কারণ। মাতামহের বাক্য আজ সফল হইল। আমার মুখের বর্ণ যখন বিবর্ণ হইয়াছে, তখন পরমায়ুও আজ শেষ হইয়াছে। মাতামহের বাক্য অলঙ্ঘনীয় ভাই, ঈশ্বরের কার্যও অখণ্ডনীয়।

সবিষাদে এবং সরোষে হোসেন বলিতে লাগিলেন, আমি আপনার চির আজ্ঞাবহ দাস, বিশেষ স্নেহের পাত্র এবং চির-আশীর্বাদের আকাঙ্ক্ষী মিনতি করিয়া বলিতেছি, বলুনতো, আপনাকে এ বিষ কে দিয়াছে?

ভাই! তুমি কি জন্য বিষদাতার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কি তাহার প্রতিশোধ নিবে?

হোসেন শয্যা হইতে উঠিয়া অতিশয় রোষভাবে দু:খিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, আমার প্রাণের পূজনীয় ভ্রাতাকে - এক মাতার উদরে যে ভ্রাতা অগ্রে জন্মিয়াছেন, সেই ভ্রাতাকে, আমি বাঁচিয়া থাকিতে যে নরাধম বিষ পান করাইয়াছে সে কি অমনিই বাঁচিয়া যাইবে? আমি কি এমনই দুর্বল, আমি কি এমনই নি:সাহসী, আমি কি এমনই ক্ষীণকায়, আমি কি এমন কাপুরুষ, আমার হৃদয়ে কি রক্ত নাই, ভ্রাতৃস্নেহ নাই যে, ভ্রাতার প্রাণনাশক বিষপ্রদায়কের প্রতিশোধ লইতে পারিব না? যে আজ আমার একটি বাহু ভগ্ন করিল, অমূল্যধন সহোদর রত্ন হইতে যে আজ আমাকে বঞ্চিত করিল, আমি কি তাহার কিছুই করিব না? যদি সে নরাধমের কোন সন্ধান জানিয়া থাকেন, যদি তাহাকে চিনিয়া থাকেন, যদি অনুমানে কিছু অনুভব করিয়া থাকেন, এ আজ্ঞাবহ চিরকিঙ্করকে বলুন, আমি এখনই আপনার সম্মুখে তাহার প্রতিবিধান করিতেছি। সেই পাপাত্মা বিজনবনে, পর্বতগুহায়, অতল জলে, সপ্ততল মৃত্তিকা মধ্যে যেখানে হউক, হোসেনের হস্ত হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই। হয় আমার প্রাণ তাহাকে দিব, নয় তাহার প্রাণ আমি লইব।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

অনুজ – ছোঁ ভাই, **উপস্থিত যন্ত্রণায়** – বর্তমান কষ্ট, **জ্যোতির্ময়** – উজ্জ্বল, আলোময়, **চন্দ্রবদনে** – চাঁদের মত উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে, **বিষাদ নীলিমা** – যন্ত্রণার নীল রং, **নীত** – নিয়ে আসা, **রমনীয়** – সুন্দর, **দ্বারবান** – দারোয়ান, **দৌহিত্র** – নাতি, কন্যার পুত্র, **তন্নিমিত্ত** – সেজন্য, **লোহিতবর্ণের** – লাল রং এর, **পরমায়ু** – আয়ু, **অলঙ্ঘনীয়** – যা লঙ্ঘন করা যায় না, **অখণ্ডনীয়** – যা খণ্ডন করা যায় না, **রোষভাবে** – রাগতভাবে, **প্রাণনাশক** – প্রাণ যে নাশ বা ধ্বংস করে, **বিষপ্রদায়ক** – যে বিষ প্রদান করেছে, **আজ্ঞাবহ** – আদেশ পালনকারী, **চিরকিঙ্কর** – চিরকালের দাস।

কাহিনী সংক্ষেপ

হাসান হোসেনকে বললেন যে তিনি মৃত্যুপথযাত্রী। তাঁর জীবনের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। এ মৃত্যু পূর্ব-নির্ধারিত। হাসান বললেন তাঁকে বিষ খাওয়ান হয়েছে। এ কথা শুনে ক্ষিপ্ত হোসেন বিষপ্রদানকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে চাইলেন। কিন্তু হাসান ছোঁভাইকে বিষ প্রদানকারীর নাম বললেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'অপূর্ব ক্ষমা' গদ্যাংশটির লেখক কে?

ক. কাজী নজরুল ইসলাম　　খ. মীর মশাররফ হোসেন

গ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ　　ঘ. মুনীর চৌধুরী

২. 'অপূর্ব ক্ষমা' রচনাটি কোন গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত?

ক. আনোয়ারা খ. আব্দুল্লাহ
গ. গাজী মিয়ার বস্তানী ঘ. বিষাদসিন্ধু

৩. মীর মশাররফ হোসেন কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. ১৮৪৭ সালে খ. ১৯৫২ সালে
গ. ১৯৪৭ সালে ঘ. ১৮৬১ সালে

৪. "পূর্ব আঘাত, পূর্ব পীড়া এই উপস্থিত যন্ত্রণায় সকলি ভুলিয়া গিয়াছি"- কে বলেছেন?
ক. হাসান খ. হোসেন
গ. আবুল কাসেম ঘ. জয়নব

৫. কোন গ্রন্থটি মীর মশাররফ হোসেনের রচনা?
ক. উদাসীন পথিকের মনের কথা খ. আদিগন্ত
গ. শেষের কবিতা ঘ. মৃত্যুক্ষুধা

খ. শুন্যস্থান পূরণ করুন

১. জ্যোতির্ময় চন্দ্রবদনে ..... রেখা পড়িয়াছে।
২. সবুজ বর্ণ গৃহ আপনার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র ..... জন্য, লোহিত বর্ণ কনিষ্ঠ ..... জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন।

ক. ১. মীর মশাররফ হোসেন
২. বিষাদসিন্ধু
৩. ১৮৪৭ সালে
৪. হাসান
৫. উদাসীন পথিকের মনের কথা

খ. ১. বিষাদ নীলিমার
২. হাসানের, হোসেনের

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি -

- হাসানের ক্ষমার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- হোসেনের প্রতি হাসানের অনুরোধ লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অনুজের হস্ত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, ভাই, স্থির হও। আমি আমার বিষদাতাকে চিনি। সে আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিল, আমি সমুদয়ই জানিতে পারিয়াছি। ঈশ্বরই তাহার বিচার করিবেন। আমার কেবল এইমাত্র আক্ষেপ যে, অকারণে আমাকে নির্যাতন করিল। আমার ন্যায় অনুগত স্নেহশীল বন্ধুকে বধ করিয়া সে যে কি সুখ মনে করিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে কারণেই হউক, যে লাভেই হউক, যে আশায়ই হউক, নিরপরাধে যে আমাকে নির্যাতন করিয়া চিরবন্ধুর প্রাণবধ করিল, দয়াময় পরমেশ্বর তাহার আশা কখনই পূর্ণ করিবেন না। দু:খের বিষয় এই যে, সে আমাকে চিনিতে পারিল না। যাহা হউক, ভাই, তাহার নাম আমি কখনই মুখে আনিব না। তাহার প্রতি আমার রাগ হিংসাদ্বেষ কিছুই নাই। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার বিষদাতার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব। যে পর্যন্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাকে মুক্ত করাইতে না পারি, সে পর্যন্ত স্বর্গের সোপানে পা রাখিব না। ভাই! ক্রমেই আমার বাকশক্তি রোধ হইতেছে। কত কথা মনে ছিল কিছুই বলিতে পারিলাম না। চতুর্দিক যেন অন্ধকারময় দেখিতেছি।

আবুল কাসেমের হস্ত ধরিয়া হোসেনের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্নেহার্দ্র চিত্তে হাসান কাতরস্বরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, ভাই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ মানিয়া আজ আমি তোমার হস্তে কাসেমকে দিলাম। কাসেমের বিবাহ দেখিতে বড় সাধ ছিল, পাত্রীও স্থির করিয়াছিলাম, সময় পাইলাম না। হোসেনের হস্ত ধরিয়া আবার কহিলেন, ভাই ঈশ্বরের দোহাই, আমার অনুরোধ, তোমার কন্যা সখিনার সহিত কাসেমের বিবাহ দিও। আর ভাই আমার বিষদাতার যদি সন্ধান পাও কিংবা কোন সূত্রে যদি ধরা পড়ে, তবে তাহাকে কিছু বলিও না। ঈশ্বরের দোহাই, তাহাকে ক্ষমা করিও। যন্ত্রণাকুল ইমাম ব্যাকুলভাবে অনুজকে এই পর্যন্ত বলিয়া সস্নেহ বচনে কাসেমকে বলিলেন, কাসেম, বৎস আশীর্বাদ করি তুমি চিরজীবী হও। আর বাপ! এই কবচটি সর্বদা হস্তে বাঁধিয়া রাখিও। যদি কখনও বিপদগ্রস্ত হও সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় যদি নিজ বুদ্ধিতে কিছুতেই স্থির করিতে না পার তবে এই কবচের অপর পৃষ্ঠে লক্ষ করিও; যাহা লেখা দেখিবে সেইরূপে কার্য করিবে। সাবধান তাহার অন্যথা করিও না।

কিয়ৎক্ষণ পরনিস্তব্ধ থাকিয়া উপর্যুপরি তিন চারিটি নি:শ্বাস ফেলিয়া হোসেনকে সম্বোধনপূর্বক মুমূর্ষু হাসান পুনরায় কহিলেন, ভাই ক্ষণকালের জন্য তোমরা সকলে একবার বাহিরে যাও। কেবল জাএদা একাকিনী এখানে উপস্থিত থাকুন। জাএদার সহিত নির্জনে আমার একটি বিশেষ কথা আছে।

সকলেই আজ্ঞা পালন করিলেন। শয্যার নিকটে জাএদাকে ডাকিয়া হাসান চুপিচুপি বলিতে লাগিলেন, জাএদা, তোমার চক্ষু হইতে হাসান এখন বিদায় হইতেছে, আশীর্বাদ করি, সুখে থাক। তুমি যে কার্য করিলে সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমাকে বড়ই বিশ্বাস করিতাম। বড়ই ভালবাসিতাম, তাহার উপযুক্ত কার্যই তুমি করিয়াছ। ভাল, সুখে থাক, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। হোসেনকেও ক্ষমা করিতে বলিয়াছি; তাহাও তুমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছ। ভিতরের নিগূঢ় কথা যদি আমি হোসেনকে বলিতাম, তাহা হইলে যে কি অনর্থ সংঘটিত হইত, তাহা তুমি বুঝিতেই পারিতেছ। যাহা হউক আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। কিন্তু যিনি সর্বসাক্ষী, সর্বময়, সর্বক্ষমার অধিকারী, তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন কিনা বলিতে পারি না; তথাপি তোমার মুক্তির জন্য সর্বপ্রযত্নে সেই মুক্তিদাতার নিকট পুনঃপুন প্রার্থনা করিব। যে পর্যন্ত তোমাকে মুক্ত করাইতে না পারিব সেই পর্যন্ত আমি স্বর্গের সোপানে পা রাখিব না।

জাএদা অধোমুখে অশ্রু বিসর্জন করিলেন, একটিও কথা কহিলেন না। সময়োচিত সংকেতধ্বনি শ্রবণে হোসেনের সহিত আর সকলেই গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। হাসান একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। হাসনেবানু ও জয়নাবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজকৃত অপরাধের মার্জনা চাহিলেন। শেষে হোসেনকে কহিলেন, 'হোসেন, এস ভাই জন্মের মতন তোমার সহিত আলিঙ্গন করি।' এই বলিয়া অনুজের গলা ধরিয়া সাশ্রুনয়নে আবার বলিতে লাগিলেন, ভাই সময় হইয়াছে, ঐ মাতামহ স্বর্গের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন। চলিলাম। এই শেষ কথা বলিয়াই ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে দয়াময় ইমাম হাসান সর্বসমক্ষে প্রাণত্যাগ করিলেন। হাসনেবানু, জয়নাব, কাসেম ও আর সকলে হাসানের পদলুণ্ঠিত হইয়া মাথা ভাঙ্গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, জাএদা কাঁদিয়াছিলেন কি-না, তাহা কেহ লক্ষ করেন নাই।

কাহিনী সংক্ষেপ

হাসান ছোঁটভাই হোসেনের হাত ধরে বললেন তিনি ষড়যন্ত্রের কথা সবই জেনেছেন। তবে বিষপ্রদানকারীকে তিনি ক্ষমা করেছেন। হাসান আবুল কাসেমের সঙ্গে সখিনার বিয়ে দেওয়ার জন্য ছোঁভাইকে অনুরোধ করলেন।

সবশেষে হাসান জাএদাকে ডাকলেন। জাএদা বিষপ্রদানকারী জেনেও হাসান তাকে ক্ষমা করলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. ইমাম হাসান কার হাতে আবুল কাসেমকে সমর্থন করলেন?
   ক. ভৃত্যের খ. জাএদা
   গ. ইমাম হোসেন ঘ. জয়নব

২. ইমাম হাসানকে কে বিষ দিয়েছিলেন?
   ক. জয়নব খ. জাএদা
   গ. গৃহভৃত্য ঘ. কাসেম

৩. সে আমাকে চিনিতে পারিল না। কে চিনতে পারল না?
   ক. কাসেম খ. ইমাম হোসেন

গ. হাসান বানু ঘ. জাএদা

৪. ইমাম হাসান নির্জনে কার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?

ক. ইমাম হোসেন খ. জয়নব

গ. কাসেম ঘ. জাএদা

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. ইমাম হোসেন ২. জাএদা

৩. জাএদা ৪. জাএদা

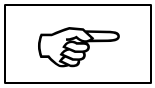

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূল প্রশ্ন

১. 'অপূর্ব ক্ষমা' গদ্যাংশ অবলম্বনে ইমাম হাসানের চরিত্রের মহত্ত্বের পরিচয় দিন।

২. 'অপূর্ব ক্ষমা' গদ্যাংশটি নিজের ভাষায় লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইমাম হাসান কে? তাঁর পরিচয় দিন।

২. ইমাম হোসেন কে? তাঁর পরিচয় দিন।

৩. ইমাম হাসানের চরিত্রের মহত্ত্ব কিভাবে ফুটে উঠেছে?

৪. জাএদা কে? তিনি কি করেছিলেন?

৫. 'অপূর্ব ক্ষমা' কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

গ. ব্যাখ্যা

প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. হয় আমার প্রাণ তাহাকে দিব, নয় তাহার প্রাণ আমি লইব।

২. সুখে থাক, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।

প্রশ্ন : 'অপূর্ব ক্ষমা' গদ্যাংশ অবলম্বনে ইমাম হাসানের চরিত্রের মহত্ত্বের পরিচয় দিন।

উত্তর : 'অপূর্ব ক্ষমা' গদ্যাংশটি মীর মশাররফ হোসেনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিষাদসিন্ধু' থেকে সঙ্কলিত। ইমাম হাসানের চরিত্রের উদারতা ও মহত্ত্বের একটি দিক 'অপূর্ব ক্ষমা' অংশটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ইমাম হাসান মহানবী হযরত মুহম্মদ এর দৌহিত্র। তাঁর পিতার নাম হযরত আলী ও মাতার নাম ফাতেমা।

আলোচ্য গদ্যাংশটি ক্ষুদ্র হলেও ইমাম হাসানের চরিত্রের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে ধরা পড়েছে। মৃত্যুপথযাত্রী ইমাম হাসানের পরিবার-পরিজন সকলের প্রতি স্নেহ-মমতা, ভালবাসা তাঁর আচরণে ও কথায় ফুটে উঠেছে। ছোঁ ভাই ইমাম হোসেনের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃপ্রেমের মধুর পরিচয় ফুটে উঠেছে। সকলকে যথোচিত স্নেহ ও ভালবাসা জানিয়েছেন। তবে এ গল্পাংশে ইমাম হাসানের মহত্ত্বের যে দিকটি সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে - তা তাঁর ক্ষমাশীলতা।

জাএদা ইমাম হাসানের স্ত্রী। এই জাএদাই স্বামীকে হত্যা করার জন্য গোপনে বিষ প্রদান করেন। আর সে বিষের ক্রিয়াতেই ইমাম হাসান মৃত্যুপথযাত্রী। ইমাম হাসান নিজেও সবকিছু জেনেছেন। কিন্তু জাএদাকে তিনি দোষারোপ করলেন না। বরং তাকে নির্জনে ডেকে নিয়ে ক্ষমা করলেন। কারো নিকট তার নাম প্রকাশ করলেন না। এমনকি হোসেনকে নির্দেশ দিলেন কখনও বিষদানকারীর পরিচয় জানা গেলেও হোসেন যেন কোন প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা না করেন। ইমাম হাসান জাএদাকে মধুর বাক্যে তার অপরাধের কথা বললেন কিন্তু ভর্ৎসনা করলেন না। ইমাম হাসান জাএদাকে ক্ষমা করলেন। আরও তাকে জানালেন যে আল্লাহও যেন তাকে ক্ষমা করেন তার জন্য কায়মনোবাক্যে তিনি প্রার্থনা করলেন।

যে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা অস্থির পৃথিবীর স্বাভাবিক চিত্র সেখানে ইমাম হাসানের নিজের হত্যাকারীকে ক্ষমার উদারতা এক বিরল দৃষ্টান্ত। সেজন্যই ক্ষমার এই মহৎ দৃষ্টান্তকে লেখক বলেছেন অপূর্ব ক্ষমা। ইমাম হাসানের চরিত্রের ক্ষমাশীলতার অপূর্ব কাহিনী চিরকাল মানুষ মনে রাখবে।

প্রশ্ন : ইমাম হাসান কে? তার পরিচয় দিন।

উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'অপূর্ব ক্ষমা' নামক গদ্যাংশটির প্রধান চরিত্র ইমাম হাসান। তিনি ইসলামের নবী হযরত মুহম্মদের দৌহিত্র-ফাতেমা ও আলীর প্রথম পুত্র। দামেস্কের মুআবিয়ার পুত্র এজিদের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এজিদের পরামর্শে ইমাম হাসানের স্ত্রী জাএদা তাঁর স্বামীকে বিষ দিয়ে হত্যা করেন। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ইমাম হাসান প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠেননি অথবা স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি। বরং স্ত্রী জাএদাকে তিনি ক্ষমা করেছেন। ইমাম হাসানের এই উদারতা ও ক্ষমাপরায়ণতা তাঁকে এক মহৎ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

প্রশ্ন : ইমাম হোসেন কে? তার পরিচয় দিন।

উত্তর: মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'অপূর্ব ক্ষমা' গদ্যাংশের একটি প্রধান চরিত্র ইমাম হোসেন। তিনি হযরত মুহম্মদের দৌহিত্র এবং ফাতেমার দ্বিতীয় পুত্র। বড় ভাইয়ের প্রতি ইমাম হোসেনের ছিল অঢেল ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। তাই বিষ প্রয়োগের কথা শুনে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু বড় ভাইয়ের নিষেধের কারণেই তিনি তা করেন নি। ইমাম হোসেনের চরিত্রের ভ্রাতৃপ্রেম এখানে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন : জাএদা কে? তিনি কি করেছিলেন?

উত্তর : জাএদা ইমাম হাসানের স্ত্রী।

ইমাম হাসান ছিলেন হযরত মুহম্মদ (সা:) এর দৌহিত্র ও বীর আলীর পুত্র। মদিনার খেলাফত নিয়ে মুআবিয়ার পুত্র এজিদের সঙ্গে ইমাম হাসানের বিরোধ দেখা দিয়েছিল। ইমাম হাসানকে পরে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়। ইমাম হাসানের স্ত্রী জাএদা এ বিষ প্রয়োগ করেন।

এ ঘটনায় জাএদার স্বামীর প্রতি বিশ্বাসহীনতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় আছে।

প্রশ্ন : অপূর্ব ক্ষমা' কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : মীর মশাররফ হোসেন রচিত গদ্যাংশটির নাম 'অপূর্ব ক্ষমা'। 'অপূর্ব ক্ষমা' শিরোনামের অর্থ, অপূর্ব = যা আগে কোনদিন হয়নি এবং ক্ষমা অর্থ মাফ করে দেওয়া বা নিষ্কৃতি দেওয়া। ক্ষমা মহৎগুণ। অপরাধীকে ক্ষমা তিনিই করতে পারেন যাঁর হৃদয় বিশাল। আলোচ্য গদ্যাংশে জাএদা ইমাম হাসানকে হত্যার জন্য বিষয় প্রদান করেছিল। ইমাম হাসান তাঁকে হত্যা করার জন্য কে বিষয় দিয়েছে তা জানতেন। কিন্তু উদার হৃদয় হাসান তাকে ক্ষমা করলেন। প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করলেন না। কেউ যেন সে চেষ্টা না করে তাও বললেন। জাএদাকে ডেকে তিনি তাকে ক্ষমা করার কথা বললেন। এমনকি তাকে ক্ষমা করার জন্য তিনি বিধাতার কাছেও প্রার্থনা করবেন বলে জানালেন।

মৃত্যুপথযাত্রী ইমাম হাসান যে সহনশীলতা, উদারতা ও মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্যই এ গদ্যাংশটির নাম 'অপূর্ব ক্ষমা' ক্ষমার মহত্ত্বের এ চিরকালীন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ব্যাখ্যা উত্তর

১. সুখে থাক, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'অপূর্ব ক্ষমা' নামক গদ্যাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে ইমাম হাসানের উক্তিতে তাঁর উদার হৃদয়ের পরিচয় ধরা পড়েছে।

ইমাম হাসানের স্ত্রী জাএদা শত্রুদের সঙ্গে যোগসাজস করে তাঁকে হত্যার জন্য বিষ প্রদান করেছিল। স্বামীর ভালবাসায় সিক্ত জাএদার বিষ প্রদানের কাজটি একটি জঘন্য ও নির্মম কাজ। জীবনের চরম শত্রুকেও ইমাম হাসান ক্ষমা করে ক্ষমার একটি অনন্য আদর্শ স্থাপন করলেন। শুধু তাই নয় - জাএদা যেন সুখে থাকে, বিধাতা যেন তাকে ক্ষমা করেন সেজন্য তিনি প্রার্থনাও করলেন।

হত্যার বদলে হত্যা নয়, রক্তের বদলে রক্ত নয় - ক্ষমার এ মহৎ দৃষ্টান্ত ইমাম হাসানের চরিত্রকে চির উজ্জ্বলতা দান করেছে।

R¢V

Ih£¾ce¡b W¡LI

লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে, বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাকোঁর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতার নাম সারদা দেবী। পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর সেকালের একজন কর্মসফল ও বিখ্যাত ব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব বেশি দূর এগোয়নি। অল্পবয়সেই তার কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। বাংলা সাহিত্যে এমন কোন শাখা নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের হাতের ছোঁয়া লাগেনি। সাহিত্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথ অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বলা চলে রবীন্দ্রনাথ প্রায় একক প্রচেষ্টাতেই ভারতের একটি প্রাদেশিক ভাষা বাংলাকে আন্তর্জাতিক দরবারে পৌঁছে দেন।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম :

কাব্যগ্রন্থ : মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, ক্ষণিকা, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পুনশ্চ ইত্যাদি।

ছোঁট গল্প : 'গল্পগুচ্ছ' (চারখণ্ড), 'গল্পসল্প', 'সে'।

উপন্যাস : 'চোখের বালি, 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ', 'চার অধ্যায়', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি।

নাঁটক : বিসর্জন, রাজা ও রানী, রক্ত করবী, ডাকঘর।

আত্মজীবনী : 'জীবন স্মৃতি' 'ছেলেবেলা'।

১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট, বাংলা ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।

পাঠ পরিচিতি

'ছুটি' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড থেকে সঙ্কলিত। গল্পের কাহিনী সহজ ও সরল। পরিবেশ ও প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত এক গ্রামীণ বালকের মর্মবেদনা এ গল্পে রূপ পেয়েছে। গল্পের শেষাংশের করুণ আবেদন পাঠকের হৃদয়কে আলোড়িত করে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- বালকদের খেলার একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- ফটিক ও মাখনের চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
- গল্পটি আরম্ভের কাহিনী লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নতুন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়াছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির ওপর গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে এক আধটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, দেখ, মার খাবি! এইবেলা ওঠ!

সে তাহাতে আরও একটু নড়িয়া চড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল - সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনই উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে, কিন্তু করিল না, কারণ পূর্বাপেক্ষা আর একটা ভাল খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক। মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিংবা আর কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল- 'মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো'। গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে না ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের ওপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধকারে মারিতে লাগিল। তাহাদের নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোঁটাকতক কাশ উৎপাঁন করিয়া লইয়া, একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের ওপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়।

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, ওই হোথা, কিন্তু কোন দিকে যে নির্দেশ করিল, কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা?

সে বলিল, জানি নে। বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগদি আসিয়া কহিল, ফটিকদাদা, মা ডাকছে।

ফটিক কহিল, যাব না।

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুড়িতে লাগিল।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

ভাবোদয় – ভাবের উদয়, **ঔদাসীন্য** – উদাসীনতা, **গণ্ডদেশে** – গালে, **অনতিবিলম্বে** – দেরি না করে, **পূর্ববৎ** – পূর্বের মতো।

কাহিনী সংক্ষেপ

ছেলেরা ঠিক করল যে তারা বিরাঁ শালকাঠটি গড়িয়ে নিয়ে যাবে। প্রয়োজনের সময় কাঠটি খুঁজে না পেয়ে কাঠের মালিক কত বিরক্ত হবে ভেবে তারা আমোদ অনুভব করল। কিন্তু খেলায় বাধ সাধল মাখন। সে গম্ভীরভাবে গুঁড়িটার উপর চেপে বসল। তখন ছেলেরা মাখনসহ কাঠটি গড়াবার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে মাখন মাটিতে পড়ে গেল। মাখন মাটি থেকে উঠেই ফটিককে কিল-ঘুষি মারতে লাগল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. বালকদের সর্দারের নাম কি?

ক. বিশ্বম্ভর　　খ. বিশ্বেশ্বর

গ. ফটিক　　ঘ. মাখন

২. অকাল তত্ত্বজ্ঞানী কাকে বলা হয়েছে?
ক. মাখনকে খ. ফটিককে
গ. সাধু লোককে ঘ. জ্ঞানীকে

৩. 'প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক' - কে প্রস্তাব করল?
ক. খেলার সঙ্গীরা খ. ফটিক
গ. নৌকার মাঝি ঘ. জনৈক ব্যক্তি

৪. ..... তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল'। কে তুলে নিয়ে গেল?
ক. মামা খ. বাঘা
গ. মা ঘ. ভৃত্য

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. ফটিক ২. মাখনকে ৩. ফটিক ৪. বাঘা

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি -

- ফটিকের মায়ের আংশিক বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- ফটিকের মামার একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- ফটিকের কলকাতা গমণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, আবার তুই মাখনকে মেরেছিস!
ফটিক কহিল, 'না মারিনি'।
'ফের মিথ্যে কথা বলছিস'!
'কখখনো মারিনি। মাখনকে জিজ্ঞাসা কর'।
মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, 'হাঁ, মেরেছে'।
তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, 'ফের মিথ্যে কথা'!
মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।
মা চিৎকার করিয়া কহিলেন, অ্যা, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!
এমন সময় সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, কী হচ্ছে তোমাদের।
ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, 'ওমা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলে?' বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।
বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতোমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।
কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিররণ শুনিলেন।
তাঁর ভগিনী কহিলেন, 'ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে'।
শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।
ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?'
ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'যাব'।

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁর মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল - কোনদিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয়, কি মাথাই ফাঁটায়, কি কি একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায় গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ন হইলেন।
কবে যাবে, কখন যাবে, করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।
অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্যবশত তাহার ছিপ ঘুড়ি লাঁটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

অগ্নিমূর্তি – আগুনের আকৃতি। অত্যন্ত রাগী ব্যক্তিকে বলা হয়, **বিদ্যানুরাগ** – বিদ্যার প্রতি অনুরাগ বা আগ্রহ, **এতাদৃশ** – এরকম।

কাহিনী সংক্ষেপ

মাখনকে মারধর করার জন্য মা যখন বকাবকি করছিলেন তখন বিশ্বম্ভর বাবু বাড়িতে প্রবেশ করলেন। মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে ভাইকে সমাদর জানালেন। ফটিকের মামা বহুদিন পশ্চিমে ছিলেন। তাই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। কয়েকদিন এ বাড়িতে থাকার পর মামা ফটিকের অবাধ্যতার কথা জানলেন। ফটিককে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্য বিশ্বম্ভরবাবু ফটিককে কলকাতা নিয়ে যেতে চাইলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. মা কাকে দেখে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠলেন?
   ক. বাঘা বাগদিকে　　খ. বিশ্বম্ভর বাবুকে
   গ. গ্রামের ছেলেদের　　ঘ. ফটিককে

২. বহুদিন হল কে পশ্চিমে কাজ করতে গিয়েছিলেন?
   ক. বিশ্বম্ভর　　খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
   গ. ফটিক চক্রবর্তী　　ঘ. হেড মাস্টার

৩. মামা ফটিককে কোথায় নিয়ে যেতে চাইলেন?
   ক. ঢাকায়　　খ. কলকাতায়
   গ. পশ্চিমে　　ঘ. অন্য শহরে

৪. ফটিকের বিদায় গ্রহণের অতি আগ্রহ কাকে ক্ষুণ্ন করল?
   ক. মাখনকে　　খ. মাকে
   গ. দলের ছেলেদের　　ঘ. মামাকে

৫. আনন্দের ঔদার্যবশত ফটিক মাখনকে কি দান করে গেল?
   ক. একটি মুড়ি　　খ. ছিপ ও ঘুড়ি
   গ. ছিপ-ঘুড়ি-লাঁটাই　　ঘ. ঘুড়ি-লাঁটাই

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. ঘ. ফটিককে　২. ক. বিশ্বম্ভর　৩.খ. কলকাতায়　৪.খ. মাকে　৫. গ. ছিপ-ঘুড়ি-লাঁটাই

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি -

- কৈশোর কালের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মামির স্নেহহীনতার একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ফেলে আসা গ্রাম ও মা-এর প্রতি ফটিকের টান সম্পর্কে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামির সঙ্গে আলাপ হইল। মামি এই অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তের বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষত, তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মত পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোন কাজেও লাগে না। স্নেহ ও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানান রূপে বাড়িয়া ওঠে, লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়; লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়; কিন্তু এই সময়ের কোন স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না। এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মত হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোন অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহার পদে পদে কাঁটার মত বিঁধে।

মামির স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মত প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিককে সবচেয়ে বাজিত। মামি যদি দৈবাৎ তাহাকে কোন একটা কাজ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত - অবশেষে মামি যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, 'ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমার হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাও গে। একটু পড়ো গে যাও'। তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামির এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আঁকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চ:স্বরে স্বরচিত রাগিনী আলাপ করিয়া অকর্মন্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরূপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মত এক প্রকার অবুঝ ভালবাসা - কেবল একটু কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলি সময়ের মাতৃহীন বৎসের মত কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

প্রগলভতা – বাচাল, **কুর্গ্রহ** – দুগ্রহ, বা অতি কষ্টে গ্রহণ করা যায়, **অকর্মণ্য** – যে কাজের যোগ্য নয়, **স্রোতস্বিনী** – নদী, **অহর্নিশি** – দিনরাত্রি, **অব্যক্ত** – যা বলা হয়নি।

কাহিনী সংক্ষেপ

মামি সাদরে ফটিককে গ্রহণ করেন নি। পরিবারে অনাবশ্যক সদস্য বৃদ্ধিতে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। মামিকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেও ফটিক ব্যর্থ হয়েছে।

তের-চৌদ্দ বছর বয়সের মত বালাই আর নাই। এ সময় শৈশবের লালিত্য থাকে না কিন্তু যৌবনের স্ত্রীর আবির্ভাবও হয় না। বয়সন্ধিকালের এ সময়টিতে মা একমাত্র সন্তানের প্রতি স্নেহশীল থাকে। ফেলে আসা গ্রামের কথা ফটিকের মনে পড়ে। আর মনে পড়ে তার মায়ের কথা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন

১. ফটিককে দেখে মামির কী মনোভাব হয়েছিল?
   ক. আনন্দিত খ. উৎফুল্ল
   গ. ব্যথিত ঘ. অসন্তুষ্ট

২. পৃথিবীতে কিসের মত বালাই আর নাই?
   ক. বৃদ্ধের মা খ. অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর মত
   গ. তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মত ঘ. কিশোরীর মত

৩. ফটিকের চিত্তকে সর্বোপরি কে আকর্ষণ করত?
   ক. মা খ. প্রান্তর
   গ. নদী ঘ. মাখন

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. ঘ. অসন্তুষ্ট ২. গ. তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মত ৩. ক. মা

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি -

- স্কুলে ফটিকের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- ফটিকের প্রতি মামির দুর্ব্যবহার সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

স্কুলে এত বড় নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিতেন তখন ভারক্লান্ত গর্দভের মত নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত, তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কোন একটা ছাদে দুটি একটি ছেলেমেয়ে কিছু একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত, তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মামা, মার কাছে কবে যাব'।

মামা বলিয়াছিলেন, 'স্কুলের ছুটি হোক'। কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনও ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার

এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোন অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামির কাছে নিতান্ত অপরাধীর মত গিয়া কহিল, 'বই হারিয়ে ফেলেছি'।

মামি অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, 'বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে'।

ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল - সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের ওপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল, নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সিরসির করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল ব্যামো বাধাইলে তাহার মামির প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামি এই ব্যামোঁটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে, তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

নিরীক্ষণ – দেখা, **নাচার** – উপায়হীন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. ফটিক স্কুলে কী রকম বালক হিসেবে পরিচিত হল?
   ক. নির্বোধ ও অমনোযোগী খ. কর্তব্যহীন
   গ. নির্বাক ও অমনোযোগী ঘ. সুশীল

২. ফটিক যে অন্যের পয়সা নষ্ট করছে, তা বুঝতে পেরে কার উপর অভিমান হল?
   ক. মামা-মামির উপর খ. মামাত ভাইদের উপর
   গ. মার উপর ঘ. মাস্টারদের উপর

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. ক. নির্বোধ ও অমনোযোগী ২. গ. মার উপর

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি -

- অসুস্থ ফটিকের একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ফটিকের মৃত্যুদৃশ্যের একটি চিত্র অঙ্কন করতে পারবেন।

মূলপাঠ

পরদিন প্রাত:কালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভরবাবু পুলিশে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনও ঝুপ ঝুপ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিশের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিত বর্ণ, থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্ত:পুরে লইয়া গেলেন।

মামি তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ। দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও'।

বাস্তবিক, সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালরূপ আহারাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিটমিট করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি?

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখে মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের ওপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, বালিশ, 'মা, আমাকে মারিস নে, মা। সত্যি বলছি, আমি কোন দোষ করি নি'।

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যালফ্যাল করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, 'ফটিক, তোমার মাকে আনতে পাঠিয়েছি'।

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়ই খারাপ।

বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিত প্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতি মুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মত সুর করিয়া বলিতে লাগিল, 'এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে- এ এ-না'। কলিকাতায় আসিবার সময় কতটা রাস্তা কস্টমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত, ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উচ্চ কলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহু কষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে, তিনি শয্যার ওপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চ:স্বরে ডাকিলেন, ফটিক, সোনা মানিক আমার।

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, অ্যাঁ।

মা আবার ডাকিলেন, 'ওরে ফটিক, বাপধন রে!'

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি'।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

প্রাত:কালে – সকালে, **লোহিত বর্ণ** – লাল রং।

কাহিনী সংক্ষেপ

পরের দিন ফটিককে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার পরে পুলিশের লোক তাকে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসল। ফটিকের গায়ে প্রবল জ্বর। মাঝে মাঝেই প্রলাপ বকছে। খালাসির মত করে সে জল মাপছে। একবার জিজ্ঞেস করল- আমার ছুটি হয়েছে কিনা।

ঝড়ের বেগে ফটিকের মা ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি উচ্চস্বরে ফটিককে ডাকলেন। ফটিক বলল- মা এখন আমার ছুটি হয়েছে - এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. ফটিককে খুঁজতে বিশ্বম্ভরবাবু কাকে খবর দিলেন?
   ক. লোকজনকে খ. সন্তানদের
   গ. পুলিশকে ঘ. মাখনকে

২. ফটিক কার কাছে যাচ্ছিল?
   ক. মায়ের কাছে খ. বাবার কাছে
   গ. আত্মীয়-স্বজনের কাছে ঘ. বন্ধু-বান্ধবের কাছে

৩. ফটিক খালাসিদের মত সুর করে কী বলছিল?
   ক. এক বাঁও মেলেনা খ. এক বাঁও মেলেনা। দো বাঁও মেলে-এ
   গ. দো বাঁও মেলে না ঘ. কিছুই বলেনি

৪. ফটিক প্রলাপের ঘোরে মাকে কী বলল?
   ক. এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি
   খ. এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি মা
   গ. এখন স্কুল বন্ধ হয়েছে
   ঘ. আমি বাড়ি যাচ্ছি

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. গ. পুলিশকে ২. ক. মায়ের কাছে ৩. ক. এক বাঁও মেলে না- দো বাঁও মেলে-এ।
৪. ক. এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ছুটি গল্পটির কাহিনী নিজের ভাষায় লিখুন।
২. 'ছুটি' নামকরণ কতটুকু সার্থক আলোচনা করুন।
৩. 'ছুটি' গল্পের ফটিক চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নদীতীরে বালকদের খেলার বর্ণনা দিন।
২. বিশ্বম্ভরবাবু কে? কেন তিনি ফটিককে নিয়ে যেতে চাইলেন?
৩. ফটিকের স্কুলের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
৪. 'এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি' - কে, কী প্রসঙ্গে, কেন একথা বলেছে?

গ. ব্যাখ্যা করুন

১. তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মত পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই।
২. মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ২ : ছুটি গল্পের নামকরণ কতটুকু সার্থক আলোচনা করুন।

উত্তর : সাহিত্যের নামকরণও একটি শিল্প। নামকরণ শুধু সুন্দর হলেই হয় না। গল্প, উপন্যাস, নাঁটক - এক কথায় সাহিত্যের নামকরণকে হতে হয় সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাধারণভাবে মূল বিষয় অথবা মূল ঘটনা বা মূলভাবকে অবলম্বন করেই সাহিত্যের নামকরণ হয়।

'ছুটি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অসামান্য ছোঁগল্প। এখানে গল্পের নামকরণ হয়েছে ভাবমূলক। গল্পের কাহিনীটি আমরা সংক্ষেপে এখানে স্মরণ করতে পারি। গ্রামের ছেলে ফটিক, তার বয়স তের-চৌদ্দ বছর। সারাদিন তার কাটে গ্রামের পথে প্রান্তরে। নদীর তীরে বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করে। সেই ফটিককে নিয়ে মামা এলেন কলকাতা শহরে। উদ্দেশ্য ফটিককে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলবেন। প্রথমত ফটিকের মামি এতে অসন্তুষ্ট হলেন। ফটিক যদিও কলকাতা আসতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তার আনন্দ নিভে গেল। বাড়ির পরিবেশ বৈরি - ততোধিক বৈরি পরিবেশ স্কুলে। গ্রামের মুক্ত প্রান্তর এখানে নেই। দালানকোঠায় উঠা এ শহর ফটিকের কাছে মনে হয়েছে কঠিন ও কঠোর। লেখাপড়ায় অমনোযোগী বালক স্কুলের শিক্ষকদের কাছেও পেয়েছে অনাদর। এ বিদেশে ফটিকের বারবার মনে হয়েছে মায়ের মুখ। কিন্তু মামার কাছে ফটিক জেনেছে স্কুল ছুটি না হলে মায়ের কাছে গ্রামের বাড়িতে যাওয়া হবে না।

ফটিক একদিন অসুস্থ হয়ে গেল। অসুস্থ শরীর নিয়ে জ্বরের ঘোরে বাড়ি রওয়ানা হল। কিন্তু সে যেতে পারেনি। আরও অসুস্থ অবস্থায় পুলিশের লোক তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এল। ফটিক প্রলাপ বকে চলল। বিশ্বম্ভরবাবু ফটিকের মাকে আনার ব্যবস্থা করলেন। ফটিকের মা কাঁদতে কাঁদতে যখন ঘরে প্রবেশ করলেন - ফটিক তখন কারও দিকে না তাকিয়ে প্রলাপের ঘোরে বলল, 'মা আমার ছুটি হয়েছে।' এখানেই গল্পের সমাপ্তি।

ফটিক ছুটির অপেক্ষায় ছিল। কলকাতার এই অনাদরের জীবন থেকে মায়ের কাছে ফিরে যাবার জন্য সে আকুলতা প্রকাশ করেছে। স্কুলের ছুটি তার হয়নি। কিন্তু তার চেয়ে বড় ছুটি সে পেয়ে গেছে। এ ছুটি জীবন থেকে ছুটি। এ ছুটি অবহেলা, অনাদর ও নির্যাতন থেকে ফটিককে মুক্তি দিয়েছে। এ অর্থে ফটিকের ছুটি যথার্থই ছুটি এবং এ গল্পের ছুটি নামকরণ যুক্তিপূর্ণ ও সার্থক।

প্রশ্ন ৩ : ছুটি গল্পের ফটিক চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : 'ছুটি' গল্পের আকর্ষণীয় চরিত্র ফটিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গল্পগুচ্ছে একাধিক মনোরম বালক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। ফটিক তাদের একজন। সহজ সরল, অনাদৃত এক বালকের কাহিনী ফটিক চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

'ছুটি' গল্পে ফটিককে আমরা প্রথমে দেখতে পাই একজন দুরন্ত গ্রাম্য বালক হিসেবে। তের-চৌদ্দ বছর বয়সের এ বালকটির সারা দিন কাটে গ্রামের মাঠে-প্রান্তরে খেলাধুলা করে। কখনো সারা মাঠে ঘুড়ির পিছনে দৌড়ায়, কখনো ছোঁ নদীটিতে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাড়িতে বাবা নেই- মারা গেছেন। মা ফটিকের নানারকম দুরন্তপনায় অস্থির। ছোট ভাই মাখনের সঙ্গে নিত্য দিনের মারামারি। এসব নিয়ে মায়ের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে ফটিক। এরকম যখন অবস্থা তখন একদিন মামা বেড়াতে আসেন বোনের বাড়িতে। ফটিকের লেখাপড়া না করা ও দুরন্তপনার জন্য মামা ফটিককে কলকাতায় নিয়ে যেতে চান। সহজেই মা ও ফটিক রাজি হয়। যাবার আগে ফটিক মাখনকে তার ঘুড়ি-লাটিমসহ খেলনার যাবতীয় জিনিস দিয়ে যায়। ভাইয়ে ভাইয়ে নিত্যদিনের মারামারি চললেও সেখানে যে স্নেহের ফল্গুধারা বহমান তার পরিচয় এতেই পাওয়া যায়। কলকাতা কিন্তু গ্রাম্য বালক ফটিককে সাদরে গ্রহণ করল না। সংসারে বাড়তি লোকসংখ্যার কারণে মামি অসন্তুষ্ট। স্কুলেও সমাদর হয়নি ফটিকের। অমনোযোগী ফটিকের পড়া হত না কোন দিনই। তাই মাস্টার মশায়দের প্রহার ছিল তার প্রতিদিনের পাওনা। গ্রাম্যমুক্ত বালক কলকাতার ইট পাথরের মধ্যে জীবনের কোন উপকরণ খুঁজে পায়নি। মায়ের কাছে ফিরে যাবার জন্য ফটিকের আকুলতা বাড়তে থাকে। একদিন সাহস করে মামার কাছে প্রস্তাব দেয় মায়ের কাছে যাবার। কিন্তু মামা জানান ছুটি হলে বাড়ি যাবে। সে ছুটি ফটিকের জীবনে আর এল না।

ফটিক একদিন অসুস্থ হল- জ্বর এল। বই হারিয়ে মামির কাছে পাওয়া গঞ্জনাও আর সহ্য হচ্ছিল না। বেরিয়ে পড়ল পথে। ইচ্ছা বাড়ি যাবে। কিন্তু পুলিশ খুঁজে পেতে কদিন পরে আরও জ্বরাক্রান্ত ফটিককে ফিরিয়ে আনল। সে তখন প্রলাপ বকছে। মামা তাড়াতাড়ি মা আনবার জন্য লোক পাঠাল। ফটিকের জীবন নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি। মা যখন হাহাকার করতে করতে ঘরে প্রবেশ করল- ফটিক বলল 'মা আমার ছুটি হয়েছে, বাড়ি যাচ্ছি, মৃত্যু হল বালক ফটিকের।

ফটিকের চরিত্রে নানাবিধ বিষয় আমরা লক্ষ করি। তার দুরন্তপনা যেমন আছে, তেমনি আছে ভাই ও মায়ের প্রতি একান্ত স্নেহ ও ভালবাসা। উদারতা, কলকাতায় তার নি:সঙ্গতা, সর্বোপরি কৈশোরের এ বয়সটি তাকে সবার অনুগ্রহ বঞ্চিত করেছে। সে বাচাল নয় - প্রতিবাদ মুখর নয়। গ্রামের নিসঙ্গ নির্যাতিত বালক মাত্র। কলকাতার শহর তাকে মুক্তি দেয়নি নির্যাতন করেছে। যে বয়সে মানবিক স্নেহ-ভালবাসা প্রয়োজন সে বয়সে প্রায় সবার কাছ থেকে স্নেহে বঞ্চিত হয়েছে। এ বঞ্চনার জন্যই ফটিক মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে।

ফটিক চরিত্রটি শুধু রবীন্দ্র সাহিত্যেই নয় বাংলা সাহিত্যের নিরিখেও এক অসাধারণ চরিত্র হিসেবে পরিচিত হয়ে আছে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : নদীর তীরে খেলার দৃশ্যটি বর্ণনা করুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের সূচনা পর্বেই নদীর তীরে ছেলেদের খেলার একটি বর্ণনা আছে। ফটিক নামের ছেলেটি বালকদের সর্দার এবং দুরন্ত। নিত্য নতুন তার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি উঁকি দেয়। সেদিন নদীর তীরে বিরাঁ এক শাল গাছের গুঁড়ি পড়েছিল। সে ঠিক করল সবাই মিলে এ কাঠটি গড়িয়ে নিয়ে যাবে। যে এ কাঠের মালিক সে যথাসময়ে এসে কাঠ খুঁজতে যেয়ে কী বিপদে পড়বে তার কল্পিত চিত্র ভেবে ফটিক ও বালকেরা খুব পুলকিত। কিন্তু যখন কাঠটি গড়াতে যাবে এর আগের মুহূর্তে একটি অঘটন ঘটল। ফটিকের ছোঁ ভাই মাখন- গম্ভীর মুখে যেয়ে কাঠের গুঁড়ির উপর বসল। ফটিক ভয়ভীতি দেখালেও কোন কাজ হল না। তখন ফটিক ও বালকেরা ঠিক করল মাখনকেসহ কাঠটি গড়াবে। এটা তাদের কাছে আরও মজাদার খেলা বলে মনে হল। মাখনও ভাবল এতে তার গৌরব। কিন্তু কাঠে ঠেলা দেওয়া মাত্র মাখন মাটিতে পড়ে গেল। মাখন কেঁদে কেটে ফটিককে মারতে লাগল। মাখন মায়ের কাছে নালিশ করার জন্য বাড়ি চলে গেল। ছেলেদের খেলাও শেষ হয়ে গেল।

প্রশ্ন : 'এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি' - কে, কাকে, কেন এ কথা বলেছিল?

উত্তর : উক্তিটি 'ছুটি' গল্পের বালকদের সর্দার ফটিকের। কলকাতার জীবন ফটিকের কাছে দু:সহ হয়ে উঠেছিল। মামার বাড়িতে মামির অনাদর ও শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষ ফটিকের জন্য বহন করা কঠিন ছিল। তাছাড়া স্কুলের পরিবেশও ছিল বিরূপ। অমনোযোগী ফটিকের জন্য সেখানে প্রতিদিন প্রহার ছিল নিত্য পাওনা। কলকাতার ইট পাথরের মধ্যে বেঁচে থাকার কোন উপাদানই ফটিক খুঁজে পায়নি। তের-চৌদ্দ বছরের বালকের জন্য স্নেহময় যে আচরণ প্রয়োজন তা ফটিক পায়নি। মামা বলছিলেন ছুটি হলে বাড়ি যাওয়া যাবে। কিন্তু ছুটি তো অনেক দূরে। একদিন জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরল ফটিক। বুঝতে পারল মামির কাছে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মাত্রা কত বেড়ে যাবে। সে একা গৃহত্যাগ করল। প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় পুলিশ তাকে উদ্ধার করে আনে। তখন সে প্রলাপ বকছিল। মা খবর পেয়ে হাহাকার করতে করতে যখন ঘরে প্রবেশ করলেন তখন ফটিক বলেছিল - "এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।" ফটিকের এ কথায় মায়ের প্রতি তার ভালবাসা, গ্রামের প্রতি তার আকর্ষণ দুইই ফুটে উঠেছে।

ব্যাখ্যা উত্তর

তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মত পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই।

উত্তর: উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোঁগল্প 'ছুটি' থেকে চয়ন করা হয়েছে। এটি লেখকের উক্তি।

বয়সভেদে মানুষের দৈহিক ও মানসিক রূপান্তর ঘটে। তের-চৌদ্দ বছরের কিশোর-কিশোরীর দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের যে পূর্ণতা তা এবয়সে আসে না।

আবার শিশুর যে সারল্য ও মধুরতা তাও এ বয়সে থাকে না। এ সময়টিকে তাই বলা হয় বয়:সন্ধিকাল। এ বয়সের কিশোর-কিশোরীরা এক অর্থে অসহায়। এ সময় মায়ের স্নেহের বড় দরকার। এ স্নেহ দিয়েই এ সময়ের সঙ্কটকে কাটিয়ে উঠা যায়। যদি স্নেহের অভাব ঘটে তবে বিপর্যয় দেখা দেয়। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ এ বয়সটিকে বালাই বলেছেন।

বুদ্ধি-বিবেচনা এ বয়সে অপূর্ণ থাকে বলেই এ সময়টা পাড়ি দিতে হয় অতি সাবধানে। আর বয়সের সময়টায় বাবা মায়ের স্নেহ-ভালবাসার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

hC fs¡
fjb ®Q±dl£

লেখক পরিচিতি

প্রমথ চৌধুরী ১৮৬৮ সালের ৭ই আগস্ট যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে। তাঁর শিক্ষাজীবন অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ। কলকাতা হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন, ১৮৮৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে বি.এ ও ১৮৯০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাস করেন। ১৮৯৩ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত যান। ব্যারিস্টারি পাস করে ফিরে আসলেও তিনি ব্যারিস্টারি পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেননি। প্রমথ চৌধুরী নিজেকে প্রধানত সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত রেখেছিলেন। ১৯১৪ সালে বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'সবুজ পত্র' প্রকাশ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার ব্যবহারকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 'সবুজ পত্র' পত্রিকা এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান হাতিয়ার ছিল। চলিত রীতির সঙ্গে স্যাঁায়ার ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক একটি নতুন গদ্যধারার জন্ম দেন। এ রচনার ধারাই 'বীরবলী' গদ্যের ধারা নামে পরিচিত।

প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলী :

প্রবন্ধ গ্রন্থ: তেল-নুন-লাকড়ি (১৯০৬), বীরবলের হালখাতা (১৯১৭), নানা কথা (১৯১৯), আমাদের শিক্ষা (১৯২০), দু ইয়ারকি (১৯২১), রায়তের কথা (১৯২৬) ইত্যাদি।

গল্প গ্রন্থ : চার ইয়ারি কথা (১৯১৬), আহুতি (১৯১৯))

কাব্য : সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩)

প্রমথ চৌধুরী ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর লোকান্তরিত হন।

পাঠ পরিচিতি

'বই পড়া' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

এ প্রবন্ধে বই পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। সমাজকে সভ্য ও প্রগতিশীল হতে হলে সাহিত্য চর্চার কোন বিকল্প নেই। প্রমথ চৌধুরী তাঁর এ মতামতকে এ নিবন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি -

- সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

বই পড়া শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাইনে। প্রথমত, সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না; কেননা, আমরা জাত হিসেবে সৌখিন নই। দ্বিতীয়ত, অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন; কেননা আমাদের এখন ঠিক শখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যের দেশে সুন্দর জীবন ধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা; তখন সেই জীবনকেই সুন্দর করা, মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছে নিরর্থক এবং নির্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফল লাভের জন্য আমরা সকলে উদ্বাহু। আমাদের বিশ্বাস শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই-ই দূর করবে। এ আশা সম্ভবত দুরাশা; কিন্তু তা হলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি নে। কেননা, আমাদের উদ্ধারের জন্য কোন সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাই নে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে আমিও বিশ্বাস করি, এবং যিনিই যাই বলুন সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোন নগদ বাজার দর নেই। এই কারণে ডেমোক্রেসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডেমোক্রেসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে কিন্তু তাদের শিষ্যরা তাদের কথা উল্টো বুঝে সকলেই হতে চায় বড় মানুষ। একটি

বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডেকোক্রেসির গুণগুলো আয়ত্ত করতে না পেরে তার দোষগুলো আত্মসাৎ করেছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপদৃষ্টি আজ অর্থের ওপরই পড়ে রয়েছে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। যাঁরা হাজারখানা ল-রিপোঁ কেনেন, তাঁরা একখানা কাব্যগ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন, কেননা, তাতে ব্যবসার কোন সুসার নেই। নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে হারতে হবে সে তো জানা কথা, কিন্তু যে কথা জজে শোনে না, তার যে কোন মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয় এ সত্য তো প্রত্যক্ষ। কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও সমান সত্য যে, এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী। তারপর যে জাতি মনে বড় নয় সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়; কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টি মনসাপেক্ষ এবং মানুষের মনকে সরল সচল, সরাগ ও সমৃদ্ধ করার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের ওপরও ন্যস্ত হয়েছে। কেননা, মানুষের দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নৈরাশ্য, তার অন্তরের সত্য ও স্বপ্ন এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে সে সব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি হচ্ছে তার মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমানকাল সাহিত্যের ভিতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপমুক্ত হব।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

নিরর্থক – যার অর্থ হয় না, **উদ্বাহু** – ব্যস্ত, **ডেমোক্রেসি** – গণতন্ত্র, ইংরেজি শব্দ Democracy, **রিপোঁ** – আইন সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

কাহিনী সংক্ষেপ

বই পড়া শ্রেষ্ঠ হলেও শখ করে লেখক কাউকে বই পড়তে বলেন নি। আমরা সাহিত্যের রস গ্রহণে প্রস্তুত নই, কিন্তু শিক্ষার ফল লাভের জন্য ব্যস্ত। সাহিত্যচর্চা শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। কারণ জ্ঞানের যে শাখার চর্চাই আমরা করি না তাতে মানুষের পূর্ণতার পরিচয় নেই। একমাত্র সাহিত্যেই মানুষকে পূর্ণভাবে পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. কোনটিকে প্রমথ চৌধুরীর মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ বলেছেন?
- ক. ছবি তোলাকে
- খ. বই পড়াকে
- গ. ডাক টিকেট সংগ্রহকে
- ঘ. ঘর সাজানোকে

২. আমাদের দেশকে লেখক কী বলেছেন?
- ক. ফুল-ফল ও পাখির দেশ
- খ. বন্যা ও খরার দেশ
- গ. রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যের দেশ
- ঘ. জল-ডাঙার দেশ।

৩. কিসের জন্য আমরা উদ্বাহু?
- ক. শিক্ষার ফল লাভের জন্য
- খ. সাহিত্য চর্চার জন্য
- গ. চাকরি পাওয়ার জন্য
- ঘ. ব্যবসায় করার জন্য

৪. লেখকের মতে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ কি?
- ক. পাঠচর্চা
- খ. অভিনয় চর্চা
- গ. সাহিত্যচর্চা
- ঘ. পরচর্চা

৫. ডেমোক্রেসির গুরুরা কী চেয়েছিলেন?
- ক. সকলকে বড় করতে
- খ. সকলকে সমান করতে
- গ. সকলকে ছোঁ করতে
- ঘ. সকলকে ছোঁ-বড় করতে

৬. যাঁরা হাজারখানা ল রিপোঁ কেনেন, তাঁরা কী কেনেন না বলে লেখক বলেছেন?
- ক. একটি বই
- খ. একটি কাব্যগ্রন্থ
- গ. পোসাক-পরিচ্ছদ
- ঘ. ভাল আসবাবপত্র

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ব্যাধিই সংক্রামক ..... নয়।
২. আমরা ..... রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই; কিন্তু ..... ফল লাভের জন্য আমরা সকলে উদ্বাহু।
৩. যিনি যাই বলুন ..... যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।
৪. আমাদের শিক্ষিত সমাজের ..... আজ অর্থের ওপরই পড়ে রয়েছে।
৫. এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য সে জাতির ধনের ..... ভবানী।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. খ. বই পড়াকে ২. গ. রোগ-শোক, দুঃখ দারিদ্র্যের দেশ ৩. ক. শিক্ষার ফল লাভের জন্য
৪. গ. সাহিত্য চর্চা ৫. খ. সকলকে সমান করতে ৬. খ. একটি কাব্যগ্রন্থ
খ. ১. স্বাস্থ্য ২. সাহিত্যের, শিক্ষার ৩. সাহিত্য চর্চা
৪. লোলুপ দৃষ্টি ৫. ভাঁড়েও

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি -

- লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অতএব, দাঁড়াল এই যে, আমাদের বই পড়তে হবে, কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্মের চর্চা চাই কি মন্দিরের বাইরেও করা চলে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে এবং বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে; কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি; ও- চর্চা মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না; চিড়িয়াখানাতেও নয়।

এসব কথা যদিও সত্য হয়, তাহলে আমাদের মানতেই হবে যে, সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে। সেইজন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।

আমাদের মনে হয় এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল কলেজের চাইতে একটু বেশি। একথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন। কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন; কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছিনে, অদ্ভুত কথাও বলছিনে; যদিও এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সীমারেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি তার সত্য মিথ্যার বিচার আপনারা করবেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেকে তাহলে রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন।

আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই। এমন কি, এ ক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি এই বিশ্বাসে যে, সেখানে থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে যার সুদে তার বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যের দান গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাঁা একেবারেই ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতাম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তি ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে শিষ্য নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে অর্জন করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন যাঁরা শিশু সন্তানকে ক্রমান্বয়ে গরুর দুধ গেলানোঁাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপায় মনে করেন। দুগ্ধ অবশ্য অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির ওপর নির্ভর করে এ জ্ঞান ও শ্রেণীর মাতৃকুলের নেই। তাদের বিশ্বাস ও বস্তু পেটে গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে তাহলে সে যে বেয়াড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে বেঁধে জোর জবরদস্তি করে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষটায় সে যখন এই দুগ্ধপান ক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করার জন্য মাথা নাড়াতে, হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করে, তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন, আমার মাথা খাও, মরামুখ দেখ, এই ঢোক, আর এক ঢোক, আর এক ঢোক ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলা কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরামুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা পদ্ধতিটাও ঐ একই ধরনের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সরল মন যে ইনফ্যান্টাইল লিভারে গতাসু হচ্ছে তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিস্ট্রারি রাখা হয়, আত্মার হয় না।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

লোকমত – সাধারণ লোকের মত, **স্বশিক্ষিত** – নিজেকে যিনি নিজে শিক্ষিত করেন, **গ্রহীতা** – যিনি গ্রহণ করেন।

অন্তর্নিহিত – ভিতরে যা লুকিয়ে আছে, **জীর্ণ করা** – হজম করা, **ভোক্তা** – যিনি ভোগ করেন।

কাহিনী সংক্ষেপ

বইপড়া ও সাহিত্যচর্চার জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। যত বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হবে দেশের তত উপকার। সুশিক্ষিত প্রতিটি লোকই স্বশিক্ষিত। নিজেকে শিক্ষিত করার জন্যই লাইব্রেরি প্রয়োজন। স্কুল কলেজের যে শিক্ষা পদ্ধতি তাতে জোর করে ছাত্রকে জ্ঞান গিলিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মন যা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে না তা কোন প্রয়োজনে আসে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. সাহিত্য চর্চার জন্য কী দরকার?
   ক. কবিতা লেখা — খ. বইপড়
   গ. ম্যাগাজিন পড়া — ঘ. ছবি আঁকা

২. সাহিত্যচর্চার জন্য কী চাই?
   ক. লাইব্রেরি — খ. পত্র-পত্রিকা
   গ. স্কুল-কলেজ — ঘ. কাগজ ও কলম

৩. লাইব্রেরির সার্থকতা কিসের চেয়ে বেশি?
   ক. কলকারখানা — খ. হাসপাতাল
   গ. বাণিজ্য — ঘ. স্কুল-কলেজ

৪. সুশিক্ষিত লোকমাত্রই কিভাবে শিক্ষিত?
   ক. বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত — খ. স্বশিক্ষিত
   গ. বুদ্ধি দ্বারা শিক্ষিত — ঘ. পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষিত

৫. শিক্ষকের সার্থকতা কিসে?
   ক. ছাত্রকে শিক্ষা মুখস্থ করায় — খ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করায়
   গ. ছাত্রকে শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম করায় — ঘ. ছাত্রকে বিদ্বান করায়

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. খ. বইপড়া ২. খ. লাইব্রেরি ৩. ঘ. স্কুল-কলেজ ৪. খ. স্বশিক্ষিত
৫. গ. ছাত্রকে শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম করায়।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- স্কুল-কলেজে বিদ্যাচর্চার দুর্দশার একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমরা কিন্তু এই আত্মার অপমৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক, উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে। পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই। শিক্ষাশাস্ত্রের একজন জগদ্বিখ্যাত ফরাসি শাস্ত্রী বলেছেন যে, এক সময়ে ফরাসি দেশে শিক্ষা পদ্ধতি এতই বেয়াড়া ছিল যে, সে যুগে France was saved by her idlers : অর্থাৎ যারা পাস করতে পারেনি বা চায়নি তারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এর কারণ, হয় তাদের মনের বল ছিল বলে কলেজের শিক্ষাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, নয় সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল

বলেই তাদের মনের বল বজায় ছিল। তাই এই স্কুল-পালানো ছেলেদের দল থেকে সে যুগের ফ্রান্সের যত কৃতকর্মা লোকের আবির্ভাব হয়েছিল।

সে যুগে ফ্রান্সে কি রকম শিক্ষা দেওয়া হত তা আমার জানা নেই। তবুও আমি জোর করে বলতে পারি যে, এ যুগে আমাদের স্কুল কলেজে শিক্ষার যে রীতি চলেছে, তার চাইতে সে শিক্ষাপদ্ধতি কিছুতেই নিকৃষ্ট ছিল না। সকলেই জানেন যে, বিদ্যালয়ে মাস্টার মহাশয়েরা নোঁ দেন এবং সেই নোঁ মুখস্থ করে তারা হয় পাস। এর জুড়ি আর একটি ব্যাপারও আমাদের দেশে দেখা যায়। এদেশে একদল বাজিকর আছে, যারা বন্দুকের গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর কামানের গুলি পর্যন্ত গলাধঃকরণ করে। তারপর একে একে সবগুলো উগলে দেয়। এর ভিতর যে অসাধারণ কৌশল আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই খেলা আর ওগলানো দর্শকের কাছে তামাশা হলেও বাজিকরের কাছে তা প্রাণান্তকর ব্যাপার। ও কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অপকারী। বলা বাহুল্য, সে বেচারাও লোহার গোলাগুলোর এক কণাও জীর্ণ করতে পারে না। আমাদের ছেলেরাও তেমনি নোঁ নামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলাগুলো বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্‌গীরণ করে দেয়। এ জন্য সমাজ বাহবা দেয় দিক কিন্তু মনে যেন না ভাবে যে, এ জাতির প্রাণশক্তি বাড়ছে। স্কুল কলেজের শিক্ষা যে অনেকাংশে ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক। কেননা আমাদের স্কুল কলেজের ছেলেদের স্বক্ষিশিত হবার সে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয় স্বশিক্ষিত হবার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট করে। আমাদের শিক্ষাযন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত হয়ে বেরিয়ে আসে, তার আপনার বলতে বেশি কিছু থাকে না, যদি না তার প্রাণ অত্যন্ত কড়া হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এই ক্ষীণপ্রাণ জাতির মধ্যেও জনকতক এমন কঠিন প্রাণের লোক আছে, এহেন শিক্ষাপদ্ধতিও তাদের মনকে জখম করলেও একেবারে বধ করতে পারে না।

আমি লাইব্রেরিকে স্কুল কলেজের ওপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এস্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতিটি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুল কলেজ বর্তমানে আমাদের যে অপকার করছে সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। আমি পূর্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়, তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে এক রকম মনের হাসপাতাল। অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষত প্রাচীন নজির দেখাবার কি প্রয়োজন ছিল? বই পড়া যে ভাল, তা কে না মানে? আমার উত্তর সকলে মুখে মানলেও কাজে মানে না। মুসলমান ধর্মে মানবজাতি দুই ভাগে বিভক্ত। যারা কেতাবি, আর এক যারা তা নয়। বাংলায় শিক্ষিত সমাজ যে পূর্বদলভুক্ত নয়, একথা নির্ভয়ে বলা যায় না; আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের ওপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোঁ পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, দুই-ই বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ পেটের দায়ে। সেইজন্য সাহিত্যচর্চা দেশে একরকম নেই বললেই হয়; কেননা, সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না। বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্মার দলেই ফেলে দিই; অথচ একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের সন্তোষ নেই। একমাত্র উদরপূর্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না। একথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না; কিন্তু একথা আমরা সকলেই মানিনে যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরই কর্তব্য, কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্তব্য নয়। মানুষের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে যে মানুষের প্রাণ মনের সম্পর্ক যত হারায় ততই তা দুর্বল হয়ে পড়ে। মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্তিলাভ করে না; তারপর যে জাতি যত নিরানন্দ সে জাতি তত নির্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব, সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা। অতএব, কোনো নীতির অনুসারেই তা কর্তব্য হতে পারে না। অর্থনীতিরও নয়, ধর্মনীতিরও নয়।

কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়, আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই সে নির্জীব একথা যেমন সত্য, যে নির্জীব তারও আনন্দ নেই, সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জীব করেছে। জাতির আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উলটো টান যে আমাদের টানতে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চার স্বপক্ষে এত বাক্য ব্যয় করলুম। সে বাক্যে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছি কিনা জানিনে। সম্ভবত হইনি। কেননা, আমাদের দুরবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন খালি কোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

কৃতকর্মা - বিখ্যাত, **গলাধঃকরণ** - গিলে ফেলা, **কারদানি** - বাহাদুরি, **কেতাবি** - সেকেলে।

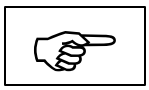

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

এক কথায় উত্তর দিন

১. পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া কী এক?
২. মাস্টার মশায়রা বিদ্যালয়ে কী দেন?
৩. স্কুল-কলেজে কী হবার সুযোগ দেয় না?
৪. সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে কিসের কাজে লাগে না?
৫. মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের কী বাঁচে না।
৬. আমাদের শিক্ষাই আমাদের কী করেছে?

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. না ২. নোঁ ৩. স্বশিক্ষিত ৪. উদরপূর্তির ৫. আত্মা ৬. নির্জীব

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'বই পড়া' প্রবন্ধ অবলম্বনে লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
২. লেখক সাহিত্যচর্চার উপর কেন গুরুত্ব আরোপ করেছেন?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বইপড়া প্রবন্ধে লেখক শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি সম্পর্কে কী বলেছেন?
২. 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন কেন?

গ. ব্যাখ্যা করুন

১. সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।
২. আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই, কিন্তু শিক্ষার ফললাভের জন্যে আমরা সকলেই উদ্বাহু।
৩. ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।
৪. কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্মার দলে ফেলে দিই।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : 'বই পড়া' প্রবন্ধ অবলম্বনে লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গদ্যলেখক ও সাহিত্যে চলিত ভাষা প্রয়োগের পথিকৃৎ প্রমথ চৌধুরী 'বইপড়া' প্রবন্ধটি লিখেছেন। একটি লাইব্রেরির বার্ষিক সভায় প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল। মানুষকে সুশিক্ষিত করে তোলার জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা যে জরুরি - এ গুরুত্বপূর্ণ কথাটিই প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন।

অসংখ্য গ্রন্থের যেখানে সমাহার থাকে, বিভিন্ন বয়সের শ্রেণীর মানুষ যেখানে অবাধে বই পড়তে পারে- এর একটি প্রতিষ্ঠানকেই বলে লাইব্রেরি। তবে লাইব্রেরি আরও অনেক রকম হতে পারে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই মূল উদ্দেশ্য পড়া।

শিক্ষার জন্য ও জ্ঞানার্জনের জন্য আমরা শিশু-কিশোরদের স্কুল-কলেজে পাঠাই। কিন্তু আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে শিক্ষার যে ধারা তাতে সেখান থেকে কেউ শিক্ষিত হয়ে বেরোতে পারে না। যে শিক্ষার পিছনে আছে জোর-জবরদস্তি তা কার্যকর হয় না। পৃথিবীতে যাঁরা সুশিক্ষিত তাঁরা সবাই স্বশিক্ষিত। অর্থাৎ নিজেকে নিজে তাঁরা শিক্ষিত করে তুলেছেন। আর নিজেকে নিজে শিক্ষিত করার জন্য যা দরকার তা লাইব্রেরি। লাইব্রেরি যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কত উপকার করে তার ইয়ত্তা নেই।

বই মনের রাজ্যকে প্রসারিত করে। শরীর বৃদ্ধির জন্য যেমন খাদ্য প্রয়োজন তেমনি মনের স্বাস্থ্য বিধানের জন্য প্রয়োজন বই পড়া। বই পড়তে হবে বিচিত্র ধরনের, বিচিত্র বিষয়ের। এ সুযোগ দিতে পারে কেবল লাইব্রেরি। তাই বেশি হারে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

ধনার্জন মানব জীবন রক্ষা ও সৌন্দর্যপূর্ণ করার জন্য অবশ্য দরকার। কিন্তু জ্ঞান ছাড়া ধনার্জন সম্ভব নয়। ধনের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে হলে তাই জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য হলে হয় না। আর জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে হলে প্রয়োজন বই পড়া। তবে লেখকের ভাষায়- যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়। আর মনে বড় হতে হলে বই পড়তে হয়। বই পড়া মানে সাহিত্য চর্চা। লেখক আর সবের চর্চার চাইতে সাহিত্য চর্চাকে বড় করে দেখছেন। ধর্মের চর্চা মন্দিরের বাইরেও চলতে পারে, দর্শনের চর্চা গুহায় কিন্তু সাহিত্য চর্চার জন্য প্রয়োজন লাইব্রেরি।

সুস্থ সবল মানসিকতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন বইপড়া। লাইব্রেরিকে বলা যায় মনের হাসপাতাল। হাসপাতালে যেমন রোগমুক্তি ঘটে লাইব্রেরিতে ঘটে মনের মুক্তি। লাইব্রেরি আমাদের নির্জীবতা থেকে মুক্তি দেয়। আমরা হয়ে উঠি সজীব।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি লাইব্রেরি আমাদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কতটা প্রয়োজনীয়। সুশিক্ষিত হওয়ার জন্য, সাহিত্য চর্চার জন্য, মনকে সতেজ রাখার জন্য, অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ও সৌন্দর্যময় জীবনের জন্য বই পড়া অপরিহার্য। আর বই পড়ার অবাধ সুযোগ সৃষ্টির জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন : 'বইপড়া' প্রবন্ধে লেখক সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে কী বলেছেন, বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর : বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম বলিষ্ঠ রূপকার প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'বইপড়া' প্রবন্ধে সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। প্রবন্ধটি একটি লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে পঠিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধে লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও সমাজে লাইব্রেরির উপযোগিতার কয়েকটি দিক তুলে ধরা। সে প্রসঙ্গে সাহিত্যচর্চার কথাও এসেছে।

সাহিত্য হচ্ছে মনের কথা। বিভিন্ন আঙ্গিকে শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে মনের কথা যখন কাগজে কলমে প্রকাশ পায়- তাই হয় সাহিত্য। 'সাহিত্য' শব্দটি এসেছে 'সহিত' শব্দ থেকে যার অর্থ সাথে বা সঙ্গে। সাহিত্য একটি মনের সঙ্গে আরেকটি মনের মিলন ঘটায়। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই আমরা সমাজ ও মানুষকে দেখি ও বুঝি। তাই সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গভীর। প্রমথ চৌধুরীর মতে "মানুষের দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নৈরাশ্য, তার অন্তরের সত্য ও স্বপ্ন সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম।

মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা নানান শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যেমন- বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি। শিক্ষা লাভের জন্য এ সব জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন না কোন শাখার চর্চা করতে হয়। তবে মনের সম্পূর্ণতা ও মানব সমাজকে জানার জন্য সাহিত্যচর্চা করতে হয়। তবে আমাদের শিক্ষিত সমাজ সাহিত্যচর্চার সুফল সম্পর্কে সম্ভবত সন্ধিহান। কারণ সাহিত্যের কোন বাজার দর নেই। মামলায় জেতার জন্য যিনি হাজারখানা ল রিপোর্ট কেনেন তিনি সাহিত্যের একটি বইও কেনেন না। কারণ কোর্টে কবিতা আওড়ালে মামলায় জয়লাভ করা যায় না। অথচ মনকে সচল, সবেগ, সতেজ করার জন্য সাহিত্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। মানুষের দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মচিন্তা, অনুরাগ-বিরাগ স্বপ্ন ও সত্য সবই একসঙ্গে ধরা দেয় সাহিত্যে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। মনের জানালাকে এ শিক্ষা না খুলে দিয়ে আরও বন্ধ করে দেয়। ফলে ছাত্র হয়ে পড়ে নির্জীব। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এ ত্রুটি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আরও বেশি করে সাহিত্যচর্চা করা প্রয়োজন।

সাহিত্যই সভ্যতার মাপকাঠি। আর সাহিত্য হচ্ছে মন ও মননের চর্চা। আমাদের শিক্ষা-সভ্যতা নির্ভর করে সাহিত্যচর্চার ওপর। তাই লেখক প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যচর্চার উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : 'বইপড়া' প্রবন্ধে লেখক শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি সম্পর্কে কী বলেছেন?

উত্তর : বিখ্যাত প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'বইপড়া' প্রবন্ধে শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। এতে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু এক্ষেত্রে সহায়ক মাত্র। আমাদের স্কুল-কলেজে শিক্ষা পদ্ধতি ঠিক এর উল্টো। গুরু শিষ্যকে বিদ্যা গেলান - তারা জীর্ণ করতে পারুক আর না পারুক।

আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রদের নোঁ দেন। সেটা মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় উগরে দিতে পারলেই পাস হয়। সমাজ এর জন্য বাহবাও দেয়। কিন্তু এতে জাতির প্রাণশক্তি বাড়ে না, কোন উপকারও হয় না। স্কুল কলেজের এ শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এতে শিক্ষার্থীদের স্বশিক্ষিত হবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ লুপ্ত করে দেয়।

ব্যাখ্যা উত্তর

১. সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।

উত্তর: উদ্ধৃত অংশটি বিখ্যাত প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী রচিত 'বইপড়া' নামক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে লেখক সুশিক্ষিত হওয়ার পদ্ধতি নিয়ে মন্তব্য করেছেন।

'সুশিক্ষিত' শব্দের অর্থ উত্তম বা ভালভাবে যিনি শিক্ষিত এবং 'স্বশিক্ষিত' শব্দের অর্থ যিনি নিজেকে নিজে শিক্ষিত করেছেন। লেখকের মতে স্কুল-কলেজের শিক্ষা আমাদের জীবনী শক্তি নষ্ট করছে। কারণ এখানের শিক্ষা পদ্ধতিটাই বৈরী। মাস্টার মশায়রা নোঁ দেন- ছাত্ররা তা মুখস্থ করে পাস করে। সমাজ তাদের বাহবা দেয়। কিন্তু এ শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়। এ শিক্ষায় মন বিকশিত হয় না। ছাত্র নিজের গরজে কিছু শেখে না বলে তার মধ্যে কৌতূহল জাগে না। গুরুর কাছে বিদ্যা অর্জনের উপায়টাই জানা যায়। যিনি যথার্থ গুরু তিনি ছাত্রের মনকে জাগিয়ে দেন মাত্র। ছাত্র তখন নিজের চেষ্টাতেই জ্ঞান অর্জনে প্রবৃত্ত হয়। নিজেকে নিজে শিক্ষিত করার দায়িত্ব নেয় ছাত্র। এ ছাত্রই হয় স্বশিক্ষিত। আর এ ছাত্রই হতে পারে সুশিক্ষিত কারণ নোঁ বইয়ের বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত তার কৌতূহল বিস্তৃত হয়। এজন্যই লেখক বলেছেন প্রকৃত শিক্ষিত অর্থাৎ সুশিক্ষিত হতে হলে নিজেকে নিজে শিক্ষিত করতে হবে অর্থাৎ স্বশিক্ষিত হতে হবে।

পৃথিবীর সকল মহৎ মানুষই স্বশিক্ষিত। বিদ্যালয়ের চৌকাঠের বাইরে তাঁরা নিজেদের শিক্ষিত করেছেন নানা বিষয়ে। তাই তাঁরা আজও প্রাতঃস্মরণীয়। সেদিক থেকে প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরীর মতামত যথার্থ।

২. ব্যাধিই সংক্রামক স্বাস্থ্য নয়

উত্তর: উদ্ধৃত অংশটি বিখ্যাত প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরীর 'বইপড়া' নামক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে লেখক ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্রের দোষ-গুণ ও আমাদের সমাজ সম্পর্কে একটি রূপক মন্তব্য করেছেন।

ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র মানব সভ্যতার একটি বড় অর্জন। গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ও জনগণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষকে ক্ষমতার উৎস হিসাবে বলা হয়েছে। ডেমোক্রেসির গুরু বা প্রবক্তা সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল তাঁরা চেয়েছিলেন জনগণের মঙ্গল। গণতন্ত্রে মানুষকে সমান অর্থাৎ সমমর্যাদা, যোগ্যতা ও ক্ষমতার অধিকারী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের শিষ্যরা উল্টো বুঝে সবাইকে করতে চায় বড় মানুষ। এটি গণতন্ত্রের দোষ। গণতন্ত্রের ভাল দিক প্রচুর। কিন্তু প্রয়োগের অদূরদর্শিতার কারণে এরকম গণতন্ত্রের দোষও দেখা গেছে। আমরা গণতন্ত্রের এ দোষগুলোকে যতখানি গ্রহণ করেছি গুণগুলোকে ততটা নয়। এজন্যই লেখক স্বাস্থ্য ও ব্যাধির প্রসঙ্গ টেনেছেন।

স্বাস্থ্য নিজ শ্রমে অর্জন করতে হয়। কিন্তু ব্যাধি এমনিই বিস্তার লাভ করে ও শরীরকে আক্রমণ করে। গণতন্ত্রের দোষগুলোকে লেখক বলেছেন ব্যাধি। এগুলো এমনিই আমাদের সমাজে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু যা স্বাস্থ্য, যা ভাল থাকে প্রতিদিন চর্চায় অর্জন করতে হয় তা আমরা অর্জন করতে পারিনি। অর্থাৎ গণতন্ত্রের খারাপ দিকগুলো আমরা পেয়েছি - ভালো দিকগুলো অর্জন করিনি।

স্বাস্থ্য ও ব্যাধির প্রসঙ্গ দিয়ে গণতন্ত্রের ভাল-মন্দ দিক ও আমাদের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী একটি সার্থক তির্যক বাক্য প্রয়োগ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

j-qn

nlvQ¾c Q--¡f¡dÉ¡u

লেখক পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। ভাগলপুর থেকে ১৮৯৪ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। দারিদ্র্যের কারণে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ হয়নি। ১৯০৩ সালে ভাগ্যের খোঁজে রেঙ্গুন যান এবং সেখানে কেরানী পদে একটি চাকুরি পান।

প্রবাস জীবনে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯১৬ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন ও সার্বক্ষণিক সাহিত্যচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। শরৎচন্দ্র তাঁর সমকালেই কথাসাহিত্যিক হিসাবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য-

উপন্যাস ঃ বড়দিদি (১৯১৩), পরিণীতা (১৯১৪), পল্লী সমাজ (১৯১৬), বৈকুন্ঠের উইল (১৯১৬), দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), শ্রীকান্ত (৪ পর্ব, ১৯১৭-১৯৩৩), গৃহদাহ (১৯২০), দেনা পাওনা (১৯২৩), পথের দাবী (১৯২৬), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১)।

গল্প গ্রন্থ ঃ মেজদিদি (১৯১৫), দর্পচূর্ণ (১৯১৫), হরিলক্ষ্মী (১৯২৬), বিলাসী (১৯২০), মামলার ফল ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্র ১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ পরিচিতি

'মহেশ' গল্পটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'হরিলক্ষ্মী' গল্পগ্রন্থ থেকে সঙ্কলন করা হয়েছে।

দরিদ্র ও নির্যাতিত মানুষের প্রতি শরৎচন্দ্রের অপরিসীম সহানুভূতি ছিল। এ গল্পে লেখকের সে সহানুভূতি নিজের সমাজ ও শ্রেণীকে অতিক্রম করে গেছে। মুসলিম সমাজের দরিদ্রতর মানুষের বেদনাময় জীবন কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। কৃষিনির্ভর জীবনে পশুও পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যায় সেটিও নিপুণভাবে লেখক প্রকাশ করেছেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- দরিদ্র গফুরের ঘর-সংসারের একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- গৃহপালিত পশুর প্রতি গফুরের প্রীতির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তর্করত্নের চরিত্রের পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

গ্রামের নাম কাশীপুর।

পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহর বেলায় বাটী ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নেই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মত তাহাদের সর্পিল উর্ধ্বগতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিম ঝিম করে- যেন নেশা লাগে।

ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর মিঞার বাড়ি। তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে এবং অন্তঃপুরের লজ্জা সম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিত হইয়াছে।

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিলেন, ওরে, ও গফরা, বলি ঘরে আছিস?

তাহার বছর-দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন বাবাকে? বাবার যে জ্বর!

ডেকে দে তাকে। পাষণ্ড!

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙা প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া একটা পুরাতন বাবলা গাছ তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্ছে কি শুনি? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁজে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে মুখ দিয়া তপ্ত খরবাক্যই বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।

তর্করত্ন বলিলেন, যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফেরবার পথে দেখছি তেমনি ঠাঁয় বাঁধা। গোহত্যা হলে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়।

কি করব বাবাঠাকুর, বড় লাচারে পড়ে গেছি। কদিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধরে যে দুমুঠো খাইয়ে আনব তা মাথা ঘুরে পড়ে যাই।

তবে ছেড়ে দে না, আপনি চরাই করে আসুক।

কোথায় চড়াব বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনও সব ঝাড়া হয়নি- খামারে পড়ে খড় এখনও গাছি দেওয়া হয়নি, মাঠের আলগুলো সব জ্বলে গেল- কোথাও এক মুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে, ক্যাম্‌নে ছাড়ি বাবাঠাকুর?

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, না ছাড়িস্ তা ঠাণ্ডায় কোথাও বেঁধে দিয়ে দু আঁটি বিচুলি ফেলে দে না ততক্ষণ চিবোক। তোর মেয়ে ভাত রাঁধে নি? ফ্যানে-জলে দে না এক গামলা খাক্।

গফুর জবাব দিল না। নিরুপায়ের মত তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তর্করত্ন বলিলেন, তাও নেই বুঝি? কি করলি খড়? ভাগে এবার যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? গরুটার জন্য এক আঁটি ফেলে রাখতে নেই? ব্যাটা কসাই!

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন-খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্তামশায় সব ধরে রাখলেন। কেঁদে কেটে হাতে-পায়ে পড়ে বললাম, বাবুমশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাব কোথায়, আমাকে পণদশেক বিচুলিই না হয় দাও। চালে খড় নেই- একখানি ঘর, বাপ-বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গোঁজাগাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে আমার মহেশ মরে যাবে।।

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, ইস! সাধ করে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ! হেসে বাঁচি নে!

কিন্তু এ বিদ্রুপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল, কিন্তু হাকিমের দয়া হল না। মাস দুয়েক খোরাকের মত ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হয়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে, না। বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল।

কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না; কহিলেন, আচ্ছা মানুষ ত তুই-খেয়ে রেখেছিস, দিবি নে? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে নাকি? তোরা ত রামরাজত্বে বাস করিস - তাই তাঁর নিন্দে করে মরিস।

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে করব কেন বাবাঠাকুর, নিন্দে তার আমরা করি নে। কিন্তু কোথা থেকে দিই, বলত? বিঘে চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপরি উপরি দু সন অজন্মা-মাঠের ধান মাঠেই শুকিয়ে গেল, বাপ বেটিতে দুবেলা দুটো পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পাইনি। ঘরের পানে চেয়ে দেখ, বিষ্টি বাদলে মেয়েটিকে নিয়ে, কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজরা গোনা যাচ্ছে, দাও না ঠাকুরমশাই, কাহন-দুই ধার, গরুটাকে দুদিন পেট পুরে খেতে দিই। বলিতে বলিতেই সে ধপ্ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন তীরবৎ দু পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, আ মর, ছুঁয়ে ফেলবি না কি?

না বাবাঠাকুর, ছোঁব কেন, ছোঁব না। কিন্তু দাও এবার আমাকে কাহন- দুই খড়। তোমার চার চারটে গাদা সে দিন দেখে এসেছি- একটি দিলে তুমি টেরও পাবে না। আমরা না খেয়ে মরি ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার অবলা জীব কথা বলতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

তর্করত্ন কহিলেন, ধার নিবি, শুধবি কি করে শুনি? গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, যেমন করে পারি শুধব বাবাঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

তর্করত্ন মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া গফুরের ব্যাকুল-কণ্ঠের অনুকরণ করিয়া কহিলেন, ফাঁকি দেব না! যেমন করে পারি শুধব! যা যা সর, পথ ছাড়। ঘরে যাই, বেলা হয়ে গেল। এই বলিয়া তিনি একটু মুচকি হাসিয়া পা বাড়াইয়াই সহসা সভয়ে পিছাইয়া দিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, আরে, শিং নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে না কি?

গফুর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরের হাতে ফলমূল ও ভিজা চালের পুঁটলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, গন্ধ পেয়েছে একমুঠো খেতে চায়।

খেতে চায়? তা বটে! যেমন চাষী, তার তেমনি বলদ। খড় জোটে না, চাল-কলা খাওয়া চাই! নে নে, পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ। যে শিং, কোন্ দিন দেখছি কাকে খুন করবে। এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নিবিড় গভীর কাল চোখ দুটি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা, কহিল, তোকে দিলে না এক মুঠো? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না। না দিকগে। তাহার গলা বুজিয়া আসিল, তার পরে চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস, তোকে আমি পেট পুরে খেতে দিতে পারি নে, কিন্তু তুই ত জানিস তোকে আমি কত ভালবাসি।

মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল। গফুর চোখের জল গরুটার পিঠের উপর রগড়াইয়া মুছিয়া ফেলিয়া তেমনি অস্ফুটে কহিতে লাগিল, জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশানধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা বিলি করে দিলে। এই দুর্বচ্ছরে তোকে কেমন করে বেঁধে রাখি বল? ছেড়ে দিলে তুই পরের গাদা ফেলে খাবি। দেশের কেউ তোকে চায় না- লোকে বলে তোকে গোহাটায় বেচে ফেলতে। কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই আবার তাহার দু চোখ বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া গফুর একবার এদিকে ওদিকে চাহিল। তার পরে ভাঙা ঘরের পিছন হতে কতকটা পুরানো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছে রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, নে, শীগগির করে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হলে আবার-

বাবা!

কেন মা?

ভাত খাবে এসো। বলিয়া আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েছে বাবা?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল, লজ্জিত হইয়া বলিল, পুরানো পচা খড় মা, আপনিই ঝরে যাচ্ছিল-

আমি যে ভেতর থেকে শুনতে পেলাম বাবা, তুমি টেনে বার করছ?

না, মা, ঠিক টেনে নয় বটে-

কিন্তু দেয়ালটা যে পড়ে যাবে বাবা-

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটি মাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গিয়াছে এবং এমন করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না, এ কথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশি জানে? অথচ এ উপায়েই বা কটা দিন চলে।

মেয়ে কহিল, হাত ধুয়ে ভাত খাবে, এসো বাবা, আমি বেড়ে দিয়েছি।

গফুর কহিল, ফ্যানটুকু দে ত মা, একেবারে খাইয়ে দিয়ে যাই।

ফ্যান যে আজ নেই বাবা, হাড়িতেই মরে গেছে।

নেই? গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে এটুকুও যে নষ্ট করা যায় না এই দশ বছরের মেয়েটা তাহাও বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির সানকিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, আমিনা, আমার গায়ে যে আবার শীত করে মা- জ্বরগায়ে খাওয়া কি ভাল?

আমিনা উদ্বিগ্ন মুখে কহিল, কিন্তু তখন যে বললে, বড় ক্ষিদে পেয়েছে?

তখন? হয়ত জ্বর ছিল না মা।

তাহলে তুলে রেখে দি, সাঁঝের বেলা খেয়ো।

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়বে আমিনা।

আমিনা কহিল, তবে?

গফুর কত কি যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল; কহিল, এক কাজ কর না মা, মহেশকে না হয় ধরে দিয়ে আয়। তখন রাতের বেলা আমাকে এক মুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবি নে আমিনা? প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তার পরে মাথা নিচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পারব বাবা।

গফুরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আরও এক জন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ করিলেন।

শব্দার্থ

বাটী – বাড়ি, **ধরিত্রী** – পৃথিবী।

কাহিনী সংক্ষেপ

দীন দরিদ্র গফুরের সংসারে আছে সে আর তার একমাত্র মেয়ে আমেনা। বাড়িতে আছে একটি ষাঁড়- গফুর যার নাম দিয়েছে মহেশ। মহেশ এখন বুড়ো হয়েছে। এখন আর তেমন কাজে লাগে না। তবু মহেশের প্রতি গফুরের দয়া মায়া মমতা এত বেশি যে তাকে সে বিক্রি করে দিতে চায় না। তবে তাকে যে খাওয়াতে পারে না- এজন্য কষ্ট পায় গফুর। তাদেরও দুবেলা ভাত জোটে না - রোগে জোটে না পথ্য অথবা ওষুধ। এত কষ্টের মধ্যেও মহেশের প্রতি গফুর অকৃতজ্ঞ হতে চায় না। সে স্মরণ করে আট বছর এ মহেশই তাঁর ক্ষুধার অন্ন যুগিয়েছে।

তর্করত্ন পূজারী ব্রাহ্মণ। নিজের এবং শ্রেণী স্বার্থ সে ভালই বোঝে। সে গফুরকে ধমকায় গো দেবতাকে কষ্ট দিচ্ছে বলে। কিন্তু ধার্মিক ধর্মরক্ষার জন্য মহেশকে দুমুঠো খড় দান করতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. শরৎচন্দ্র কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
   ক. ১৮৫০ সালে — খ. ১৮৭৬ সালে
   গ. ১৮৮৯ সালে — ঘ. ১৯৬১

২. শরৎচন্দ্র বার্মায় গিয়েছিলেন কেন?
   ক. ভ্রমণ করতে — খ. আত্মীয় বাড়িতে
   গ. ভাগ্যান্বেষণে — ঘ. লেখা-পড়া করতে

৩. নিচের কোনটি শরৎচন্দ্র লিখিত উপন্যাস?
   ক. বিষবৃক্ষ — খ. নৌকাডুবি
   গ. কৃষ্ণকান্তের উইল — ঘ. গৃহদাহ

৪. অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে কী ঝরে পড়ছে বলে লেখক অনুমান করছেন?
   ক. আগুন — খ.বজ্র
   গ. তাপ — ঘ. দাবদাহ

৫. 'সুতরাং সে মুখ দিয়া তপ্ত খর বাক্যই বাহির হইতে লাগিল' - কার মুখ দিয়ে?
   ক. জমিদার — খ. তর্করত্ন
   গ. দারোয়ান — ঘ. আমিনা

৬. 'ব্যাটা কসাই' - কাকে বলা হয়েছে?
   ক. গুরু ক্রেতাকে — খ. তর্করত্নকে
   গ. গফুরকে — ঘ. জনৈক ব্যক্তিকে

৭. গফুরের ষাঁড়টির নাম কি?
   ক. দেবেশ — খ. মহেশ
   গ. লালু — ঘ. কালু

৮. তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারিনে, কিন্তু তুইত জানিস তোকে আমি কত ভালবাসি। কাকে বলা হয়েছে?
   ক. পুত্রকে — খ. কন্যাকে
   গ. মহেশকে — খ. ভিখারিকে

খ) এক কথায় উত্তর লিখুন

১। গফুর দরিদ্র না ধনী।

২। আট সন গফুরকে কে প্রতিপালন করেছে?

৩। গফুরের সংসারের আরেকজন সদস্যের নাম কি?

৪। তর্করত্ন গফুরকে সাহায্য করেছিল?
৫। তর্করত্ন কী রকম লোক?
৬। 'পুরানো পচা খড় মা, ... কে বলেছিল?

গ) সত্য হলে স মিথ্যা হলে মি লিখুন

১. মহেশ একটি বালকের নাম ☐
২. তর্করত্ন গ্রামের জমিদার ☐
৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'মহেশ' গল্পটি লিখেছেন। ☐
৪. শরৎচন্দ্র ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ☐
৫. শরৎচন্দ্র ভাষান্বেষণে রেঙ্গুন গিয়েছিলেন। ☐
৬. গফুর মাঝে মাঝে মহেশের সঙ্গে কথা বলত। ☐
৭. আমিনা গফুরের একমাত্র মেয়ে ☐
৮. গফুর নিজের ভাত মহেশকে খাওয়াতে বলেছিল। ☐

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক) ১. খ) ১৮৭৬ সালে ২. গ) ভাগ্যান্বেষণে ৩. ঘ) গৃহদাহ
৪. ক) আগুন ৫। খ) তর্করত্ন ৬। গ) গফুরকে ৭। খ) মহেশ ৮। গ) মহেশকে
খ) ১। দরিদ্র ২। মহেশ ৩। আমিনা ৪। না ৫। সুবিধাবাদী ৬। গফুর
গ) ১। মি ২। মি ৩। স ৪। স ৫। স ৬। স ৭। স ৮। স

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- গফুরের মানসিক অবস্থার বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- গল্পটির সমাপ্তি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

পাঁচ সাত দিন পরে এক দিন পীড়িত গফুর চিন্তিত-মুখে দাওয়ায় বসিয়াছিল, তাহার মহেশ কাল হইতে এখন পর্যন্ত ঘরে ফিরে নাই। নিজে সে শক্তিহীন, তাই আমিনা সকাল হইতে সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত বেলায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শুনেছ বাবা, মানিক ঘোষেরা আমাদের মহেশকে থানায় দিয়েছে।

গফুর কহিল, দুর পাগলি!

হাঁ বাবা, সত্যি, তাদের চাকর বলল, তোর বাপকে বলগে যা দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে খুঁজতে।

কি করেছিল সে?

তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেছে বাবা। গফুর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মহেশের সম্বন্ধে সে মনে মনে বহু প্রকারের দুর্ঘটনা কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু ও আশঙ্কা ছিল না। সে যেমন নিরীহ তেমনি গরিব, সুতরাং প্রতিবেশী কেহ তাহাকে এত বড় শাস্তি দিতে পারে এ ভয় তাহার নাই। বিশেষত মানিক ঘোষ। গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি তাহার এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

মেয়ে কহিল, বেলা যে পড়ে এল বাবা, মহেশকে আনতে যাবে না?

গফুর বলিল, না।

কিন্তু তারা যে বলল তিন দিন হলেই পুলিশের লোক তাকে গোহাটায় বেচে ফেলবে।

গফুর বলিল, ফেলুক গে।

গোহাটা বস্তুটা যে ঠিক কি, আমিনা তাহা জানিত না, কিন্তু মহেশের সম্পর্কে ইহার উল্লেখমাত্রই তাহার পিতা যে কিরূপ বিচলিত হইয়া উঠিত ইহা সে বহুবার লক্ষ করিয়াছে। কিন্তু আজ সে আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাত্রের অন্ধকারে লুকাইয়া গফুর বংশীর দোকানে আসিয়া কহিল, খুড়ো, একটা টাকা দিতে হবে। এই বলিয়া সে তাহার পিতলের থালাটি বসিবার মাচার নিচে রাখিয়া দিল। এই বস্তুটির ওজন ইত্যাদি বংশীর সুপরিচিত। বছর দুয়ের মধ্যে সে বার পাঁচেক ইহাকে বন্ধক রাখিয়া একটি করিয়া টাকা দিয়াছে। অতএব আজও আপত্তি করিল না।

পরদিন যথাস্থানে আবার মহেশকে দেখা গেল। সেই বাবলা তলা, সেই দড়ি, সেই খুঁটা, সেই তৃণহীন শূন্য আধার, সেই ক্ষুধাতুর কাল চোখের সজল উৎসুক দৃষ্টি। একজন বুড়োগোছের মুসলমান তাহাকে অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছে। অদূরে একধারে হাঁটু জড় করিয়া গফুর মিঞা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। পরীক্ষা শেষ করিয়া বুড়া চাদরের খুঁট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া বার বার মসৃণ করিয়া তাহার কাছে গিয়া কহিল, আর ভাঙাব না, এই পুরোপুরিই দিলাম। নাও।

গফুর হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া তেমনি নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। যে দুই জন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা গরুর দড়ি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দড়িতে হাত দিয়ো না বলছি- খবরদার বলছি, ভাল হবে না!

তাহারা চমকিয়া গেল। বুড়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন? গফুর তেমনি রাগিয়া জবাব দিল, কেন আবার কি! আমার জিনিস আমি বেচব না- আমার খুশি। বলিয়া সে নোটখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহারা কহিল, কাল পথে আসতে বায়না নিয়ে এলে যে?

এই নাও তোমাদের বায়না ফিরিয়ে! বলিয়া সে ট্যাক হইতে দুটা টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল।

একটা কলহ বাঁধিবার উপক্রম হয় দেখিয়া বুড়ো হাসিয়া ধীরভাবে কহিল, চাপ দিয়া আর দুটা বেশি নেবে, এই ত? দাও হে পান খেতে ওর মেয়ের হাতে দুটো টাকা দাও। কেমন, এই না?

না।

কিন্তু এর বেশি কেউ একটা আধলা দেবে না তা জানো?

গফুর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

বুড়ো বিরক্ত হইল, কহিল, তা ত কি? চামড়াটাই যে দামে বিকোবে, নইলে মাল আর আছে কি?
তোবা! তোবা! গফুরের মুখ দিয়া হঠাৎ একটা কটু কথা বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া চিৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিল যে, তাহা যদি অবিলম্বে গ্রাম ছাড়িয়া না যায় ত জমিদারের লোক ডাকিয়া জুতাপেটা করিয়া ছাড়িবে।
হাঙ্গামা দেখিয়া লোকগুলো চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণেই জমিদার সদর হইতে তাহার ডাক পড়িল। গফুর বুঝিল, এ কথা কর্তার কানে গিয়াছে।
সদরে ভদ্র অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়াছিল। শিববাবু চোখ রাঙা করিয়া কহিলেন, গফুর, তোকে যে আমি কি সাজা দেব ভেবে পাই নে। কোথায় বাস করে আছিস জানিস?
গফুর হাতজোড় করিয়া কহিল, জানি। আমরা খেতে পাই নে, নইলে আজ আপনি যা জরিমানা করতেন আমি না করতাম না।
সকলেই বিস্মিত হইল। এই লোকটা জেদী এবং বদমেজাজী বলিয়াই তাহারা জানিত। সে কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল, এমন কাজ আর কখনও করব না কর্তা। বলিয়া সে নিজের দুই হাত দিয়া নিজের দুই কান মলিল।
শিববাবু সদয়কণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা, যা যা হয়েছে। আর কখনও এ সব মতিবুদ্ধি করিস নে।
বিবরণ শুনিয়া সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন এবং এ মহাপাতক যে শুধু কর্তার পুণ্য প্রভাবে ও শাসন ভয়েই নিবারিত হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র রহিল না। তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন, তিনি গো শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিলেন এবং সে জন্য এই ধর্মজ্ঞানহীনকে গ্রামের ত্রিসীমানায় বসবাস করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।
গফুর একটা কথার জবাব দিল না, যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান ও সকল তিরস্কার সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্নচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে ফ্যান চাহিয়া আনিয়া মহেশকে খাওয়াইল এবং তাহার গায়ে মাথায় ও শিঙে বারংবার হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কত কথাই বলিতে লাগিল।
জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আসিল। এমনি দিনে দ্বিপ্রহর বেলায় গফুর ঘরে ফিরিয়া আসিল।
পরের দ্বারে জন মজুর খাটা তাহার অভ্যাস নয়, এবং মাত্র দিন চার পাঁচ তাহার জ্বর থামিয়াছে, কিন্তু দেহ যেমন দুর্বল তেমনি শ্রান্ত। তবুও আজ সে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রচণ্ড রৌদ্র কেবল তাহার মাথার ওপর দিয়া গিয়াছে, আর কোন ফল হই নাই। ক্ষুধায় পিপাসায় ও ক্লান্তিতে সে প্রায় অন্ধকার দেখিতেছিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, আমিনা ভাত হয়েছে রে?
মেয়ে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নিরুত্তরে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল। জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল, হয়েছে ভাত? কি বললি- হয় নি? কেন শুনি?
চাল নেই বাবা।
চাল নেই? সকালে আমাকে বলিস নি কেন?
তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম!
গফুর মুখ ভ্যাঙাইয়া কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কহিল, রাত্তিরে যে বলেছিলুম। রাত্তিরে বললে কারু মনে থাকে? নিজের কর্কশকণ্ঠে ক্রোধ তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। মুখ অধিকতর বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, চাল থাকবে কি করে? রোগা বাপ খাক আর নাই খাক, বুড়ো মেয়ে চার বার পাঁচ বার করে ভাত গিলবি! এ বার থেকে চাল আমি কুলুপ বন্ধ করে বাইরে যাব। দে, এক ঘটি জল দে, তেষ্টায় বুক ফেটে গেল। বল, তাও নেই।
আমিনা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া গফুর বুঝিল গৃহে তৃষ্ণায় জল পর্যন্ত নাই, তখন সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। দ্রুত পদে কাছে গিয়া ঠাস করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, মুখপোড়া মেয়ে, সারাদিন তুই করিস কি? এত লোক মরে তুই মরিস নে!
মেয়ে কথাটি কহিল না। মাটির শূন্য কলসটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা-মরা এই মেয়েটিকে সে যে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে, সে কেবল সেই জানে। তাহার মনে পড়িল, তাহার এই স্নেহশীলা কর্মপরায়ণা শান্ত মেয়েটির কোন দোষ নাই। ক্ষেতের সামান্য ধান কয়টি ফুরানো পর্যন্ত তাহাদের পেট ভরিয়া দু বেলা অন্ন জুটে না। কোন দিন এক বেলা, কোন দিন বা তাহাও নয়। দিনে পাঁচ ছয় বার ভাত খাওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি মিথ্যা এবং পিপাসার জল না থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণ বাবুর খিড়কীর পুকুরে যা একটু জল আছে তা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত খুঁড়িয়া যা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি,

তেমনি ভিড়। বিশেষত মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা তো কাছেই ঘেঁষিতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয় বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে একটু ঢালিয়া দেয় সেই টুকুই সে ঘরে আনে। এ সমস্তই সে জানে। হয়ত আজ জল ছিল না। কিংবা কাড়াকাড়ির মাঝখানে কেহ মেয়েকে তাহার কৃপা করিবার অবসর পায় নাই। এমনিই কিছু একটা হইয়া থাকিবে নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার নিজের চোখেও জল ভরিয়া আসিল। এমনি সময়ে জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া ডাকিল, গফরা ঘরে আছিস?

গফুর তিক্ত কণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, আছি, কেন? বাবু মশায় ডাকছেন, আয়।

গফুর কহিল, আমার খাওয়া দাওয়া হয় নি, পরে যাব।

এত বড় স্পর্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কুৎসিত একটা সম্বোধন করিয়া কহিল, বাবুর হুকুম মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।

গফুর দ্বিতীয় বার আত্মবিস্মৃত হইল। সেও একটা দুর্বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারও গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাব না।

কিন্তু সংসারে এত ক্ষুদ্রের অত বড় দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয়, বিপদেরও কারণ। রক্ষা এই যে, এত ক্ষীণকণ্ঠ এত বড় কানে গিয়া পৌঁছায় না। না হইলে তাঁহার মুখের অন্ন ও চোখের নিদ্রা দু-ই ঘুচিয়া যাইত। তাহার পর কি ঘটিল বিস্তারিত করিয়া বলার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঘণ্টাখানিক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার এত বড় শাস্তির হেতু প্রধানত মহেশ। গফুর বাটী হইতে বাহির হইবার পরে সেও দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে, পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুর ছোট মেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে। এরূপ ঘটনা এই প্রথম নয় ইতিপূর্বেও ঘটিয়াছে, শুধু গরিব বলিয়াই তাহাকে মাফ করা হইয়াছে। পূর্বের মত এবারও সে আসিয়া হাতে পায়ে পড়িলে হয়ত ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া কাহারও গোলাম নয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে-প্রজার মুখে এত বড় স্পর্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণবাবু কোন মতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ মাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুজিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়া সে তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা তাহার মনে ছিল না। কিন্তু বুকের ভিতরটা যেমন বাহিরের মধ্যাহ্ন আকাশের মতই জ্বলিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁশ ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্তকণ্ঠ কানে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং তাহার বিক্ষিপ্ত ভাঙা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মত যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙ্গলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল। তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া মহেশের অবনত মাথার ওপর সজোরে আঘাত করিল।

একটিবার মাত্র মহেশ মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরে তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণদেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বাহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বাহিয়া ফোঁটা কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তারপরে সম্মুখ ও পশ্চাতে পা দুটা তাহার যতদূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। আমিনা কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল।

গফুর নড়িল না, জবাব দিল না। শুধু নিমিষে চক্ষে আর এক জোড়া নিমেষহীন গভীর কাল চক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সংবাদ পাইয়া গ্রামান্তের মুচির দল আসিয়া জুটিল। তাহারা বাঁশে বাঁধিয়া মহেশকে ভাগাড়ে লইয়া চলিল। তাহাদের হাতে ধারালো চকচকে ছুরি দেখিয়া গফুর শিহরিয়া চক্ষু মুদিল, কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

পাড়ার লোক কহিল, তর্করত্নের কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিয়েছেন, প্রাচিত্তিরের খরচ যোগাতে এবার তোকে না ভিটে বেচতে হয়।

গফুর এ সকল কথারও উত্তর দিল না, কেবল হাঁটুর ওপর মুখ রাখিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, আমিনা চল আমরা যাই। সে দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কোথায় বাবা?

গফুর কহিল, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।

মেয়ে আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্বে অনেক দুঃখেও তাহার পিতা কলে কাজ করিতে রাজি হয় নাই। সেখানে ধর্ম থাকে না, এ কথা সে বহুবার শুনিয়াছে।

গফুর কহিল, দেরি করিস নে মা, চল, অনেক পথ হাঁটতে হবে।

আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল, গফুর নিষেধ করিল, ও সব থাক মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামের আত্মীয় তাহার ছিল না। কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্র খচিত কাল আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লাহ! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনও মাফ করো না।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

মহাপাপ – জঘন্য, **প্রাচিত্তির** – প্রায়শ্চিত্ত।

কাহিনী সংক্ষেপ

মহেশকে নিয়ে জ্বালাতনের শেষ নেই। দড়ি ছিঁড়ে সে মাঝে মাঝে পালিয়ে যায়। একজন প্রতিবেশি তাকে একদিন খোয়াড়ে দিল। জরিমানা দিয়ে গফুর তাকে ছাড়িয়ে আনল। গফুর মহেশকে বিক্রি করে দিতে চাইল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ক্রেতাদের তাড়িয়ে দিল।

গফুরের দুবেলা খাবার জোটেনা। তার উপর গায়ে জ্বর। সেদিন মজুর খাটতে যেয়ে কোন কাজ না পেয়ে শ্রান্ত-ক্লান্তভাবে দুপুরে ফিরে আসল। ভাত-জলের ব্যবস্থা না থাকায় গফুর রেগে উঠে আমিনাকে বকাবকি করল ও তার গালে চড় লাগিয়ে দিল। পরক্ষণেই গফুর কিন্তু তার ভুল বুঝতে পারল। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে জল আনতে গেল।

জমিদারের পেয়াদা গফুরকে ধরে নিয়ে গেল। প্রচণ্ড মারধর খেয়ে সেখান থেকে ফিরে গফুর বিছানায় শুয়ে রইল। এমন সময় একটি আর্ত চিৎকার তার কানে এল। বেরিয়ে এসে গফুর দেখল আমিনার পানিভরা কলস গুঁতো মেরে মহেশ ভেঙে দিয়েছে আর মাটি থেকে ষাঁড়টি পানি শুষে নিচ্ছে। এ দৃশ্য থেকে গফুর জ্ঞানশূন্য হল। লাঙলের মাথা দিয়ে মহেশের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল। সে আঘাতে মহেশ পড়ে গেল এবং তার মৃত্যু হল। আমেনা মহেশের মৃত্যুতে কেঁদে উঠল।

সেই রাতেই গফুর গৃহত্যাগ করল। সে ফুলবেড়ে তটকলে কাজ করতে যাবে। মেয়ে আমিনার হাত ধরে বেরিয়ে আসার আগে মহেশের শোকে সেও হু হু করে কেঁদে উঠল। গফুর প্রার্থনা জানাল - যারা মহেশের ক্ষুধার ঘাসটুকু দেয়নি - তেষ্টায় জল দেয়নি বিধাতা যেন তাদের কখনও ক্ষমা না করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. মহেশকে খোয়াড় থেকে ছাড়িয়ে আনার টাকা গফুর কোথায় পেল?
   ক. গফুরের নিজের টাকা থেকে — খ. থালা বন্ধক দিয়ে
   গ. আমিনার টাকা থেকে — ঘ. খড় বিক্রি করে

২. গফুর গো-ক্রেতাদের কাছে মহেশকে বিক্রি করল না কেন?
   ক. টাকার দরকার ছিল না বলে — খ. বেশি দাম দেয়নি বলে
   গ. মহেশের প্রতি প্রীতির কারণে — ঘ. মহেশ আমিনার প্রিয় বলে

৩. এই লোকটা জেদী এবং বদমেজাজী বলিয়াই তাহারা জানিত - কার কথা বলা হয়েছে?
   ক. জমিদার — খ. তর্করত্ন
   গ. মানিক ঘোষ — ঘ. গফুর

৪. আমিনা ভাত রান্না করেনি কেন?
   ক. চাল ছিল না বলে — খ. জল ছিল না বলে
   গ. আমিনা সময় পায়নি বলে — ঘ. ইচ্ছে করে

৫. গভীর রাত্রে কোথায় যাওয়ার জন্য গফুর গৃহত্যাগ করল?
   ক. পাশের গ্রামে — খ. অন্য জমিদারের গ্রামে
   গ. ফুলবেড়ের চটকলে — ঘ. জেলা শহরে

৬. 'তার কসুর তুমি যেন কখনও মাফ করো না' - কার উক্তি?
ক. জমিদারের খ. গফুরের
গ. পুলিশের ঘ. প্রতিবেশির

খ) সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. গফুর রাগী এবং বদমেজাজী।
২. তর্করত্ন গো শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিলেন।
৩. গাঁয়ের জমিদার ছিলেন উদার।
৪. কেউ দয়া করে জল দিলেই তবে আমিনা পায়।
৫. কৃষিজীবি গফুর শেষ পর্যন্ত শ্রমিকে পরিণত হল।
৬. আমিনা ফুলবেড়ে যেতে চায়নি।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক) ১। খ) থালা বন্ধক দিয়ে ২। গ) মহেশের প্রতি প্রীতির কারণে ৩। ঘ) গফুর
৪। ক) চাল ছিল না বলে ৫। গ) ফুলবেড়ের চটকলে ৬। গফুরের
খ) ১। স ২। স ৩। মি ৪। স ৫। স ৬। মি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মহেশ গল্প অবলম্বনে একটি সমাজচিত্র অঙ্কন করুন।
২. গফুরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপণ করুন।
৩. আমিনা চরিত্রটির পরিচয় দিন।
৪. মহেশ গল্পের কাহিনীটি নিজের ভাষায় লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মহেশ কে? তার পরিণতির কাহিনীটি লিখুন।
২. মহেশের প্রতি গফুরের প্রীতির কারণটি ব্যাখ্যা করুন।
৩. গফুর কসাই এর কাছে মহেশকে বিক্রি করেনি কেন?
৪. আমিনা কে? তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লিখুন।
৫. কৃষিজীবি গফুর শ্রমিকে পরিণত হল কেন?

গ. ব্যাখ্যা করুন

১. মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আটসন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস, তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারি নে, কিন্তু তুই ত জানিস তোকে আমি কত ভালবাসি।
২. পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধকরি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ করিলেন।
৩. ..... আল্লাহ আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ঃ 'মহেশ' গল্প অবলম্বনে একটি সমাজচিত্র অঙ্কন করুন।

উত্তর ঃ জনপ্রিয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাস ও গল্পে সমাজের বিশ্বস্ত ও সজীব চিত্র অঙ্কন করেছেন। 'মহেশ' গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। 'মহেশ' গল্পে আমরা পল্লী গ্রামের সমাজ জীবনের একটি চমৎকার ছবি দেখতে পাই। কাশীপুর গ্রামের এক দীনদরিদ্র চাষী গফুর। তার সংসারে আছে মাত্র দশ বছরের একটি মেয়ে- আমিনা তার নাম। আর আছে অস্থিচর্মসার একটি ষাঁড় - যার নাম মহেশ। সম্পদ বলতে গফুরের ছোট ভেঙে পড়া জীর্ণ একটি কুঁড়ে ঘর। গফুর আর

দশজন কৃষক থেকে আলাদা নয়। সারা বছরের খাবারের টানাটানি লেগে থাকে। নিজেদের যেমন খাবার জোটে না তেমনি জোটেনা মহেশের। খড়কুটো হীন অবস্থায় সে প্রায়ই বাধা থাকে একটি বাবলা গাছে।

কিন্তু কাহিনীর পিছনেও কাহিনী আছে। জমিদার, তর্করত্নরা ধনী সম্প্রদায়ের মানুষ। তারাই গ্রাম ও সমাজ শাসন করে। গফুরের মত দরিদ্র চাষীর মুখের অন্ন এরাই কেড়ে নেয়। একইভাবে মহেশের খড় এরা কেড়ে নেয়। গফুর জমিহীন কৃষক। পরের জমিতে তাকে চাষ করতে হয়। সকল জমির মালিক জমিদার ও তার দোসর সামন্তবাদের প্রতিনিধিরা। সুতরাং এসব জমিতে যারা ভাগচাষীর কাজ করে তাদের ছলে-বলে কৌশলে ফাঁকি দেওয়ার ত্রুটি এরা করে না।

হিন্দু সমাজের উচ্চবিত্তের মানুষের কাছে দরিদ্র গফুররা অস্পৃশ্য। তাই তর্করত্নকে চমকে উঠতে দেখি। সে বলে- 'আ মর ছুঁয়ে ফেলবি না কি'? তর্করত্ন এবং জমিদার গফুরের উপর মহাক্ষিপ্ত এজন্য যে গফুর ষাঁড়টিকে খেতে দেয় না। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে গরু দেবতা। সেটাই ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ। কিন্তু যেটি মজার ব্যাপার সেটি হচ্ছে এই এ গোদেবতাকে খাওয়ানোর জন্য কেউই কিছু খড় দিতে চায় না এবং কেড়ে নেয়- গ্রামের গোচর ভূমিটুকুও বাড়তি আয়ের লোভে বন্দোবস্ত দিয়ে দেয়। উচ্চবিত্ত সমাজের অমানবিকতা ও নীতিহীনতার কারণে গফুরদের কষ্ট অনেক বেড়ে যায়। গফুরদের উপর তারা শুধু মারধরই করে না - ভিটেমাটিও ছাড়া করে।

কৃষিজীবি মানুষের সঙ্গে তার গৃহপালিত ও চাষবাসের পশুটিও যে পরিবারে একটি অঙ্গ সেটি এ গল্পে বেশ ফুটে উঠেছে। তর্করত্নদের গো প্রীতি উদ্দেশ্যনির্ভর কিন্তু গফুরের মহেশ প্রীতি পেশা নির্ভর ও আন্তরিক।

মহেশ গল্পে সমাজচিত্রের একটি পরোক্ষ দিক আছে। কৃষিনির্ভর সমাজ যে ভেঙে ছোট হয়ে যাচ্ছে, তারা যে নিঃস্ব শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে এটির একটি চমৎকার চিত্র মহেশ গল্পে পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা সেকালের একটি চমৎকার সমাজচিত্র পাই। শোষণ ও নির্যাতনের কাহিনী যেমন আছে তেমনি আছে মানবতাবোধহীন মানুষের কথা, আর আছে নির্যাতিত গফুরদের কথা যারা সমাজের চাপে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ মহেশ গল্প অবলম্বনে গফুর চরিত্রটি অঙ্কন করুন।

উত্তর ঃ শরৎচন্দ্র অত্যন্ত জনপ্রিয় কথাশিল্পী। তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ যেসব মানুষের কথা তিনি বলেছেন তাঁর গল্প উপন্যাসে তাদের প্রতি ছিল অপরিমেয় ভালবাসা। সাধারণ মানুষের জীবন কাহিনীও তাঁর হাতে অনন্য হয়ে গেছে চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা ও সহানুভূতির কারণে।

মহেশ গল্পে আমরা শরৎচন্দ্রের সেই মানসিকতাকে লক্ষ করি। যার জন্য গফুরের মত সাধারণ চরিত্রেও আবেগে অনুভূতিতে ও আন্তরিকতায় নিতান্ত পরিচিত মানুষ হয়ে উঠেছে।

গফুর কাশীপুর গ্রামের হতদরিদ্র এক কৃষক। সংসারে আছে বলতে দশ বছরের মেয়ে আমিনা। আর আছে চাষী জীবনের সঙ্গী মহেশ- যে একটি ষাঁড়। চাল চুলো বলতেও তেমন কিছু নেই। ভাঙ্গা ঘরের ভাঙা চাল -চুলো জ্বলে না প্রতিদিন। অন্নকষ্টে দিন কাটে তাদের। এ হেন গফুরের চরিত্র লেখক এঁকেছেন অত্যন্ত দরদ দিয়ে।

মহেশ গল্পের একটি বড় উপাদান পশুপ্রীতি। মহেশের প্রতি গফুরের যে ভালবাসা ও প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে এরকম উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে আর নেই। গফুর মহেশকে ভালবাসে শুধু গৃহপালিত পশু বলে নয় - তার পেশার সঙ্গী বলেই। মহেশের প্রতি গফুরের ভালবাসা পুত্রের মত। সে তাই বলে- 'মহেশ তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস, তোকে আমি পেট পুরে খেতে দিতে পারি নে, কিন্তু তুই ত জানিস তোকে আমি কত ভালবাসি।' গফুরের এই প্রীতিবোধ তার চরিত্রকে অনন্যতা দিয়েছে।

গফুর একজন স্নেহশীল পিতা। রাগী ও বদমেজাজী হিসেবে যে লোকটি বাইরে পরিচিত সে যে কত দরদী হৃদয়বান পিতা তার পরিচয় পাই আমিনার সঙ্গে তার কথোপকথনে। দশ বছরের এ মেয়েটিকে বুকে পিঠে মানুষ করেছে। দুবেলা তাকে খাওয়াতে পারে না বলে তার কষ্টের শেষ নেই। কিন্তু হঠাৎ করেই যখন মেয়ের সঙ্গে গফুর দুর্ব্যবহার করে ফেলে পরক্ষণেই সে কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পারে। তার অন্তর তখন আগুনে পুড়তে থাকে। স্নেহ অচিরে জয়ী হয়ে উঠে।

গফুর সহজ সরল কৃষক। তার চাওয়া-পাওয়াও যে খুব বেশি তা নয়। তবু তার অভাব ঘোচে না সামন্তবাদী সমাজের শোষণের কারণে। যারা শোষণ করছে তাদেরকে সে শত্রু হিসেবে চেনেনা বটে- তবে বাধ্য হয়ে তাদেরই হাতে পায়ে ধরে মহেশের জন্য কৃপা প্রার্থনা করেছিল গফুর। শোষণে অত্যাচারে পীড়িত গফুর কখনও কখনও প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। আত্ম চেতনাকে সে যেন খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু সমাজের চক্র ও চক্রান্তের কাছে সে হেরে গেছে। তবুও সে যে বলেছে - 'মহারানীর রাজত্বে কেউ কারও গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি। আমি যাব না' - এ প্রতিবাদ অর্থহীন নয়।

কাহিনীর শেষে আমরা দেখি গভীর রাতে মেয়ের হাত ধরে গফুর চলেছে ফুলবেড়ে চটকলে কাজ করতে। সর্বস্বান্ত হয়ে এ দেশের চাষী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। গফুর নিজে শ্রমিক হতে চায়নি কোন দিন। কিন্তু সমাজের নির্যাতন ও অমানবিকতা তাকে উদ্বাস্ত করেছে।
গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে শরৎচন্দ্র চমৎকারভাবে গফুর চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শোষিত নির্যাতিত, গফুরের জন্য তাই পাঠক দু ফোঁটা চোখের জল না ফেলে পারে না।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ঃ মহেশ কে? তার পরিণতির কাহিনীটি লিখুন।

উত্তর ঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত মহেশ গল্পের 'মহেশ' কোন ব্যক্তির নাম নয় - একটি ষাঁড়ের নাম।
হতদরিদ্র গফুরের পালিত পশু ও কৃষিকর্মের সহযোগী মহেশ এখন বুড়ো হয়েছে। মহেশকে গফুর মনে করে তার ছেলে যে তাকে আট সন প্রতিপালিত করেছে। গফুরের ত্রিসংসারে মহেশ আর আমিনা ছাড়া কেউ ছিল না।
গফুরের এত আদরের মহেশের পরিণতি হয়েছিল খুব করুণ। তখন দেশে প্রচণ্ড খরা। মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির। গরুটির এক কণা খাদ্য নেই - এমন কি তৃষ্ণার জল নেই। ক্ষুধার্ত মহেশ দড়ি ছিঁড়ে প্রায়ই অন্যের ক্ষেত, বাগানের গাছ-গাছালি নষ্ট করে। সেদিন দশ বছরের আমিনাকে জলের জন্য মহেশ গুঁতো দিয়ে ফেলে দেয়- জলের ঘটটাও ভেঙে দেয়। একটু আগে নির্যাতিত গফুর মেয়ের আর্ত চিৎকারে উঠানে যায়। সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য মহেশের মাথায় সজোরে আঘাত করে। এ আঘাতেই মহেশ মারা যায়।

প্রশ্ন ঃ আমিনা কে? তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে লিখুন।
উত্তর ঃ আমিনা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি 'মহেশ' গল্পের একটি চরিত্র। ব্যক্তি পরিচয়ে সে গফুরের একমাত্র কন্যা। তার বয়স দশ বছর।
যে বয়সটি বালিকার এবং চপলতার সে বয়সে আমিনাকে আমরা দেখি নারী হিসাবে এবং ধীর স্থির। মা-হারা মেয়ে বাবার গোটা সংসারের দায় বহন করে। রান্না-বান্না থেকে আরম্ভ করে মহেশের দেখাশোনা পর্যন্ত অনেক কাজই তাকে করতে হয়। বাবা অসুস্থ হলে তার সেবা করতে হয়। বাবা যে মহেশকে কত ভালবাসে তা সে জানে। ঘরের চাল থেকে খড় পেড়ে দিলে বাবা সদুত্তর দিতে পারে না। মেয়ের সঙ্গে ছলনা করে বাবা যে নিজের ভাতটুকু মহেশের জন্য রেখে দেয় এর মর্মার্থ আমিনা বোঝে। বাবা রাগ করলে আমিনা কাঁদতে কাঁদতে পানি আনতে যায়। পানি আনা যে কত কষ্টকর তা আমিনা জানে। কিন্তু সে কোন কথা বলে না প্রতিবাদ করে না। বালিকা হলেও আমিনা এক চিরসহিষ্ণু নারী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেছে। সে বাবাকে কোন প্রশ্ন করেনি - এমনকি গভীর রাতে বাবার হাত ধরে অন্যত্র চলে গিয়েছে। অল্প পরিসরে আমিনার চরিত্র অঙ্কিত হলেও আমিনার হতদরিদ্র ও করুণ মুখ আমাদের হৃদয়ে চিরতরে মুদ্রিত হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ গফুর কসাই-এর কাছে মহেশকে বিক্রি করেনি কেন?
উত্তর ঃ মহেশ গফুরের প্রিয় গরুর নাম। নামকরণে বোঝা যায় গফুরের ভালবাসায় সিক্ত মনের পরিচয়। মহেশ গফুরকে আটসন প্রতিপালিত করেছে - যেমন বাবা-মাকে প্রতিপালন করে পুত্র। কৃষিজীবি গফুরকে কৃষিকর্মে সহায়তা করেছে মহেশ। অর্থাৎ মহেশ গফুরের পেশার অংশিদার। সাধারণ গৃহপালিত পশুপাখির প্রতি মানুষের এক ধরনের মায়া পড়ে যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গৃহপালিত ও পেশায় সাহায্যকারী হিসেবে মহেশের প্রতি আলাদা একটি মমত্ববোধ আছে গফুরের। সে এ কারণে জানতেই পারে না যে মহেশ এখন কাজ করতে পারে না বলে তাকে বিক্রি করবে অথবা পরমপ্রিয়পাত্রের গলায় কসাই ছুরি চালাবে। ক্ষণিকের বিভ্রান্তিতে কসাই এর হাতে মহেশকে তুলে দিতে চাইলেও পরেই মত বদলেছে গফুর। মহেশের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসার কারণেই গফুর তাকে কসাই-এর হাতে তুলে দেয়নি।

ব্যাখ্যা

মহেশ তুই আমার ছেলে তুই আমাদের ..... আমি কত ভালবাসি।

আলোচ্য অংশটি জনপ্রিয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' নামক গল্প থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে গফুরের উক্তিতে মহেশের প্রতি প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে।

মহেশ একটি ষাঁড়ের নাম। দরিদ্র কৃষক গফুরের গৃহপালিত পশু। এমনিতেই গৃহপালিত পশু-পাখির প্রতি মানুষের একটা টান গড়ে উঠে। কিন্তু গৃহপালিত পশু হিসেবেই শুধু নয় - পেশার সঙ্গে জড়িত বলে মহেশের প্রতি অন্যরকম একটি ভালবাসার সম্পর্ক ছিল গফুরের। সে তাই বলেছে - মহেশ তার ছেলে, সে তাকে আট সন প্রতিপালিত করেছে। মহেশ এখন বুড়ো হয়েছে। সে খাটতে পারে না। তবু তাকে বিক্রি করতে চায় না গফুর। বরঞ্চ তাকে যে বেচে দিতে পারে না - ঘরে খড় বিচালি নেই বলে সে জন্য গফুর অপরাধবোধ করে। মহেশের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে গফুর নানা কথা বলে। সে তার কাছে অনুতাপ প্রকাশ করে বলে যে সে খেতে না দিতে পারলেও তাকে ভালবাসে। এ কথা অন্য কেউ না জানলেও মহেশ নিশ্চয় জানে।

আল্লাহ আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো ..... কখনও মাফ করো না।

উদ্ধৃত অংশটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মহেশ' নামক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে গফুরের উক্তিতে মহেশের প্রতি অসাধারণ প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে।

গফুরের আঘাতেই মহেশের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু মহেশের প্রতি সত্যিকারের কোন বিরাগ ছিল না গফুরের। ক্ষণিকের উত্তেজনায় তাকে হত্যা করেছিল। কিন্তু সব কিছু শান্ত হলে গফুর বুঝতে পেরেছে সব কিছু। তাই গৃহত্যাগের সময় আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করেছে বিধাতার কাছে - অপরাধীরা যেন শাস্তি পায়। যে মহেশের খাবার খড় কেড়ে নিয়েছে জমির মালিক, তৃষ্ণায় এতটুকু জল দেয়নি, চরে খাবার ঘাসটুকু পর্যন্ত যারা রাখেনি বিধাতা যেন তাদের ক্ষমা না করেন। মহেশ মরেছে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিয়ে। যারা মহেশের ক্ষুধার খাদ্য, তৃষ্ণার জলকে কুক্ষিগত করেছে তারা চিরকাল বিধাতার অভিশাপ বহন করে- এটিই ছিল গফুরের কাম্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

জাগো গো ভগিনী

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

লেখক পরিচিতি

বেগম রোকেয়া ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জহির উদ্দিন মুহম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ও মাতার নাম রাহাতন্নেছা সাবেরা চৌধুরানী।

সেকালে নানা কুসংস্কারের কারণে বেগম রোকেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন সম্ভব হয় নি। তবে বাড়িতে বড় ভাই ও পরবর্তীকালে স্বামীর উৎসাহে লেখাপড়ার চর্চা করেন।

বেগম রোকেয়াকে মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ বলা যায়। লেখাপড়া ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে অচিরেই মুসলিম নারীর বেদনাময় জীবনের মর্মকথা অনুভব করতে পারেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্য চর্চাই নারী মুক্তির জন্য নিবেদিত। নারী মুক্তির পথ হিসাবে নারী শিক্ষা প্রসারে তিনি অগ্রণী জন। প্রথমে ভাগলপুরে ও পরে কলিকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ - পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী, মতিচুর ইত্যাদি।

১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর বেগম রোকেয়ার মৃত্যু হয়।

পাঠ পরিচিতি

'জাগো গো ভগিনী' প্রবন্ধটি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের 'মতিচুর' গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত। নারী শিক্ষার পক্ষে লেখিকা এখানে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- নারী শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণের ধারণার একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- প্রকৃত শিক্ষা বলতে লেখিকা কী বলেছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ এক প্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোন উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া এক জনের কাজ নহে। তাই একটু আশার আলোক দীপ্তি পাইতে না পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলান হয়। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা শব্দ শুনিলেই শিক্ষার কুফলের একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শতদোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে। কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ শিক্ষার ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার।

আজিকাল অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরি লাভের পথ মনে করে।

মহিলাগণের চাকুরি গ্রহণ অসম্ভব, সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

যাহা হউক, শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের অন্ধ অনুকরণ নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মন এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সচল করি, হস্ত দ্বারা

সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল পাস করা বিদ্যাকে প্রকৃত শিক্ষা বলি না। দর্শনশক্তি বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিতেছি :

যেখানে অশিক্ষিত-চক্ষু ধূলি কর্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে শিক্ষিত-চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত যে কাদাকে আমরা কেবল মাটি, বালি কয়লার কালি ও জলমিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করি, বিজ্ঞানবিদ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন, যথা- বালুকা বিশ্লেষণ করিলে সাদা পাথর বিশেষ, কর্দম পৃথক করিলে চিনে বাসন প্রস্তুতকরণোপযোগী মৃত্তিকা অথবা নীলকান্তমণি; পাথর-কয়লার কালি দ্বারা হীরক এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার! যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরামানিক দেখে! আমরা যে এহেন চক্ষু চির-অন্ধ করিয়া রাখি এজন্য খোদার নিকট কী উত্তর দিব?

মনে করুন, আপনার দাসীকে আপনি একটা সম্মার্জনী দিয়া বলিলেন, যা আমার অমুক বাড়ি পরিষ্কার রাখিস। দাসী সম্মার্জনীটা আপনার দান মনে করিয়া অতি যত্নে জরির ওয়াড়ে ঢাকিয়া উচ্চস্থানে তুলিয়া রাখিল- কোন কাজে ব্যবহার করিল না। এদিকে আপনার বাড়ি ক্রমে আবর্জনাপূর্ণ হইয়া বাসের অযোগ্য হইল। অতঃপর আপনি যখন দাসীর কার্যের হিসাব লইবেন, তখন বাড়ির দুরবস্থা দেখিয়া আপনার মনে কী হইবে? শতমুখী ব্যবহার করিয়া বাড়ি পরিষ্কার রাখিলে আপনি খুশি হইবেন, না তাহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে সন্তুষ্ট হইবেন?

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

তদ্রূপ – তেমন, **বিভীষিকা** –যা ভয় সৃষ্টি করে, **মৃত্তিকা** – মাটি, **নীলকান্তমনি** – নীল রঙের মহামূল্যবান পাথর, **নীহার** – বরফ, **সম্মার্জনী** – ঝাঁটা

কাহিনী সংক্ষেপ

আমাদের নারী সমাজ শিক্ষার অভাবে অন্ধকারে নিমজ্জিত। আমাদের সমাজও নারীশিক্ষার প্রতি প্রসন্ন নয়। শিক্ষাহীনতা থেকে বাঁচতে হলে নারীদের এগিয়ে আসতে হবে। এটি একক নয় একটি যৌথ কাজ। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তোলাই শিক্ষার কাজ। কেবল পাস করা বিদ্যা প্রকৃত বিদ্যা নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'জাগো গো ভগিনী' প্রবন্ধের লেখিকা কে?
   ক. সুফিয়া কামাল খ. বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ
   গ. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ঘ. রিজিয়া রহমান

২. ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাকে লেখিকা কী বলেছেন?
   ক. শিক্ষা খ. দীক্ষা
   গ. চর্চা ঘ. সংস্কৃতি

৩. লেখিকার মতে অধিকাংশ লোক শিক্ষাকে কী মনে করে?
   ক. অপ্রয়োজনীয় খ. বিলাসিতা
   গ. ব্যবসায়ের পথ ঘ. চাকুরি লাভের পথ

৪. অশিক্ষিত চক্ষু কী দেখে?
   ক. আলো খ. চমৎকার বস্তু
   গ. ধূলিকর্দম ঘ. অন্ধকার

৫. যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে সেখানে শিক্ষিত চক্ষু কী দেখে?
   ক. সোনাদানা খ. হীরামাণিক
   গ. রূপ-রং ঘ. বৈচিত্র্য

খ. এক কথায় লিখুন

১. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
২. জহীর মোহাম্মদ আবু আলী সাবের কে ছিলেন?
৩. পদ্মরাগ কার রচনা?
৪. ভগিনী শব্দের অর্থ কি?
৫. মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত কে?

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. গ. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ২. ক. শিক্ষা ৩. ঘ. চাকুরি লাভের পথ
৪. গ. ধুলিকর্দম ৫. খ. হীরামানিক
খ. ১. পায়রাবন্দ ২. বেগম রোকেয়ার পিতা ৩. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
৪. ভগ্নী ৫. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- নারী স্বাধীনতা কিভাবে অর্জিত হতে পারে তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- সমাজের মঙ্গলের জন্যই নারী স্বাধীনতা কেন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বিবেক আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখাইয়া দিতেছে-এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।
আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি, "ভরসা কেবল পতিত পাবন," কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে। তাই বলি আমাদের অবস্থা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না, ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাঁটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয়, স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয় এবং সেই জন্য তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা সূচিকর্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতিপুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই "স্বামী" থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন, তিনিও স্ত্রীর তো ওপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না। ইহার কারণ এই যে, বহুকাল হইতে নারী হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয়, সবই দাসী হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না! তাই বলিতে চাই :

প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি! সমাজ মহাগোলযোগ বাঁধাইবে জানি! কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি তো, কোন ভাল কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে। আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও, সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কী করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার ইহবে? কী করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমত সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাসাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই- এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডি-কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি-ব্যারিস্টার, লেডি-জজ সবই হইব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কী নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কী স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?

আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক। কার্যক্ষেত্রেও পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশি, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়। অবশ্য কখনও কখনও স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিক বেশি পাইতেও দেখা যায়।

যদি বল আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ হীনবুদ্ধি নারী সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে তাহাকে খাঁটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি তো এই অনুর্বর মস্তিষ্ক সুতীক্ষ্ণ হয় কিনা।

পরিষেশ বলি, আমরা সমাজেরই অর্ধ অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে, একই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে- সর্বত্র আমরা যাহাতে তাহাদের পাসাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমত উন্নতির পথে তাহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন- আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন। তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্টি হই নাই, একথা নিশ্চিত।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

লুপ্ত – যা হারিয়ে গেছে, **গোলাম** – দাস, **হীনতেজ** – যার তেজ কমে গেছে, বাহুলতা – হাত, **অনুর্বর** – যে মাটিতে কিছু জন্মে না।

কাহিনী সংক্ষেপ

নারীদের অবস্থার পরিবর্তন নারীদেরই করতে হবে। অনেকের ধারণা পুরুষের শ্রমে অর্জিত ধনে নারী প্রতিপালিত বলে নারী প্রভুত্ব স্বীকার করে। কিন্তু যেখানে নারীর সম্পদে সংসার প্রতিপালিত হয় সেখানেও পুরুষরাই প্রভুত্ব করে। আসলে নারীর দাসীবৃত্তি মজ্জায় প্রবেশ করেছে - সে কিছুতেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে না।

কিন্তু সমাজের কল্যাণেই নারীদের জাগতে হবে ও স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। স্বাধীনতা অর্থ পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা, এই উন্নত অবস্থা অর্জনের জন্য স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের প্রয়োজন হলে তাই করতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করতে হবে। যে সব সমাজে পুরুষের সঙ্গী নারী সে সব সমাজই প্রকৃত উন্নতি লাভ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই - কাদের?

ক. পুরুষদের　　খ. নারীদের

গ. বালকদের　　ঘ. সমাজের

২. লেখিকা ‘স্বাধীনতা’ বলতে কী বুঝিয়েছেন?

ক. পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা　　খ. কারো পরাধীনতা নয়

গ. চলাফেরার অবাধ ব্যবস্থা　　ঘ. চাকরি করা

৩. কার কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়?

ক. পুরুষের　　খ. শিশুর

গ. নারীর ঘ. প্রতিবন্ধীর

৪. লেখিকার মতে নারী কোন জীবন বহনের জন্য সৃষ্ট হয় নাই?
ক. বিলাসী-জীবন খ. পারিবারিক জীবন
গ. দাম্পত্য জীবন ঘ. পুতুল জীবন

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. খ. নারীদের ২. ক. পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা
৩. গ. নারীর ৪. ঘ. পুতুল-জীবন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূল প্রশ্ন

১. কাদের এবং কেন জেগে উঠার জন্য লেখিকা আহ্বান জানিয়েছেন?
২. নারী জাগরণ কিভাবে সম্ভব বলে লেখিকা মনে করেন?

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. "পাস করা বিদ্যাকে প্রকৃত শিক্ষা বলি না"- কথাটির তাৎপর্য কি?
২. লেখিকার মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য কী?
৩. নারী স্বাধীনতা বলতে লেখিকা কী বুঝিয়েছেন?
৪. 'দাসীবৃত্তি' কথাটি দিয়ে লেখিকা কী বলতে চেয়েছেন?

গ. প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. আমরা কেবল পাস করা বিদ্যাকে প্রকৃত শিক্ষা বলি না।
২. বহুকাল হইতে নারী হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই দাসী হইয়া পড়িয়াছে।
৩. আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্টি হই নাই, এ কথা নিশ্চিত।

প্রশ্ন : কাদের এবং কেন জেগে উঠার জন্য লেখিকা আহ্বান করেছেন?

উত্তর : 'জাগো গো ভগিনী' প্রবন্ধে লেখিকা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সমাজের নারীদের জেগে উঠার আহ্বান জানিয়েছেন।

নারী ও পুরুষ সম্মিলিতিভাবে সমাজ ও পরিবার রচনা করে। কিন্তু পুরুষদের আত্মোন্নতির জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু স্ত্রীদের আত্মোন্নতি ও জ্ঞানশিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। স্ত্রী ও পুরুষ যদি যৌথজীবনে সমান উন্নত না হয় তবে সে জীবন সুচারু ও সুন্দর হতে পারে না বলে লেখিকা বিশ্বাস করেন। এজন্যই নারী জাগরণ চেয়েছেন বেগম রোকেয়া।

স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আমাদের দেশে নানাবিধ কুসংস্কার আছে। অনেক পুরুষই স্ত্রীশিক্ষার কল্পিত আশঙ্কায় আতঙ্কিত হন। অনেকে মনে করেন যেহেতু নারী চাকরি করবেন না সেহেতু নারী শিক্ষা অপ্রয়োজনীয়। লেখিকা এ অভিযোগগুলো অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন- শিক্ষা হচ্ছে মানুষের জন্মগতভাবে লাভ করা গুণাবলির অনুশীলন করা। বিধাতা নারীদেরও পুরুষের মত হাত-পা ও চিন্তাশক্তি দিয়েছেন। এগুলোর সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। আর পাস করার জন্য বিদ্যা-অর্জন এটিও লেখিকা অস্বীকার করেছেন।

জ্ঞান ও শিক্ষালাভের জন্য নারীদের নিজেদেরই এগিয়ে আসতে হবে। নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না করার জন্য নারীরা নিজেদের দাসী ভাবতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এ অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এ পরিবর্তন সমাজের জন্য কল্যাণকর হবে। লেখিকা নারীদের স্বাধীনতা চেয়েছেন। স্বাধীনতা অর্থে তিনি বুঝেছেন পুরুষের মত সমান উন্নত অবস্থা। পুরুষদের সমঅবস্থা অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে মেয়েদেরও নিজেদের জীবিকা নিজে অর্জন করতে হবে। দরকার হলে, চাকরি, ব্যবসায় ও অন্য যে কোন কাজ করতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করলেই নারীর সামনের সমস্ত অবরুদ্ধ দুয়ার খুলে যাবে।

নারী সমাজের অর্ধেক অংশ। নারী ও পুরুষের স্বার্থ অভিন্ন। মানুষের দুটি পদের একটি অচল হলে যেমন মানুষ চলতে পারে না তেমনি সমাজের অর্ধেক অচল হলে সমাজ অসুস্থ ও সচল হয়ে পড়ে। নারীদের উচিত পুরুষের সহচরী, সহকর্মিণী ও সহধর্মিণী হয়ে উঠা। নারীরা কখনই পুতুল জীবন বহন করার জন্য সৃষ্ট হয়নি।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন : 'পাস করা বিদ্যাকে আমরা প্রকৃত শিক্ষা বলি না' - কথাটির তাৎপর্য কী?

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের "জাগো গো ভগিনী" নামক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে লেখিকার শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে।

শিক্ষার সঙ্গে পাস ফেলের একটি ব্যাপার আছে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা অর্জনের চাইতে পাসকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এটি ঠিক নয়। বিধাতা মানুষকে অনেক গুণ দিয়েছেন। সেগুলোর অনুশীলন ও চর্চার নামই শিক্ষা। অনুশীলন করলে গুণ আরও বাড়ে, জ্ঞানের শক্তি বাড়ে। যেমন বিধাতা আমাদের সবাইকে হাত-পা, চিন্তা শক্তি ইত্যাদি দিয়েছেন। শিক্ষার গুরুত্ব হল এগুলো অনুশীলন করে এগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করা। পাস করে আমরা সনদ পাই। এ সনদের কোন মূল্য নেই, যদি আমরা গুণের চর্চা না করে তাদের শক্তি বাড়াই। তাই লেখিকা বলেছেন পাস করা বিদ্যা আর শিক্ষা কখনই এক নয়।

প্রশ্ন : নারী স্বাধীনতা বলতে লেখিকা বুঝিয়েছেন?

উত্তর : 'জাগো গো ভগিনী' প্রবন্ধের লেখিকা বেগম রোকেয়া 'নারী স্বাধীনতা' শব্দটিকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি নারীদের স্বাধীনতা বলতে কি বুঝিয়েছেন তা আলোচনা করে দেখতে পারি।

নারীর স্বাধীনতা বলতে লেখিকা পুরুষের মত উন্নত অবস্থা বুঝিয়েছেন। এ প্রবন্ধে লেখিকা নারীদের জাগ্রত হতে বলেছেন। শিক্ষা অর্জন করতে বলেছেন- বিধাতা প্রদত্ত গুণাবলির অনুশীলন করতে বলেছেন। এগুলো না করার ফলে নারী আজ দাসীতে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থা থেকে মুক্ত হলে নারীদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সে শিক্ষা দিয়ে সকল কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। লেখিকা বলেছেন নারীদের এ সবেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন। সমকক্ষতা অর্জন করলেই সমাজে পুরষের মত নারীও অবদান রাখতে পারবে। সমাজ রচনা করে নারী ও পুরুষ। দুজনই সমকক্ষ হলে সমাজের মঙ্গল হবে। এই সমকক্ষতা অর্জনকেই লেখক নারীর স্বাধীনতা বলেছেন।

ব্যাখ্যা লিখুন উত্তর

২. বহুকাল হইতে নারী হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর-বাহির, মস্তিষ্ক হৃদয় সবই দাসী হইয়া পড়িয়াছে।

উত্তর: উদ্ধৃত অংশটি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত 'জাগো গো ভগিনী' নামক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে লেখিকা নারীদের অধঃপতনের কথা বলেছেন।

দাসী যেমন গৃহকর্ম সম্পাদন করে নারীও তেমনি সারাদিন স্বামী সেবা ও গৃহকার্যে নিরত থাকে। স্ত্রীর মহিমা নয় দাসীত্বের পরিচিতি নারীকে অবমাননা করেছে। অথচ বিধাতা নারী ও পুরুষকে একই যোগ্যতা দিয়ে তৈরি করেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নারীরা যে অনেক সময় পশ্চাদগামী তার কারণ লেখিকা বলেছেন- নারীদের উচ্চবৃত্তির অনুশীলন না করা। অনুশীলন করে শিক্ষাকে উন্নত ও জ্ঞানকে প্রখর করা যায়। কিন্তু বহুকাল নারীরা তা করেননি। উচ্চবৃত্তির যে অঙ্কুর নারীর মধ্যে তা শুকিয়ে যায় অনুশীলন না করার ফলে। বরং অন্তর বাহিরে মাথায় মনে নারী আজ শুধুই গৃহকর্মনিপুণা দাসীমাত্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পল্লীসাহিত্য

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

লেখক পরিচিতি

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাঁ মহকুমার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৪ সালে তিনি এন্ট্রান্স এবং ১৯০৬ সালে এফ.এ পাস করেন। ১৯১০ সালে তিনি কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. পাস করেন। ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ. পাস করেন। ১৯২৮ সালে প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচ ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবনে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কলকাতা, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভূত অবদান রেখেছেন। তিনি একাধিক ভাষায় দক্ষ ছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ - বাংলা সাহিত্যের কথা (২খণ্ড), বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, Budhist Mystic songs, পদ্মাবতী ইত্যাদি। 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সঙ্কলন তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই তিনি লোকান্তরিত হন।

পাঠ পরিচিতি

'পল্লীসাহিত্য' প্রবন্ধটি মুহম্মদ শহীদুল্লাহর একটি ভাষণ থেকে সঙ্কলিত। ১৯৩৮ সালে প্রদত্ত ভাষণে লোকসাহিত্যের গুরুত্ব ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন। লোকসাহিত্য জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এজন্য তিনি লোকসাহিত্য চর্চা ও সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের পল্লীসাহিত্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

পল্লীগ্রামে শহরের মতো গায়ক, বাদক, নর্তক না থাকলেও তার অভাব নেই। চারদিকে কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া প্রভৃতি পাখির কলগান, নদীর কুল কুল ধ্বনি, পাতার মর্মর শব্দ, শ্যামল শস্যের ভঙ্গিময় হেলাদুলা প্রচুর পরিমাণে শহরের অভাব এখানে পূর্ণ করে দিচ্ছে। পল্লীর ঘাটে মাঠে, পল্লীর আলোবাতাসে, পল্লীর প্রত্যেক পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে। কিন্তু বাতাসের মধ্যে বাস করে যেমন আমরা ভুলে যাই বায়ু- সাগরে আমরা ডুবে আছি, তেমনি পাড়াগাঁয়ে থেকে আমাদের মনেই হয় না যে কত বড় সাহিত্য ও সাহিত্যের উপকরণ ছড়িয়ে আছে।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন '*ময়মনসিংহ গীতিকা*' সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন, সাহিত্যের কি এক অমূল্য খনি পল্লীজননীর বুকের কোণে লুকিয়ে আছে। সুদূর পশ্চিমের সাহিত্যরসিক রোমারোঁলা পর্যন্ত ময়মনসিংহের মদিনা বিবির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। মনসুর বয়াতির মতো আরও কত পল্লীকবি শহুরে চক্ষুর অগোচরে পল্লীতে আত্মগোপন করে আছেন, কে তাঁদের সাহিত্যের মজলিসে এনে জগতের সঙ্গে চেনাশোনা করিয়ে দেবে? আজ যদি বাংলাদেশের প্রত্যেক পল্লী থেকে এইসব অজানা অচেনা কবিদের গাথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হত, তাহলে দেখা যেত বাংলার মুসলমানও সাহিত্য সম্পদে কত ধনী। কিন্তু হায়! এ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল কই?

আমরা পল্লীগ্রামে বুড়োবুড়ির মুখে কোনো ঝিল্লীমুখর সন্ধ্যাকালে যেসব কথা শুনতে শুনতে ছেলেবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছি, সেগুলি না কত মনোহর! কত চমকপ্রদ! আরব্য উপন্যাসের আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ, আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু প্রভৃতির চেয়ে পল্লীর উপকথাগুলোর মূল্য কম নয়। আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে সেগুলো বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। এখনকার শিক্ষিত জননী সন্তানকে আর রাখালের পিঠা গাছের কথা, রাক্ষসপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার কথা বা পঙ্খিরাজ ঘোড়ার

কথা শুনান না, তাদের কাছে বলেন আরব্য উপন্যাসের গল্প কিংবা *Lamb's Tales from Shakespeare*-এর গল্পের অনুবাদ। ফলে কোন সুদূর অতীতের সাক্ষীস্বরূপ এই রূপকথা নষ্ট হয়ে অতীতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ লোপ করে দিচ্ছে। যদি আজ বাংলার সমস্ত রূপকথা সংগৃহীত হত, তবে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করে দেখিয়ে দিতে পারতেন যে, বাংলার নিভৃত কোণের কোনো কোনো পিতামহী মাতামহীর গল্প ভারতীয় উপমহাদেশের অন্য প্রান্তে কিংবা ভারত উপমহাদেশের বাইরে সিংহল, সুমাত্রা, যাভা, কম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে এমনিভাবে প্রচলিত আছে। হয়তো এশিয়ার বাইরে ইউরোপখণ্ডে লিথোনিয়া কিংবা ওয়েলসের কোন পল্লীরমণী এখনও হুবহু বা কিছু রূপান্তরিতভাবে সেই উপকথাগুলো তার ছেলেপুলে বা নাতি-পোতাকে শোনাচ্ছে। কে আছে এই উপকথাগুলো সংগ্রহ করে তাদের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে? ইউরোপ, আমেরিকা দেশে বড় বড় বিদ্বানদের সভা আছে, যাকে বলা হয় Folklore Society। তাদের কাজ হচ্ছে এইসব সংগ্রহ করা এবং অন্য সভ্য দেশের উপকথার সঙ্গে সাদৃশ্য নিয়ে বিচার করা। এগুলি নৃতত্ত্বের মূল্যবান উপকরণ বলে পণ্ডিত সমাজে গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' বা 'ঠাকুরদার থলে' যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশের সমস্ত উপকথাগুলি এক জায়গায় জড় করলে বিশ্বকোষের মতো কয়েক বালামে তার সংকুলান হত না।

আমরা Shakespeare-এ পড়েছি রাক্ষসদের বাঁধা বুলি হচ্ছে Fi, fie, foh, fun! I smell the blood of a British man-এর সঙ্গে তুলনা কর পল্লীর 'হাউ, মাউ, খাঁউ, মানুষের গন্ধ 'পাঁউ'! এ সাদৃশ্য হল কোথা থেকে? তবে কি একদিন ঐ সাদা ইংরেজ ও এই কালো বাঙালির পূর্বপুরুষগণ ভাই ভাই রূপে একই তাঁবুর নিচে বাস করত? সে আজ কত দিনের কথা কে জানে?

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

দীনেশচন্দ্র সেন – গবেষক সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। জন্ম ১৮৬৬ ও মৃত্যু ১৯৩৯।

ময়মনসিংহ গীতিকা – ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত গীতিকা। চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত।

রোমা রোঁলা – বিখ্যাত ফরাসি লেখক ও অধ্যাপক (১৮৬৬-১৯৪৪)

মদিনা বিবি – 'দেওয়ানা-মদিনা' পালার নায়িকা।

মনসুর বয়াতি – একজন লোক কবি।

কাহিনী সংক্ষেপ

পল্লীর মাঠে-ঘাঠে, আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে আছে সাহিত্য। এ সাহিত্যের কিছু সংগৃহীত হয়েছে 'ময়মনসিংহ গীতিকায়'। পল্লীর এ অমর সাহিত্যের প্রশংসা করেছেন দেশি-বিদেশি অনেক জ্ঞানী-গুণী। শিক্ষিত জননী একালে তাঁর সন্তানদের বিদেশি গল্প শোনান। কিন্তু এক কালে মায়েরা এ দেশেরই নানান রূপকথা আর গল্প বলতেন সন্তানদের।

পল্লীসাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য বিদেশে আছে Folklore Society, আমাদের দেশের পল্লীসাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
   ক. ১৮৫৭ সালে খ. ১৮৮৫ সালে
   গ. ১৮৫১ সালে ঘ. ১৮৮২

২. কোথায় সাহিত্য ও সাহিত্যের উপকরণ ছড়িয়ে আছে?
   ক. লাইব্রেরিতে খ. বই-পুস্তকে
   গ. পাড়াগাঁয়ে ঘ. দেশে-দেশান্তরে

৩. 'আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ' কি?
   ক. একটি প্রদীপের নাম খ. যে প্রদীপ সন্ধ্যায় জ্বালান হয়
   গ. একটি গল্পের নাম ঘ. একটি নাঁকের নাম

৪. Folklore Society কি?
ক. লোকসাহিত্য সংগ্রহের সংস্থা খ. নারী-শিক্ষা সংস্থা
গ. বিদেশী সাহিত্যচর্চা সংস্থা ঘ. অনুবাদ সংস্থা

৫. শেক্সপীয়ার কে?
ক. কবি ও ন্যাঁকার খ. গীতিকার
গ. বেহালাবাদক ঘ. যাত্রা পরিচালক

খ. এক কথায় উত্তর দিন

১. "বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' কে সম্পাদনা করেন?
২. রোমাঁ রোলা কে?
৩. 'ঠাকুরমার ঝুলি' কিসের বই?
৪. রূপকথাগুলো কিসের সাক্ষী?
৫. হাঁউ মাউ খাউ- কাদের বুলি?

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. খ. ১৮৮৫ সালে ২. গ. পাড়াগাঁয়ে ৩. গ. একটি গল্পের নাম
৪. ক. লোক সাহিত্য সংগ্রহের সংস্থা ৫. ক. কবি ও ন্যাঁকার
খ. ১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ২. লেখক ৩. রূপকথার
৪. অতীতের ৫. রাক্ষসদের

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের পল্লীসাহিত্য সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

আমরা কথায় কথায় প্রবাদ বাক্য জুড়ে দেই- যেমন 'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা নেই' 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি', 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম, এই রকম আরও কত কী! তারপর ডাকের কথা আছে, খনার বচন আছে।

যেমন ধরুন-

কলা রুয়ে না কেটো পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

প্রবাদ বাক্যে এবং ডাক ও খনার বচনে কত যুগের ভূয়োদর্শনের পরিপক্ব ফল সঞ্চিত হয়ে আছে, কে তা অস্বীকার করতে পারে? শুধু তাই নয়, জাতির পুরনো ইতিহাসের অনেক গোপন কথাও এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা আজও বলি- 'পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর।' এই প্রবাদ বাক্যটি সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন পাণ্ডুয়া বঙ্গের রাজধানী ছিল। কে এই প্রবাদ বাক্য, ডাক, খনার বচনগুলো সংগ্রহ করে তাদের চিরকাল জীবন্ত করে রাখবে?

তারপর ধরুন, ছড়ার কথা। কথায় কথায় ছেলেমেয়েগুলো ছড়া কাঁতে থাকে। রোদের সময় বৃষ্টি হচেছ, অমনি তারা সমস্বরে ঝংকার দিয়ে ওঠে -

রোদ হচ্ছে, পানি হচ্ছে,
খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হচ্ছে।

এর সঙ্গে সঙ্গে মনে করুন মায়ের সেই ঘুমপাড়ানী গান, সেই খোকা-খুকির ছড়া। এগুলি সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস, কিন্তু আজ দুঃখে দৈন্যে প্রাণে সুখ নেই। ছড়াও ক্রমে ক্রমে লোকে ভুলে যাচ্ছে। কে এগুলোকে বইয়ের পাতায় অমর করে রাখবে?

শুধু ছড়া কেন? খেলাধুলার কত না বাঁধা গৎ আছে বা ছিল আমাদের এ দেশে। যখন ফুটবল, ব্যাঁবলের নাম কারও জানা ছিল না, তখন কপাটি খেলার খুব ধুম ছিল। সে খেলার সঙ্গে কত না বাঁধা বুলি ছেলেরা ব্যবহার করত:

এক হাত বোল্লা বার হাত শিৎ
উড়ে যায় বোল্লা ধা তিং তিং

বিদেশি খেলার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এসব লোপ পাবার উপক্রম হয়েছে। কে এদের বাঁচিয়ে রাখবে? তারপর ধরুন, পল্লীগানের কথা। পল্লীসাহিত্য সম্পদের মধ্যে এই গানগুলো অমূল্য রত্ন বিশেষ। সেই জারি গান, সেই ভাটিয়ালি গান, সেই রাখালি গান, মারফতি গান- গানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার পল্লীর ঘাটে, মাঠে ছড়ানো রয়েছে। তাতে কত প্রেম, কত আনন্দ, কত সৌন্দর্য, কত তত্ত্বজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। শহুরে গানের প্রভাবে সেগুলো এখন বর্বর চাষার গান বলে ভদ্রসমাজে আর বিকায় না। কিন্তু—

মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।

এই গানটির সঙ্গে আপনার শহুরে গানের কোনো তুলনা হতে পারে? কিন্তু ধারাবাহিকরূপে সেগুলো সংগ্রহের জন্য কোনো চেষ্টা হচ্ছে কি?

এ পর্যন্ত যা বললাম সেগুলো হচ্ছে পল্লীর প্রাচীন সম্পদ। সাহিত্যের ভাণ্ডারে দান করবার মত পল্লীর নতুন সম্পদেরও অভাব নেই। আজকাল বাংলাসাহিত্য বলে যে সাহিত্য চলছে, তার পানারা আনা হচ্ছে শহুরে সাহিত্য, সাধু ভাষায় বলতে গেলে নাগরিক সাহিত্য। সে সাহিত্যে আছে রাজ-রাজড়ার কথা, বাবু-বিবির কথা, মটরগাড়ির কথা, বিজলি বাতির কথা, সিনেমা-থিয়েটারের কথা, চায়ের বাটিতে ফুঁ দেবার কথা। এইসব কথা নিয়ে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাঁক রাশি রাশি লেখা হচ্ছে। পল্লীর গৃহস্থ কৃষকদের, জেলে-মাঝি, মুটে-মজুরের কোনো কথা তাতে ঠাঁই নাই। তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের পাপ পুণ্য, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথায় কজন মাথা ঘামাচ্ছে? আমাদের বিশ্ববরেণ্য কবিসম্রাঁও একবার 'এবার ফিরাও মোরে' বলে আবার পুরানো পথে নাগরিক সাহিত্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। ধানগাছে তক্তা হয় কিনা, এখন শহুরে লোকেরা এটা জানলেও পাড়াগাঁয়ের জীবন তাদের কাছে এক অজানা রাজ্য। সেটা কারও কাছে একেবারে পচা জঘন্য, আর কারও কাছে একেবারে চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়ে ঘেরা। তাঁরা পল্লীর মর্মকথা কি করে জানবেন? কী করেই বা তার মুখচ্ছবিখানি আঁকবেন? আমাদের আজ দরকার হয়েছে শহুরে সাহিত্যের বালাখানার পাশে গেঁয়ো সাহিত্যের জোড়বাংলা ঘর তুলতে। আজ অনেকের আত্মা ইট-পাথর ও লোহার কৃত্রিম বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে মাটির ঘরে মাটির মানুষ হয়ে তাকাতে চাচ্ছে। তাদের জন্য আমাদের কিছু গড়াগাঁথার দরকার আছে। ইউরোপ, আমেরিকায় আজ এই Proletarial সাহিত্য ক্রমে আদরের আসন পাচ্ছে, আমাদের দেশেও পাবে। কিন্তু কোথায় সে পল্লীর কবি, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক যাঁরা নিখুঁতভাবে এই পল্লীর ছবি শহরের চশমা-আঁটা চোখের সামনে ধরতে পারবেন?

এই সমস্ত রূপকথা, পল্লীগাথা, ছড়া প্রভৃতি দেশের আলোবাতাসের মতো সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। তাদের হিন্দু মুসলমান কোনো ভেদ নেই। যেরূপ মাতৃস্তন্যে সন্তান মাত্রেরই অধিকার, সেরূপ এই পল্লীসাহিত্যে পল্লীজননীর হিন্দু মুসলমান সকল সন্তানেরই সমান অধিকার।

এক বিরাঁ পল্লীসাহিত্য বাংলায় ছিল। তার কঙ্কাল-বিশেষ এখনও কিছু আছে, সময়ের ও রুচির পরিবর্তনে সে অনাদৃত হয়ে ধ্বংসের পথে দাঁড়িয়েছে। নেহাত সেকেলে পাড়াগাঁয়ের লোক ছাড়া সেগুলোর আর কেউ আদর করে না। কিন্তু এক দিন ছিল যখন নায়ের দাঁড়ি-মাঝি থেকে গৃহস্থের বউ-ঝি পর্যন্ত, বালক থেকে বুড়ো পর্যন্ত, আমির থেকে গরিব পর্যন্ত সকলকেই এগুলো আনন্দ উপদেশ বিলাতো। যদি পল্লীসাহিত্যের দিকে পল্লীজননীর সন্তানেরা মনোযোগ দেয়, তবেই আমার মনে হয় এইরূপ পল্লীসাহিত্য সভার আয়োজন সার্থক হবে, নচেৎ এ সকল কেবলি ভুয়া, কেবলি ফক্কিকার।

কাহিনী সংক্ষেপ

পল্লীসাহিত্যের ভাণ্ডার বিরাঁ। কথায় কথায় যে আমরা প্রবাদ উচ্চারণ করি, ডাক ও খনার বচন বলি, নানা রকম ছড়া বলি এসবই পল্লীসাহিত্যের নিদর্শন। কিন্তু এগুলো আর তেমন প্রচলিত নয়। এগুলো আমাদের সংরক্ষণ করা দরকার। শহুরে মানুষের পাসাপাশি গ্রামের মানুষের জীবন ও সুখ-দুঃখকে আধুনিক সাহিত্যে রূপ দেওয়া প্রয়োজন। পল্লীর জীবন ও পল্লীর সাহিত্যের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় এখন এসেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' - এটি কি?

ক. ছড়া খ. ধাঁধা
গ. প্রবাদ ঘ. পল্লীগীতি

২. 'কলা রুয়ে না কেটো পাত' - এর পরের লাইন কোনটি?
ক. তাতেই বসত তাতেই ভাত খ. তাতেই বস্ত্র তাতেই ভাত
গ. তাতেই কাপড় তাতেই ভাত ঘ. তাতেই গামছা তাতেই ভাত

৩. কপাটি কি?
ক. এক ধরনের খেলা খ. এক ধরনের দরজা
গ. এক ধরনের বাটি ঘ. চায়ের কাপ

৪. 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি কার রচনা?
ক. নজরুল ইসলাম ঘ. জসীম উদ্দীন
গ. মধুসূদন দত্ত ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫. 'ফক্কিকার' বলতে কী বোঝায়?
ক. ফিকিরবাজি খ. ফাঁকিবাজি
গ. ফন্দিবাজি ঘ. ফরিয়াদ

খ. এক কথায় উত্তর দিন

১. যে শাস্ত্র মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে তাকে কী বলে?
২. খনা কে?
৩. মনসুর বয়াতি কে?
৪. মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে/ আমি আর বাইতে পারলাম না' কোন ধরনের গান?
৫. কিসের কঙ্কাল এখনও আছে?

গ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. পিঁড়েয় বসে ..... খবর।
২. এগুলি সরস প্রাণের ..... উৎস
৩. শহুরে সাহিত্যের ..... পাশে গেঁয়ো সাহিত্যের ..... ঘর তুলতে।
৪. সাহিত্যের ভাণ্ডারে দান করবার মত পল্লীর নতুন ..... অভাব নেই।
৫. পল্লীর গৃহস্থ কৃষকদের, ... মুটে-মজুরের কোন কথা তাতে ঠাঁই নাই।

ঘ. সত্য হলে স মিথ্যা হলে মি লিখুন

১. Folklore society লোকসাহিত্য সংগ্রহ করে।
২. আমাদের পল্লীসাহিত্য অনেক সমৃদ্ধ
৩. আমরা কখনও প্রবাদ বলি না।
৪. প্রবাদবাক্যে পুরাতন দিকের ইতিহাস লুকিয়ে আছে।
৫. পল্লীগান আমাদের একটি সম্পদ।
৬. গেঁয়ো সাহিত্যের প্রয়োজন নেই।
৭. পল্লীসাহিত্য প্রবন্ধটি একটি অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল।
৮. ছড়া সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. গ. প্রবাদ ২. গ. ১-২তাতেই কাপড় তাতেই ভাত ৩. ক. এক ধরনের খেলা
৪. ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫. খ. ফাঁকিবাজি

খ. ১. নৃতত্ত্ব, ২. জ্যোতিষী, ৩. লোককবি, ৪. সারিগান, ৫. পল্লীসাহিত্যের

গ. ১. পেঁড়োর, ২. জীবন্ত, ৩. বালাখানার, ৪. সম্পদেরও ৫. জোড়বাংলা, জেলে-মাঝি

ঘ. ১. স ২. স ৩. মি ৪. স ৫. স ৬. মি ৭. স ৮. স

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক

১. পল্লীসাহিত্য বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন? বাংলাদেশের পল্লীসাহিত্যের পরিচয় দিন।
২. পল্লীসাহিত্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? কিভাবে সংরক্ষণ করা যায়?

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'এগুলো সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস' কী প্রসঙ্গে কেন বলা হয়েছে?
২. ফোকলোর সোসাইটি কী বুঝিয়ে লিখুন
৩. প্রবাদ কী? উদাহরণ দিন।

গ. ব্যাখ্যা

১. তবে কি একদিন ঐ সাদা ইংরেজ ও এই কালো বাঙালির পূর্বপুরুষগণ ভাই ভাই রূপে একই তাঁবুর নিচে বাস করত?
২. আমাদের আজ দরকার হয়েছে শহুরে সাহিত্যের বালাখানের পাশে গেঁয়ো সাহিত্যের জোড়বাংলা ঘর তুলতে।
৩. নচেৎ এ সকল কেবলি ভুয়া, কেবলি ফক্কিকার।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : পল্লীসাহিত্য বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন? বাংলাদেশের পল্লীসাহিত্যের পরিচয় দিন।

উত্তর : পল্লীসাহিত্য বলতে লেখক সে সাহিত্যকেই বুঝিয়েছেন যে সাহিত্য পল্লীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পল্লীসাহিত্য সৃষ্টি করেছে পল্লীর মানুষেরা। এ সাহিত্যের উপাদান ও উপকরণও পল্লী থেকেই সংগৃহীত। নিরক্ষর হয়েও মুখে মুখে যে সাহিত্য দীর্ঘদিনে গড়ে উঠেছে তা বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষেরই সম্পদ।

লেখক বাংলাদেশের পল্লীসাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে 'ময়নমসিংহ গীতিকার' কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের পল্লী গীতিকা চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। একদিন পল্লীগ্রামের বুড়ো-বুড়িরা রাক্ষস-খোক্কস, রাজপুত্র-রাজকন্যা, পঙ্খিরাজ ঘোড়ার গল্প বলতেন তা আর আজ তেমন করে শোনা যায় না। সে রূপকথাও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। এগুলো একেবারে হারিয়ে গেলে প্রত্নতত্ত্বের একটি বড় সম্পদ আমরা হারাবো।

জাতির অনেক পুরাতন ইতিহাস লুকিয়ে থাকে প্রবাদ প্রবচনে। যেমন 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম, পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর' ইত্যাদি। অথবা ডাক ও খনার বচন- কলা রুয়ে না কেটো পাত তাতেই কাপড় তাতেই ভাত' ইত্যাদি। এসব প্রবাদ-প্রবচনে, খনার বচনে লুকিয়ে আছে দেশ ও জাতির নানা ইতিহাসের কথা।

কথায় কথায় ছড়া কাঁটা গ্রামের ছেলেমেয়েদের অভ্যাস। এগুলো সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস। তাছাড়া খেলাধুলায় ভাটিয়ালি, রাখালি কতরকমের গান যে আছে তা বিস্তারিত বলা মুশকিল। শহরে চপল গানের তাড়ায় এগুলো ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

লেখক বাংলাদেশের বিচিত্র অমৃতময় এ পল্লীসাহিত্যকে সংরক্ষণের কথা বলেছেন। এ চিরায়ত সম্পদ একসময় হারিয়ে গেলে তা আর কোনদিনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেখানে আছে আমাদের জনজীবনের প্রকৃত পরিচয়, ইতিহাস ও ঐতিহ্য তা হারিয়ে যেতে দেওয়া যায় না।

প্রশ্ন : পল্লীসাহিত্য সংরক্ষণ করা কেন প্রয়োজন? কিভাবে পল্লীসাহিত্যকে সংরক্ষণ করা যায়?

উত্তর : পল্লীসাহিত্যেই আছে দেশের মানুষের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রকৃত চিত্র। জনজীবন প্রতিফলিত হয় পল্লীসাহিত্যে। পল্লী মানুষের জীবন, তাদের সুখ-দুঃখ, ভালবাসা-প্রেম-প্রীতি সবই রূপায়িত হয় এ সাহিত্যে। প্রত্নতত্ত্বের অনেক কাহিনী ইতিহাসের অনেক উপাখ্যান ঠাঁই নেয় পল্লীসাহিত্যে। তাই একটি জাতির পরিচয় ও সংস্কৃতি নির্মাণে পল্লীসাহিত্য সংরক্ষণ অতি জরুরি।

পল্লীসাহিত্য সংরক্ষণে যা অতি জরুরি তা হচ্ছে পল্লীসাহিত্য সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতনতা। শিক্ষিতজন যদি বিদেশী সাহিত্যের প্রতি প্রলুব্ধ না হয়ে এদেশের দিকে তাকায় তাহলে বিস্মৃতির হাত থেকে অনেক কিছু বেঁচে যায়। শিক্ষিত মায়েরা শিশুদের গল্প বলেন বিদেশের। কিন্তু স্বদেশের গল্পও কম মনোহর নয়।

সচেতনতার সঙ্গে আর যা দরকার তা হচ্ছে ব্যক্তিগত, যৌথ ও প্রতিষ্ঠানগতভাবে পল্লীসাহিত্য সংগ্রহ করা ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে তা সংরক্ষণ করা। যেমন 'ময়মনসিংহ গীতিকা' সংগৃহিত, সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়েছে। এভাবে বহু খণ্ড পল্লীসাহিত্য সংরক্ষিত হতে হবে। বিদেশে এই সংরক্ষণের কাজ করে প্রধানত ফোকলোর সোসাইটি। আমাদেরও অনুরূপ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে। যাতে করে পল্লীসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ রক্ষা করা যায়।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : 'এগুলো সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস' কী প্রসঙ্গে, কেন বলা হয়েছে?

উত্তর : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত 'পল্লীসাহিত্য' প্রবন্ধ থেকে উক্তিটি চয়ন করা হয়েছে। পল্লীর ছড়া সম্পর্কে উক্তিটি করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক বাংলাদেশের পল্লীসাহিত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পল্লীসাহিত্য যে একটি অমূল্য সম্পদ ও অমৃততুল্য তা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ছড়ার কথাও এসেছে। ছড়া গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। খেলাধুলার সময় ছেলেমেয়েরা ছড়া কাটে, বৃষ্টি হলে ছড়া কাটে, আবার মায়েরা ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়ানোর সময়ও ছড়া কাটে। এ ছড়াও পল্লীসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এগুলো জীবনের প্রাণবন্ত অংশ। এ জীবন্ত ছড়াগুলোর মধ্যেই পল্লীর জীবনকে অনেকখানি অনুভব করা যায়।

প্রশ্ন ২ : ফোকলোর সোসাইটি কী বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর: 'পল্লীসাহিত্য' প্রবন্ধে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ফোকলোর সোসাইটির কথা বলেছেন। ফোকলোরা সোসাইটি হচ্ছে বিদ্বানদের একটি সভা বা প্রতিষ্ঠানের নাম। এ সোসাইটির কাজ হচ্ছে পল্লীসাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনের উপাদানকে সংরক্ষণ করা। পল্লীসাহিত্য নিয়ে গবেষণা করা তাঁদের অন্যতম লক্ষ।

ব্যাখ্যা উত্তর

১. তবে কী একদিন ঐ সাদা ইংরেজ ও এই কালো বাঙালির পূর্বপুরুষগণ ভাই ভাই রূপে একই তাঁবুর নিচে বাস করত?

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত 'পল্লীসাহিত্য' প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে নৃতত্ত্বের একটি প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

রূপকথার গল্পে রাক্ষসদের বুলির সঙ্গে আমাদের দেশের প্রচলিত রূপকথার রাক্ষসদের বুলির আশ্চর্য মিল লক্ষ করা যায়। এ মিল থেকে লেখক একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে হয়ত এমন এক সময় ছিল যখন সাদা ইংরেজ আর কালো বাঙালিদের পূর্বপুরুষ একত্রে বসবাস করত তখনই গল্পগুলোর সৃষ্টি। জীবিকার প্রয়োজনে একই মানবগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলে গেছে। কিন্তু রূপকথার যোগসূত্রটি থেকেই গেছে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা এরকম ধারণাতে বিশ্বাস করেন।

২. আমাদের আজ দরকার হয়েছে ..... জোড় বাংলা ঘর তুলতে।

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত 'পল্লীসাহিত্য' প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে পল্লীসাহিত্যের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে।

শহুরে জীবন আর শহুরে সাহিত্যের চাপে পল্লীসাহিত্য অবহেলিত। পল্লীর দিকে ফিরে তাকানোর সময় আমাদের নেই। যদিও রবীন্দ্রনাথের মতো কবি বলেছিলেন- 'এবার ফিরাও মোরে' কিন্তু তিনিও ফিরে যেতে পারেন নি। শহুরে সভ্যতা আমাদের গ্রাস করেছে। লেখক শহরের সাহিত্যকে অস্বীকার করেননি। তবে তিনি বলেছেন শহুরে সাহিত্যের পাশে পল্লীর সাহিত্য ও জীবন নিয়েও চর্চা হওয়া প্রয়োজন। সেজন্যই তিনি বলেছেন শহুরে সাহিত্যের বালাখানার পাশে গ্রামীণ জোড়বাংলার ঘর তুলতে।

মানুষ মুহম্মদ (সা)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

লেখক পরিচিতি

১৮৯৬ সালে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী খুলনা জেলার বাঁশদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯১৮ সালে কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাশ করেন। বি.এ. পড়াকালীন তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ আর হয়নি।

কর্মজীবনে তিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন। মোহাম্মদী, নবযুগ প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বহু মননশীল প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ - জীবনী মরুভাস্কর (১৯৪১), মহামানুষ মুহসীন, সৈয়দ আহমদ, ছোঁদের হযরত মোহাম্মদ ইত্যাদি।

১৯৫৪ সালের ৮ই নভেম্বর স্বগ্রামে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ পরিচিতি

'মানুষ মুহম্মদ' প্রবন্ধটি লেখকের মরুভাস্কর নামক গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত। এ প্রবন্ধে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহম্মদের মানবীয় গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- হযরত মুহম্মদের (স) মৃত্যু-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- হযরত মুহম্মদ সকলের কাছে কেন প্রিয় ছিলেন সে সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- ক্ষমাশীল মুহম্মদের (স) পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

হযরতের মৃত্যুর কথা প্রচারিত হইলে মদিনায় যেন আঁধার ঘনাইয়া আসিল। কাহারও মুখে আর কথা সরে না; কেহবা পাগলের মত কাণ্ড শুরু করে। রাসুলুল্লাহর পীড়ার খবর শুনিবার জন্য বহুলোক জমায়েত হইয়াছে। কে একজন বলিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বীরবাহু ওমর উলঙ্গ তরবারি হাতে লইয়া লাফাইয়া উঠিলেন, যে বলিবে হযরত মরিয়াছেন, তাহার মাথা যাইবে।

মহামতি আবুবকর শেষ পর্যন্ত হযরতের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে ছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে জনতার মধ্যে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, যাহারা হযরতের পূজা করিত, তাহারা জানুক তিনি মারা গিয়াছেন; আর যাহারা আল্লাহর উপাসক, তাহাদের জানা উচিত আল্লাহ অমর, অবিনশ্বর। আল্লাহর সুস্পষ্ট বাণী: মুহম্মদ (স) একজন রাসুল বৈ আর কিছু নন। তাঁহার পূর্বে আরও অনেক রাসুল মারা গিয়াছেন। রাসুলুল্লাহ (স) মরিতে পারেন, নিহত হইতে পারেন; তাই বলিয়া তিনি যেই সত্য তোমাদের দিয়া গেলেন তাহাকে কি তোমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে না? এই বিশ্বভুবনে ঐ দূর অন্তরীক্ষে যাহা কিছু দেখিতে পাও সবই আল্লাহর (সৃষ্টি), তাঁহারই দিকে সকলের মহাযাত্রা।

হযরত আবুবকরের গম্ভীর উক্তিতে সকলেরই চৈতন্য হইল। হযরত ওমরের শিথিল অঙ্গ মাটিতে লুটাইল। তাঁহার স্মরণ হইল হযরতের বাণী: আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ মাত্র। তাঁহার মনে পড়িল কুরআনের আয়াত : মুহম্মদ, মৃত্যু তোমারও ভাগ্য, তাহাদেরও ভাগ্য। তাঁহার অন্তরে ধ্বনিয়া উঠিল মুসলিমের গভীর প্রত্যয়ের স্বীকারোক্তি-অমর সাক্ষ্য ; মুহম্মদ (স) আল্লাহর দাস (মানুষ) ও রাসুল।

শোকের প্রথম প্রচণ্ড আঘাতে আত্মবিস্মৃতির পূর্ণ সম্ভাবনার মধ্যে দাঁড়াইয়া স্থিতধী হযরত আবুবকর (রা) রাসুলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সীমারেখা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। তিনি রাসুল, কিন্তু তিনি মানুষ, আমাদেরই মতো দুঃখ-বেদনা, জীবন-মৃত্যুর অধীন রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষ-এই কথাই বৃদ্ধ হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা) মূর্ছিত মুসলিমকে বুঝাইয়া দিলেন।

তিনি মানুষের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন মুখ্যত তাঁহার মানবীয় গুণাবলি দ্বারা। মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশে তিনি জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু বংশগৌরব হযরতের সচেতন চিত্তে মুহূর্তের জন্যও স্থানলাভ করে নাই। জণ্মদুঃখী হইয়া তিনি সংসারে আসিয়াছিলেন। এই দুঃখের বেদনা তাঁহার দেহসৌন্দর্য ও চরিত্র-মাধুরীর সহিত মিলিয়া তাঁহাকে নরনারীর একান্ত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল? আবাল্য তিনি ছিলেন আল-আমিন। বিশ্বস্ত, প্রিয়ভাষী, সত্যবাদী। তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া মানুষ অবাক হইয়া যাইত। এই সকল গুণ বিবি খাদিজাকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

বস্তুত হযরতের রূপলাবণ্য ছিল অপূর্ব, অসাধারণ। মক্কা হইতে মদিনায় হিজরতের পথে এক পরহিতব্রতী দম্পতির কুটিরে তিনি আশ্রয় নেন। রাহী-পথিকদের সেবা করাই ছিল তাহাদের ব্রত। হযরত যখন আসিলেন, কুটিরস্বামী আবু মা'বদ মেষপাল চরাইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী উম্মে মা'বদ ছাগীদুগ্ধ দিয়া হযরতের তৃষ্ণা দূর করিলেন। গৃহপতি ফিরিলে এই নারী স্বামীর কাছে নবী-অতিথির রূপ বর্ণনা করেন, সুন্দর, সুদর্শন পুরুষ তিনি। তাঁহার শীর্ষে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশপাশ, বয়ানে অপূর্ব কান্তশ্রী। তাঁহার আয়তকৃষ্ণ দুটি নয়ন; কাজল রেখার মতো যুক্ত ভ্রূযুগল, তাঁহার সুউচ্চ গ্রীবা, কালো কালো দুটি চোখের ঢলঢল চাহনি মনপ্রাণ কাড়িয়া নেয়। গুরুগম্ভীর তাঁহার নীরবতা, মধুবর্ষী তাঁহার মুখের ভাষণ, বিনীত নম্র তাঁহার প্রকৃতি। তিনি দীর্ঘ নন; খর্ব নন, কৃশ নন। এক অপূর্ব পুলকদীপ্তি তাঁহার চোখেমুখে, বলিষ্ঠ পৌরুষের ব্যঞ্জনা তাঁহার অঙ্গে। বড় সুন্দর, বড় মনোহর সেই অপরূপ রূপের অধিকারী।

সত্যই হযরত বড় সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চেহারা মানুষের চিত্ত আকর্ষণে যতটুকু সহায়তা করে, তাহার সবটুকু তিনি পাইয়াছিলেন। সত্যের নিবিড় সাধনায় তাঁহার চরিত্র মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। কাছে আসিলেই মানুষ তাঁহার আপনজন হইয়া পড়িত। অকুতোভয় বিশ্বাসে তিনি অজেয় হইয়াছিলেন; শত্রুর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন তাঁহার অন্তরের লৌহকপাটে আহত হইয়া ফিরিয়া যাইত। কিন্তু সত্যে তিনি বজ্রের মতো কঠিন, পর্বতের মতো অটল হইলেও করুণায় তিনি ছিলেন কুসুমকোমল। বৈরীর অত্যাচারে বারবার তিনি জর্জরিত হইয়াছিলেন, শত্রুর লোষ্ট্রাঘাতে- অরাতির হিংস্র আক্রমণে বরাঙ্গের বসন, তাঁহার বহুবার রক্ত রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি পাপী মানুষকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, অভিশাপ দেওয়ার চিন্তাও তাঁহার অন্তরে উদিত হয় নাই। মক্কার পথে প্রান্তরে পৌত্তলিকের প্রস্তরঘায়ে তিনি আহত হইয়াছেন, ব্যঙ্গবিদ্রূপে বারবার তিনি উপহাসিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর ভেদিয়া একটি মাত্র প্রার্থনার বাণী জাগিয়াছেঃ এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর।

তায়েফে সত্যপ্রচার করিতে গিয়া তাঁহাকে কি ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, আমরা দেখিয়াছি। পথ চলিতে শত্রুর প্রস্তরঘায়ে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন; তখন তাহারাই আবার তাঁহাকে তুলিয়া দিতেছিল। তিনি পুনর্বার চলা শুরু করিলে দ্বিগুণ তেজে পাথরবৃষ্টি করিতেছিল। রক্তে রক্তে তাঁহার সমস্ত বসন ভিজিয়া গিয়াছে, দেহ নিঃসৃত রুধিরধারা পাদুকায় প্রবেশ করিয়া জমিয়া শক্ত হইয়াছে, মৃত্যুর আবছায়া তাঁহার চৈতন্যকে সমাচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, তথাপি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নাই। রমণীর রূপ, গৃহস্থের ধনসম্পদ, নেতৃত্বের মর্যাদা, রাজার সিংহাসন সব কিছুকে তুচ্ছ করিয়া সেই সত্যকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্বল জ্ঞানে আশ্রয় করিয়াছিলেন; তাঁহাকে উপহাসিত, অবহেলিত, অস্বীকৃত দেখিয়াও ক্রোধ, ঘৃণা বা বিরক্তির একটি শব্দও তাঁহার মুখে উচ্চারিত হয় নাই। অভিসম্পাত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি বলিলেন : না না, তাহা কখনই সম্ভব নয়। এই পৃথিবীতে আমি ইসলামের বাহক, সত্যের প্রচারক মানুষের দ্বারে দ্বারে সত্যের বাণী বহন করা আমার কাজ। আজ যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিতেছে, তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে, হয়ত কাল তাহারা - তাহাদের অনাগত বংশধরেরা ইসলাম কবুল করিবে। আপনার আঘাত জর্জরিত দেহের বেদনায় তিনি কাতর। সত্যকে ব্যাহত দেখিয়া মনের ব্যথা তাঁহার সেই কাতরতাকে ছাপাইয়া উঠিল। তিনি উর্ধ্বদিকে বাহু প্রসারণ করিয়া বলিলেন: তোমার পতাকা যদি দিয়াছ প্রভু, হীন আমি, তুচ্ছ আমি, নির্বল আমি, তাহা বহন করিবার শক্তি আমায় দাও বিপদাবরণ তুমি, অশরণের শরণ তুমি, তোমার সত্য মানুষের দ্বারে পৌঁছাইয়া তাহাকে উন্নীত করিলেন যাঁহারা- তাঁহাদের পংক্তিতে আমায় স্থান দাও।

কাহিনী সংক্ষেপ

হযরত মুহম্মদের (স) মৃত্যুতে সবার মনে নিরানন্দের অন্ধকার ঘনিয়ে এল। কেউ কেউ পাগলের মতো আচরণ করতে থাকল। হযরত আবুবকর তাদের সবাইকে শান্ত করলেন। তিনি বললেন মানুষ মরণশীল। রাসুলও মানুষ। তাই তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক।

হযরত মুহম্মদ (স) সকলের মন আকৃষ্ট করেছিলেন মানবীয় গুণ দ্বারা। যেমন তাঁর চরিত্রের মাধুর্য ছিল তেমনি ছিল দৈহিক সৌন্দর্য। তিনি ছিলেন 'আল আমীন'। তাঁর মন ছিল কুসুমের মতো কোমল। কিন্তু অন্যাধারে ছিলেন অকুতোভয়। শত্রুর নিষ্ঠুরতম আচরণেও কখনও তিনি বিচলিত হন নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'মানুষ মুহম্মদ' (স) প্রবন্ধটির লেখক কে?
   ক. সৈয়দ মুজতবা আলী খ. কাজী নজরুল ইসলাম
   গ. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ঘ. আবুল ফজল

২. হযরত মুহম্মদের (স) মৃত্যু সংবাদ হযরত ওমর কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন?
   ক. স্বাভাবিকভাবে খ. উত্তেজিতভাবে
   গ. কান্নায় ভেঙে পড়ে ঘ. নির্লিপ্তভাবে

৩. কার উক্তি? -যাহারা হযরতের পূজা করিত, তাহারা জানুক তিনি মারা গিয়াছেন'
   ক. জনৈক মদিনাবাসী খ. আবু মাবুদ
   গ. হযরত আবুবকর ঘ. হযরত ওমর

৪. হযরত মুহম্মদ (স) মানুষের মন আকৃষ্ট করেছিলেন কিসের দ্বারা?
   ক. দৈহিক সৌন্দর্যের দ্বারা খ. মানবীয় গুণাবলির দ্বারা
   গ. সহনশীলতার দ্বারা ঘ. মধুর ভাষণ দ্বারা

৫. 'আল আমীন' শব্দের অর্থ কি?
   ক. বিশ্বাসী খ. সত্যবাদী
   গ. বিচক্ষণ ঘ. বিনয়ী

খ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। হযরত মুহম্মদের মৃত্যু সংবাদে হযরত ওমর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন।
২. কুটীর স্বামী আবু মা'বদ ছাগীরদুগ্ধ দিয়ে হযরতের তৃষ্ণা নিবারণ করলেন।
৩. মুহম্মদ(স) মানুষের মন আকর্ষণ করেছিলেন মুখ্যত তাঁর মানবীয় গুণাবলী দ্বারা।
৪. হযরত মুহম্মদ তায়েফে ধর্ম প্রচার করেন নি।
৫. মুহম্মদ করুণায় ছিলেন কুসুমকোমল।

গ. এক কথায় উত্তর দিন

১. হযরত মুহম্মদের (স) মৃত্যুর পর উত্তেজিত জনতাকে কে সান্ত্বনা দিলেন?
২. 'তিনি রাসুল, কিন্তু তিনি মানুষ' - কার সম্পর্কে বলা হয়েছে।
৩. মুহম্মদ নর-নারীর কাছে কেমন ছিলেন?
৪. কোথায় মুহম্মদের উপর পাথরের আঘাতে রক্ত ঝরেছিল?
৫. মানুষের দ্বারে দ্বারে কি বহন করেছেন মহানবী-

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. গ. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ২. খ. উত্তেজিতভাবে
৩. গ. হযরত আবুবকর ৪. খ. মানবীয় গুণাবলির দ্বারা
৫. ক. বিশ্বাসী

খ. ১. স ২. মি ৩. স ৪. মি ৫. স

গ. ১. হযরত আবুবকর ২. হযরত মুহম্মদ ৩. প্রিয় ৪. তায়েফে ৫. সত্যের বাণী

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- ক্ষমাশীল চরিত্রের অধিকারী মুহম্মদের (স) একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মানুষ হিসাবে মুহম্মদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মক্কাবাসীরা হযরতের নবিত্ব-লাভের শুরু হইতেই তাঁহার প্রতি কি নির্মম অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছিল, আমরা দেখিয়াছি। যখন তাহাদের নির্যাতন সহনাতীত হইল, যখন দেখা গেল, কোরেশরা সত্যকে গ্রহণ করিবে না, হযরত মদীনায় চলিয়া গেলেন। পথে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য, তাঁহার ও হযরত আবুবকরের ছিন্ন মুণ্ড আনিবার জন্য বিপুল পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া, শত শত ঘাতক ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো হিংস্র ঘাতক পাঠনো হইল। বদর, ওহোদ ও আহযাব (বা খন্দক) যুদ্ধে মক্কার বাসিন্দা এবং তাহাদের মিত্রজাতিরা সম্মিলিত হইয়া ইসলামের ও মুসলিমের চিহ্নটুকু পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ করিল। খয়বরের যুদ্ধে হযরতের পরাজয়ের মিথ্যা সংবাদ শুনিয়া হযরতের মৃত্যু সম্ভাবনায় আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। হুদায়বিয়া সন্ধিতে হযরতের শান্তিপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া মুসলিমের স্কন্ধে ঘোর অপমানের শর্ত চাপাইয়া দেওয়ার পরও তাহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চাহিল এবং তারপর হযরত যেইদিন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করিলেন, সেই দিনও তাঁহার সহিত যুদ্ধকামনা করিয়া খালিদের সহিত হাঙ্গামা বাধাইয়া দিল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত যাহারা পদে পদে আনিয়া দিল লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচার, নির্যাতন, প্রত্যেক সুযোগে যাহারা হানিল বৈরিতার বিষাক্ত বাণ; হযরত তাঁহাদের সহিত কি ব্যবহার করিলেন? জয়ীর আসনে বসিয়া ন্যায়ের তুলাদণ্ড হাতে লইয়া বলিলেন : ভাইসব, তোমাদের সম্বন্ধে আমার আর কোনো অভিযোগ নাই, আজ তোমরা সবাই স্বাধীন, সবাই মুক্ত। মানুষের প্রতি প্রেমেপুণ্যে উদ্ভাসিত এই সুমহান প্রতিশোধ সম্ভব করিয়াছিল হযরতের বিরাঁ মনুষ্যত্ব।

শুধু প্রেম-করুণায় নয়, মানুষ হিসাবে আপনার তুচ্ছতাবোধ আপনার ক্ষুদ্রতার অনুভূতি তাঁহার মহিমা গৌরবকে মুহূর্তের জন্যও ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই। মক্কা-বিজয়ের পর হযরত সাফা পর্বতের পার্শ্বে বসিয়া সত্যান্বেষী মানুষকে দীক্ষা দান করিতেছেন, এমন সময় একটি লোক তাঁহার কাছে আসিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। হযরত স্মিতমুখে তাহাকে বলিলেন, কেন তুমি ভয় পাইতেছ? ভয়ের কিছুই এখানে নাই। আমি রাজা নই, সম্রাঁ নই, মানুষের প্রভু নই। আমি এমন এক নারীর সন্তান, সাধারণ শুষ্ক মাংসই ছিল যাঁহার নিত্যকার আহার্য।

মহামহিমার মাঝখানে আপনার সামান্যতম এই অনুভূতিই হযরতের চরিত্রকে শেষ পর্যন্ত সুন্দর ও স্বচ্ছ রাখিয়াছিল। মানুষ ত্রুটির অধীন, হযরতও মানুষ, সুতরাং তাঁহারও ত্রুটি হইতে পারে এই যুক্তির বলে নয়, বরং তাঁহার অনাবিল চরিত্রের স্বচ্ছ সহজ প্রকাশ মর্যাদাহানির আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া, লোকচক্ষে সম্ভাবিত হেয়তার ভয় অবহেলায় দূর করিয়া তিনি অকুতোভয়ে আত্মদোষ উদঘাঁন করিয়াছেন। এক দিন তিনি মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকদের কাছে সত্য প্রচারে ব্রতী। মজলিসের এক প্রান্তে বসিয়া একটি অন্ধ। সম্ভবত সে হযরতের দুই একটি কথা শুনিতে পায় নাই। বক্তৃতার মাঝখানে একটি প্রশ্ন করিয়া সে হযরতকে থামাইল। বাধা পাইয়া হযরতের মুখে ঈষৎ বিরক্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল, তাঁহার ললাঁ সামান্য কুঞ্চিত হইল।

ব্যাপারটি এমন কিছুই গুরুতর নয়। বক্তৃতায় বাধা হইলে বিরক্তি অতি স্বাভাবিক। আবার দুঃখী দুর্বল লোকদের হযরত বড় আদর করিতেন, কাহারও ইহা অজ্ঞাত নয়। সুতরাং তিনি অন্ধকে ঘৃণা করিয়াছেন, কাঙাল বলিয়া তাহাকে হেলা করিয়াছেন, এই কথা কাহারও মনে আসে নাই। কিন্তু তাঁহার এই তুচ্ছতম ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত আসিল কুরআনের একটি বাণীতে। তিনি বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে তাহা সকলের কাছে প্রচার করিলেন।

মানুষ হিসাবে যে ক্ষুদ্রতাবোধ, মানুষের সহজ দৈন্যের যে নির্মল অনুভূতি হযরতকে আপনার দোষত্রুটি সাধারণের চক্ষে এমন নির্বিকারভাবে ধরাইয়া দিতে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহাই আবার তাঁহার মহিমান্বিত জীবনে ইচ্ছা-স্বীকৃত দারিদ্র্যের মাঝখানে প্রদীপ হইয়া জ্বলিয়াছিল। অনাত্মীয় পরিপার্শ্বের মধ্যেও নিবিড় নির্বিচার ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি ও আনুগত্য তিনি বড় অল্প পান নাই। শত শত, বরং সহস্র সহস্র মুসলিম তাঁহার ব্যক্তিগত পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে সর্বদা শুধু ইচ্ছুক নয়, সমুৎসুক ছিল। কিন্তু হযরত আপনাকে দশজন মানুষের মধ্যে একজন গণনা করিলেন, সকলের সঙ্গী সহচররূপে সহোদর ভাইয়ের মতাদর্শ প্রয়াসী নেতার কর্তব্য পালন করিলেন। সত্যের জন্য অত্যাচার নির্যাতন সহিলেন, দুঃখে-শোকে অশ্রুনীরে তিতিয়া আল্লাহর নামে সান্ত্বনা মানিলেন, দেশের রাজা-মানুষের মনের রাজা হইয়া স্বেচ্ছায়

দারিদ্র্যের কণ্টক মুকুট মাথায় পরিলেন। তাই তাঁহার গৃহে সকল সময় অন্ন জুটিত না, নিশার অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিবার মতো তৈলটুকুও সময় সময় মিলিত না। এমনি নিঃস্ব কাঙালের বেশে মহানবী মৃত্যু রহস্যের দেশে চলিয়া গেলেন।
স্বামীর মহাপ্রয়াণে বিয়োগবিধুরা আয়েশার বক্ষ ভেদিয়া শোকের মাতম উঠিল, মানুষের মঙ্গল সাধনায় যিনি অতন্দ্র রজনী যাপন করিলেন, সেই সত্যাশ্রয়ী আজ চলিয়া গেলেন। নিঃস্বতাকে সম্বল করিয়া যিনি বিশ্বমানবের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিলেন, তিনি আজ চলিয়া গেলেন। সাধনার পথে শত্রুর আঘাতকে যিনি অম্লান বদনে সহিলেন, সেই ধার্মিক আজ চলিয়া গেলেন। পাপ-অন্যায় যাঁহাকে স্পর্শ করে নাই, সেই প্রিয়নবী আজ চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। হায়, সেই দয়ার নবী, মানুষের মঙ্গল বহিয়া আনিবার অপরাধে প্রস্তরঘায়ে যাঁহার দাঁত ভাঙিয়াছিল, প্রশস্ত ললাঁ রুধিরাক্ত হইয়াছিল, আর সেই আহত জর্জরিত মুমূর্ষু দশাতেও যিনি শত্রুকে প্রেমভরে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তিনি আজ জীবন-নদীর ওপারে চলিয়া গেলেন। দুই বেলা পূর্ণোদর আহারও যাঁহার ভাগ্যে হয় নাই, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মূর্ত প্রকাশ মহানবী আজ চলিয়া গেলেন।
বিবি আয়েশার মর্মছেঁড়া এই বিলাপ সমস্ত মানুষের সমগ্র বিশ্বের। শুধু সত্য সাধনায় নয়, শুধু ঊর্ধ্ব লোকচারী মহাব্রতীর তত্ত্বানুসন্ধানে নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে হযরত মোস্তফা ইতিহাসের একটি অত্যন্ত অসাধারণ চরিত্র। ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, সৌজন্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, সাহস, শৌর্য, অনুগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সমদর্শন-চরিত্র সৌন্দর্যের এতগুলি দিকের সমাহার ধুলোমাটির পৃথিবীতে বড় সুলভ নয়। তাই মানুষের একজন হইয়াও তিনি দুর্লভ, আমাদের অতি আপনজন হইয়াও তিনি অনুকরণীয়, বরণীয়।

কাহিনী সংক্ষেপ

মক্কাবাসীরা হযরত মুহম্মদের প্রতি নির্মম অমানুষিক অত্যাচার করেছিল। শেষ দিন পর্যন্ত তারা বিরুদ্ধতা করেছে, এমন কি তাঁকে হত্যা করার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু যেদিন মহানবী বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন সেদিন মহানবী কোন প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের ক্ষমা করলেন। মানবপ্রেমের চরম উৎকর্ষ সেদিন মহানবীর চরিত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল।
মানুষের প্রতি ভালবাসা ও প্রেম এত গভীর ছিল যে অন্য কোন মানুষকে তিনি ছোঁ করে দেখেননি, কারও প্রতি বিরক্তি প্রকাশ পর্যন্ত করেন নি- কাউকে অভিসম্পাত পর্যন্ত দেন নি। নিজের ক্ষুদ্রতাকে ও দৈন্যকে অন্যের সামনে তুলে ধরতে কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন নি। অবিসম্বাদিত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও দারিদ্র্যের কণ্টক মুকুটকে চিরকাল বহন করেছেন। সব মিলিয়ে হযরত মুহম্মদ ইতিহাসের এক অসাধারণ চরিত্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। 'আমি রাজা নই, সম্রাঁ নই, মানুষের প্রভু নই' - কার উক্তি?
ক. হযরত আবুবকরের খ. হযরত মুহম্মদের
গ. হযরত ওমরের ঘ. কোরায়েশ যুবকের

২. 'আজ তোমরা সবাই স্বাধীন, সবাই মুক্ত' - কাদের কথা বলা হয়েছে?
ক. মদিনাবাসীদের খ. মক্কাবাসীদের
গ. তায়েফবাসীদের ঘ. ইরাকবাসীদের

৩. 'যখন তাহাদের নির্যাতন সহনাতীত হইল' তখন হযরত মুহম্মদ কোথায় গেলেন?
ক. বসরায় খ. মক্কায়
গ. তায়েফে ঘ. মদীনায়

৪. বদর, ওহোদ কি?
ক. স্থানের নাম খ. যুদ্ধক্ষেত্রের নাম
গ. মানুষের নাম ঘ. মক্কার বিকল্প নাম

৫. 'মরুভাস্কর' কি?
ক. মরুভূমির সূর্য খ. মরুভূমির নাম
গ. প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম ঘ. কাব্যগ্রন্থের নাম

খ. সত্য হলে স মিথ্যা হলে মি লিখুন

১. হযরতের নবিত্ব লাভের পর থেকেই মক্কাবাসীরা তাঁর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।
২. কোরেশরা পথিমধ্যে নবীকে হত্যার জন্য ঘাতক প্রেরণ করেছিল।
৩. মানুষের প্রতি হযরত মুহম্মদের ছিল গভীর প্রেম ও ভালবাসা।
৪. মানুষ ত্রুটির অধীন, হযরতও মানুষ, সুতরাং তাহারও ত্রুটি হইতে পারে।
৫. মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে হযরত মোস্তফা ইতিহাসের একটি অত্যন্ত অসাধারণ চরিত্র।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. খ. হযরত মুহম্মদের ২. খ. মক্কাবাসীদের ৩. ঘ. মদীনায়
৪. খ. যুদ্ধক্ষেত্রের নাম ৫. গ. প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম

খ. ১. মি ২. স ৩. স ৪. স ৫. স

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'মানুষ মুহম্মদ (স)' প্রবন্ধ অবলম্বনে হযরত মুহম্মদের গুণাবলীর পরিচয় দিন।
২. মহানবীর অজস্র মানবীয় গুণের মধ্যে মানব প্রেমই মুখ্য' উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।
৩. মানুষ মুহম্মদ প্রবন্ধের মূলবক্তব্য নিজের ভাষায় লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর'। এ প্রার্থনা কার? কেন তিনি এ প্রার্থনা করেছেন।
২. 'বড় সুন্দর, বড় মনোহর সেই অপরূপ রূপের অধিকারী' উক্তিটি কার? কেন তিনি এ উক্তি করেছেন?
৩. মক্কাবাসী মহানবীর প্রতি যে আচরণ করেছিল তার পরিচয় দিন।
৪. তায়েফবাসী মহানবীর প্রতি যে আচরণ করেছিল তার পরিচয় দিন

গ. ব্যাখ্যা

১. আমি রাজা নই, সম্রাঁ নই, মানুষের প্রভু নই।
২. তিনি মানুষ, আমাদেরই মত দুঃখবেদনা, জীবন মৃত্যুর অধীন রক্তমাংসে গঠিত মানুষ।
৩. সত্যে তিনি বজ্রের মতো কঠিন, পর্বতের মতো অটল হইলেও করুণায় তিনি ছিলেন কুসুমকোমল।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : 'মানুষ মুহম্মদ (স)' প্রবন্ধ অবলম্বনে হযরত মুহম্মদের মানবীয় গুণাবলির পরিচয় দিন।

উত্তর : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী 'মানুষ মুহম্মদ (স)' প্রবন্ধে মহানবী হযরত মুহম্মদকে মানুষ হিসাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধকার লক্ষ করেছেন মুহম্মদের (স) অনুকরণযোগ্য অজস্র গুণাবলী - যা মানুষকে মহৎ করে।

হযরত মুহম্মদ নর-নারীদের মন আকৃষ্ট করেছিলেন তাঁর মানবীয় গুণাবলী দিয়ে। মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোনদিন বংশগৌরবকে মনে প্রাধান্য দেননি। সেই শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন 'আল আমিন' বা বিশ্বস্ত। তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও প্রিয়ভাষী। তাঁর ছিল অসাধারণ যোগ্যতা, বুদ্ধি, বিবেক ও বিচার শক্তি।

হযরত মুহম্মদ সুদর্শন ছিলেন। কিন্তু তাঁর চরিত্র ছিল আরও আকর্ষণকারী ও মধুময়। তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠিন, পর্বতের মতো অটল কিন্তু একই সঙ্গে ছিলেন কুসুমের মতো কোমল। বহুবার তিনি বিরোধীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন। বহুবার তাঁর দেহ থেকে রক্ত ঝরেছে। কিন্তু তারপরও পাপী মানুষকে তিনি ভালবেসেছেন কাউকে অভিশাপ পর্যন্ত দেননি। মানুষের দ্বারে দ্বারে সত্যের বাণী বহন করাই তাঁর কাজ। তিনি তাই তাঁর স্বভাব সৌন্দর্যে সকলকে ক্ষমা করেছেন।

যে মক্কাবাসীরা মুহম্মদের প্রতি প্রচণ্ড নির্যাতন করেছে - হত্যার চেষ্টা করেছে কিন্তু যেদিন মহানবী বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন সেদিন তিনি কোনো প্রতিশোধ নিলেন না। প্রেমের পুণ্যে, মনুষ্যত্বে উজ্জ্বল মুহম্মদ তাদের বললেন ..... তোমরা সবাই স্বাধীন, সবাই মুক্ত।

সকলের প্রতিই ছিল তাঁর অসীম করুণা। ভয়ে একটি লোককে কাঁপতে দেখে তিনি বলেছিলেন - 'আমি রাজা নই, সম্রাঁ নই, মানুষের প্রভু নই কারো প্রতি কঠোর ব্যবহারের প্রশ্নই আসে না। তবে তিনি ছিলেন মানুষ। মানুষের ভুলত্রুটি হতেই পারে। নিজের সামান্যতম ত্রুটিও তিনি জনসমক্ষে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।
নবীর জীবনের দারিদ্র্য মোচনের জন্য অনেক উৎসুক ছিলেন। কিন্তু মহানবী সেদিকে কোনো আগ্রহই দেখাননি। দেশের রাজা, মানুষের মনের রাজা চিরকাল দারিদ্র্যের মুকুট মাথায় ধারণ করে থাকলেন।
মহানবী ছিলেন আদর্শ মানুষ। তাঁর যেমন দেহকান্তি তেমনি চরিত্রের মাধুর্য চিরকাল মানুষের মনকে আকৃষ্ট করবে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু' এ প্রার্থনা কার? কেন তিনি এ প্রার্থনা করেছেন?

উত্তর : 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু। এদের ক্ষমা কর' - এ প্রার্থনাটি ইসলামের মহানবী হযরত মুহম্মদের।
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'মানুষ মুহম্মদ (স)' প্রবন্ধে এ উক্তিটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধকার এ প্রবন্ধে মহানবী মুহম্মদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, ক্ষমা ও মানবপ্রেমের কথা বলেছেন। মহানবী যখন ধর্মপ্রচার শুরু করেন তখন তাঁকে নানা নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। তাঁকে পাথরের আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করা হয়েছে- ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হয়েছে তাঁকে হত্যা করার জন্য ঘাতক পাঠান হয়েছে। মহানবী সব সময় এদের ক্ষমা করেছেন। কখনও প্রতিশোধ নেননি - অভিসম্পাত পর্যন্ত দেননি। উল্টো তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন যাতে তিনি এই পাপীদের ক্ষমা করে দেন, তাদের জ্ঞানের চোখ খুলে দেন।

ব্যাখ্যা উত্তর

১. আমি রাজা নই, সম্রাঁ নই, মানুষের প্রভু নই।

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'মানুষ মুহম্মদ (স)' নামক প্রবন্ধ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে মহানবীর উক্তিতে তাঁর চরিত্র মাধুর্য ফুটে উঠেছে।
মহানবী ছিলেন নিরহঙ্কারী মানুষ। তাঁর অন্তর ছিল প্রেমে ও করুণায় পূর্ণ। প্রতিটি মানুষের জন্য ছিল তাঁর ভালবাসা। মক্কা বিজয়ের পর একদিন সাফা পর্বতের পাশে মানুষকে দীক্ষাদান করছিলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে পৌঁছে কাঁপতে শুরু করে। তখন তিনি মৃদু হেসে বলেন ভয়ের কিছু নেই- আমি রাজা বাদশা নই - মানুষের প্রভুও নই। রাজ্য, ধন-সম্পদ যাঁর পায়ের কাছে গড়াগড়ি দিলেও তা কোনদিন ছুঁয়ে দেখেন নি। কোনো অহমিকাবোধ তাঁকে কোনদিন স্পর্শ করেনি। তাই সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজে মিলে যেতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। হযরত মুহম্মদের চরিত্রের এ এক মহান ঐশ্বর্য।

২. তিনি মানুষ, আমাদেরই মত দুঃখবেদনা, জীবন মৃত্যুর অধীন রক্ত মাংসে গঠিত মানুষ।

উত্তর : আলোচ্য অংশটি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'মানুষ মুহম্মদ (স)' নামক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এটি হযরত আবুবকরের উক্তি।
হযরত মুহম্মদের মৃত্যু সংবাদে মানুষ বেদনাহত ও বিমর্ষ। কেউ কেউ ভীষণ উত্তেজিত। আল্লাহর রাসুলের মৃত্যু হতে পারে এ যেন তাঁরা মেনে নিতে পারেন না। তখন হযরত আবুবকর উক্তিটি করেন। হযরত মুহম্মদ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। তবে তিনি মানুষ। সাধারণ মানুষের মতোই সুখ-দুঃখ যন্ত্রণা যেমন ছিল তেমনি তিনি জীবন ও মৃত্যুর অধীন। হযরত আবুবকর ছিলেন ধৈর্যশীল, স্থির ও বিচক্ষণ মানুষ। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যেমন পরিস্থিতি তিনি নিয়ন্ত্রণ করলেন তেমনি অবুঝ ও উত্তেজিত মানুষকে বাস্তবতার রূপ বুঝিয়ে দিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

cl¿ f¢bL

L¡S£ eSl¦m Cpm¡j

লেখক পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫শে মে বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহুকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোঁ বেলাতেই লেটোর দলে গান ও নাঁক রচনা শুরু করেন। লেখাপড়া বেশি দূর এগোয়নি প্রধানত দারিদ্র্যের কারণে। ১৯১৭ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এ সময় থেকেই কাজী নজরুল ইসলাম পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে নজরুল ইসলাম সাহিত্যচর্চায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী নামে পরিচিত। বিদেশি শাসক, অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতি বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তার কবিতায় - সেজন্য নজরুল বিদ্রোহী কবি। নজরুল সাহিত্য রচনা ছাড়াও কয়েক হাজার গানের রচয়িতা। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।

নজরুল ইসলামের বিশিষ্ট কয়েকটি রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : অগ্নিবীণা (১৯২২), ছায়ানট (১৯২৩), ভাঙার গান (১৯২৪), বিষের বাঁশি, প্রলয় শিখা, চক্রবাক ইত্যাদি।

গল্পগ্রন্থ : ব্যথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন (১৯২৫), শিউলিমালা (১৯৩১)।

প্রবন্ধ : যুগবাণী (১৯২২), রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩), দুর্দিনের যাত্রী।

১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট কবি ঢাকায় পি. জি. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পাঠ পরিচিতি

‘দুরন্ত পথিক’ রচনাটি কাজী নজরুল ইসলামের ‘রিক্তের বেদন’ গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। এটি একটি কথিকা বিশেষ। কাজী নজরুল ইসলাম চিরকাল তারুণ্য ও যৌবনকে আহ্বান করেছেন। দুরন্ত পথিক সেই তারণ্যের প্রতীক। তারুণ্য সব কিছুকে জয় করে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে, দুঃখকে শিরোপা করে নেয়। লেখকের দুরন্ত পথিক তেমনি পথিক, বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে সে উজ্জীবিত- পৌঁছাতে চায় জীবনের সিংহ-দুয়ারে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- দুরন্ত পথিকের একটি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

সে চলিতেছিল দুর্গম কাঁটাভরা পথ দিয়া। পথ চলিতে চলিতে সে একবার পিছনে ফিরিয়া দেখিল, লক্ষ আঁখির অনিমিখ দৃষ্টি তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে দৃষ্টিতে আশা-উন্মাদনার যে ভাস্বর জ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল, তাহাই ঐ দুরন্ত পথিকের বক্ষ এক মাদকতাভরা গৌরবে ভরপুর করিয়া দিল। সে প্রাণভরা তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিল- “হাঁ ভাই! তোমাদের এমন শক্তিভরা দৃষ্টি পেলে কোথায়?” অযুত আঁখির নিযুত দীপ্ত চাউনি বলিয়া উঠিল - ‘ওগো সাহসী পথিক, এ দৃষ্টি পেয়েছি তোমারই ওই চলার পথ চেয়ে। উহারই মধ্যে এক রেখা ম্লানিমার মতো সে কাহার স্নেহ-করুণ চাহনি বাণীতে ফুটিয়া উঠিল- “হায়, এ দুর্গম পথে তরুণ পথিকের মৃত্যু অনিবার্য!” অমনি লক্ষ কণ্ঠে লক্ষ হুংকার গর্জন করিয়া উঠিল-“চোপরাও ভীরু, এইতো মানবাত্মার সত্য শাশ্বত পথ’’ একলা পথিক দুচোখ পুরিয়া এই কল্যাণ-দৃষ্টির শক্তি-অমিয় পান করিয়া লইল। তাহার সুপ্ত যত-কিছু অন্তরের সত্য, এক অঙ্গুলি-পরশে সারা বীণায় ঝঞ্ঝার মতো সাগ্রহ সাড়া দিয়া উঠিল- “আগে চল!” বনের সবুজ কাহার অবুঝ তারুণ্য দিয়া পথিকের প্রাণ ভরিয়া দিয়া বলিল- “এই তোমার যৌবনের রাজটিকা পরিয়ে দিলাম; তুমি

চির-যৌবনময় চির-অমর হলে!" পথের আকাশ অবনত হইয়া তাহার শির চুম্বন করিয়া গেল। দূরের দিগ্বলয় তাহাকে মুক্তির সীমারেখার আবছায়া দেখাইতে লাগিল। স্বাধীন দেশের তোরণদ্বার পারাইয়া মুক্তি-বাঁশির অগ্নিসুর হরিণের মতো তাহাকে মুগ্ধ মাতাল করিয়া ডাক দিতেছিল। বাঁশির টানে মুক্তির দিগ্বলয় লক্ষ করিয়া সে ছুটিতে লাগিল। ওগো কোথায় তোমার সিংহদ্বার? দ্বার খোলো, দ্বার খোল- আলো দেখাও, পথ দেখাও!... মুক্ত বিশ্বের কল্যাণমন্ত্র তাহাকে ঘিরিয়া বলিল- 'এখন অনেক দেরি, পথ চল!" পথিক চমকিয়া উঠিয়া বলিল- "ওগো আমি যে তোমাকে চাই!" সে অচিন সাথী বলিয়া উঠিল- 'আমাকে পেতে হলে ঐ সামনের বুলন্দ দরওয়াজা পার হতে হয়!" দুরন্ত পথিক তাহার চলার দুর্বার বেগের গতি আনিয়া বলিল, "হাঁ ভাই, তাই আমার লক্ষ" অনেক দূরে বনের ফাঁকে মুক্ত গগন একবার চমকাইয়া গেল। পিছন হইতে নিযুত তরুণ কণ্ঠের বিপুল বাণী শোর করিয়া উঠিল- "আমাদেরও লক্ষ্য ঐ, চল ভাই, আগে চল। তোমারই পায়ে চলার পথ ধরে আমরা চলেছি।" পথিক বুকভরা গৌরবের তৃপ্তি তাহার কণ্ঠে ফুটাইয়া হাঁকিয়া উঠিল– 'এ পথে যে মরণের ভয় আছে।' বিক্ষুব্ধ তরুণ কণ্ঠে প্রদীপ্ত বাণী বাজিয়া উঠিল- কুছ পরওয়া নেই। ও তো মরণ নয়, জীবনের আরম্ভ।'

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন।

১. নজরুল ইসলাম কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
   ক. ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে — খ. ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে — ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে

২. 'দুরন্ত পথিক' রচনাটি কোন গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত?
   ক. রিক্তের বেদন — খ. ব্যথার দান
   গ. শিউলি মালা — ঘ. যুগবাণী

৩. 'দুরন্ত পথিক' কার রচনা?
   ক. মোতাহার হোসেন — খ. আবুল ফজল
   গ. কাজী আব্দুল ওদুদ — ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

৪. কোন পথে পথিক চলছিল?
   ক. দুর্গম পিচ্ছিল পথে — খ. দুর্গম পাহাড়ি পথে
   গ. দুর্গম কাঁটা ভরা পথে — ঘ. দুর্গম মরুপথে

৫. কে অবুঝ তারুণ্য দিয়ে প্রাণ ভরিয়ে দিল?
   ক. আকাশের নীলিমা — খ. বনের সবুজ
   গ. অগ্নির দীপ্ত — ঘ. কঠোর শপথ

৬. ও তো মরণ নয় - তবে কি?
   ক. জীবনের আরম্ভ — খ. জীবনের শেষ
   গ. জীবনের সূচনা — ঘ. যন্ত্রণার সূচনা

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. খ. ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২. ক. রিক্তের বেদন ৩. ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম
৪. গ. দুর্গম কাঁটা ভরা পথে ৫. খ. বনের সবুজ ৬. ক. জীবনের আরম্ভ।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- বৃদ্ধদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- মুক্তি পাগল পথিকের আত্মবিসর্জনের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অনেক পিছনে পাঁজরভাঙ্গা বৃদ্ধেরা ভয়ে কাঁপিয়া মরিতেছিল। তাহাদের স্কন্ধদেশে চড়িয়া একজন মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিতেছিল- 'এই দেখ মরণ।' একটু দূরে কয়লার ধুঁয়া ভরা আগুন জ্বালাইয়া বৃদ্ধদের দৃষ্টিহীন চক্ষুকে প্রতারিত করার চেষ্টা হইতেছিল। হাসি চাপিতে চাপিতে একজন ইহাদিগকে ঐ পুতি-ধুমময় আগুনের দিকে খেদাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল- 'ঐ তো সামনের তোমাদের নির্বাণকুণ্ড; এ বৃদ্ধ বয়সে কেন বন্ধুর পথে ছুটতে গিয়ে প্রাণ হারাবে? ওই দুরন্ত পথিকদল মরল বলে!" বৃদ্ধের দল দুই হাত উপরে উঠাইয়া বলিল- "হাঁ হুযুর, আলবত!" তাহাদের আশেপাশে কাহার দুষ্টকণ্ঠ বারেবারে সতর্ক করিতেছিল- 'ওরে ভিক্ষুকের দল, ভিক্ষায়ং নৈব চ নৈব চ! তোমাদের এরা ঐ নির্বাণকুণ্ডে পুড়িয়ে তিল তিল করে মারবে!" তাহাদের রাখাল হাসি চাপিয়া বলিয়া উঠিল- "না, ওদের কথা শুনো না। ওদের পথ ভীতিসংকুল আর অনেক দূরে, তাও আবার দুঃখকষ্ট- কাঁটাপাথরভরা। তোমাদের মুক্তি ঐ সামনে।"

দুরন্ত পথিক চলিয়াছিল, সেই মুক্ত দেশের উদ্বোধন বাঁশির সুর ধরিয়া। ... এইবার তাহার পথের বিভীষিকা যুলুম আরম্ভ করিল। পথিক দেখিল, ঐ পথ বাহিয়া যাওয়া এক-আধটি অস্ফুট পদচিহ্ন এখনও যেন জাগিয়া রহিয়াছে। পথের বিভীষিকা তাহাদেরই মাথার খুলি এই নূতন পথিকের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিল, এই দেখ এদের পরিণাম! সেই খুলি মাথায় করিয়া নূতন পথিক আর্তনাদ করিয়া উঠিল 'আহ, এরাইতো আমায় ডাক দিয়েছে। আমি এমনি পরিণাম চাই। আমার মৃত্যুতেই তো আমার শেষ নয়, আমার পশ্চাতে ঐ যে তরুণ যাত্রীর দল, ওদের মাঝেই আমি বেঁচে থাকব। বিভীষিকা বলিল 'তুমি কে? পথিক হাসিয়া বলিল- 'আমি চিরন্তন মুক্তিকামী। এই যাদের খুলি পড়ে রয়েছে, তারা কেউ মরে নি। আমার মাঝেই তারা নূতন শক্তির নূতন জীবন, নূতন আলোক নিয়ে এসেছে। এ মুক্তদল অমর!' বিভীষিকা কাঁপিয়া উঠিল, 'আমায় চেন না? আমি শৃঙ্খল। তুমি যাই বল, তোমাকে হত্যা করাই আমার ব্রত। মুক্তিকে বন্ধন দেওয়াই আমার লক্ষ্য। তোমাকে মরতে হবে।' দুরন্ত পথিক বুক বাড়াইয়া বলিল- মারো, বাঁধো, কিন্তু আমাকে তো বাঁধতে পারবে না; আমার তো মৃত্যু নেই। আমি যে আবার আসব।' বিভীষিকা পথ আগুলিয়া বলিল- "আমার যতক্ষণ শক্তি আছে, ততক্ষণ তুমি যতবারই আস তোমাকে বধ করব। শক্তি থাকে আমায় মারো, নতুবা আমার মার সহ্য করতে হবে।'

অনেক দূরে মুক্ত দেশের অলিন্দে এই পথের বিগত পথিক-সব জ্যোতির্ময় দেহ লইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। পথিক বলিল- 'কিন্তু এই জীবন দেওয়াঁটাই কি জীবনের সার্থকতা?' মুক্তি-বাতায়ন হইতে মুক্ত আত্মাদের স্নিগ্ধ আর্দ্র কণ্ঠ কহিয়া উঠিল- 'হাঁ ভাই! তোমাদের মৃত্যুতে আর অমনি সহস্র প্রাণের উদ্বোধনই তোমার মরণের সার্থকতা। নিজে মরিয়া অন্যকে জাগানোতেই তোমার মৃত্যু চির জাগ্রত অমর।' নবীন পথিক তাহার তরুণ বিশাল বক্ষ উন্মোচন করিয়া অগ্রে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'তবে চালাও খঞ্জর!'

পিছন হইতে তরুণ যাত্রীদল দুরন্ত পথিকের প্রাণ-শূন্য দেহ মাথায় তুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল- 'তুমি আবার এসো!' অনেক দূরে দিগ্বলয়ের কোলে কাহাদের ঐকতান- সংগীত ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল-

'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি!'

কাহিনী সংক্ষেপ

দুরন্ত পথিকের পথ বৃদ্ধদের পথ নয়। তারা চলে ভিন্নপথে। তবে দুরন্ত পথিকের এতে ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। সে চলে মুক্ত দেশের উদ্বোধনী বাঁশির সুরে। পথ আগলায় বিভীষিকা আসে শৃঙ্খল। কিন্তু এদের কারো কাছেই পথিকের মাথা নত হবার নয়। মৃত্যুই নতুন জীবনের উদ্বোধন করে। বরং নবীন পথিক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য বুক পেতে দেয়।

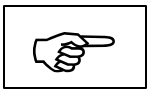

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. অনেক পিছনে বৃদ্ধরা কি করছিল?
   ক. গান গাইছিল — খ. পথিকের সঙ্গী হতে চাচ্ছিল
   গ. ভয়ে কাঁপছিল — ঘ. ঘুমাচ্ছিল

২. দুরন্ত পথিককে পথে কে জুলুম করেছিল?
   ক. হিংস্রতা — খ. ঈর্ষা
   গ. বিদ্বেষ — ঘ. বিভীষিকা

৩. "কিন্তু এই জীবন দেওয়াঁটাই কি জীবনের সার্থকতা? কে জিজ্ঞেস করেছিল?
   ক. বালক — খ. পথিক
   গ. বণিক — ঘ. তরুণ দল

৪. তুমি কে? এর উত্তরে পথিক কি বলেছিল?
   ক. আমি দুরন্ত পথিক — খ. আমি অভ্রান্ত পথচারী
   গ. আমি চিরন্তন মুক্তিকামী — ঘ. আমি চির স্বাধীনতাকামী

৫. পিছনের তরুণের দল পথিকের প্রাণশূন্য দেহ মাথায় তুলে নিয়ে কি বলল?
   ক. তুমি আর এসো না — খ. তুমি আবার এসো
   গ. তুমি আর ফিরে যেয়ো না — ঘ. তুমি আর চেয়ে থেকো না

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. গ. ভয়ে কাঁপছিল ২. ঘ. বিভীষিকা ৩. খ. পথিক
৪. গ. আমি চিরন্তন মুক্তিকামী ৫. খ. তুমি আবার এসো

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. দুরন্ত পথিক কে? তার পথ চলার লক্ষ্য কী?
২. 'দুরন্ত পথিক' রচনাটির মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'আমার তো মৃত্যু নাই', কে, কোন প্রসঙ্গে কেন বলেছে?
২. 'তবে চালাও খঞ্জর' কে, কাকে কেন বলেছে?
৩. আগামী দিনের নতুন যাত্রীদের মধ্যে তারা বেঁচে থাকবে।

গ. ব্যাখ্যা

১. ওগো কোথায় তোমার সিংহদ্বার? দ্বার খোলো, আলো দাও, পথ দেখাও।
২. ও তো মরণ নয়, ও যে জীবনের আরম্ভ।
৩. মৃত্যু মাঝেই নব জীবনের সূচনা ঘটে।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : দুরন্ত পথিক কে? তার পথ চলার লক্ষ্য কী?

উত্তর : দুরন্ত পথিক সেই পথিক যে চলেছে দুর্গম কাঁটাভরা পথে। তার মনে কোন ভয় নেই- শঙ্কা নেই। তার সাহসী চলাকে তরুণের লক্ষ লক্ষ চোখ অভিনন্দিত করে। পথিক চলেছে মানবাত্মার শাশ্বত পথ ধরে। বনের সবুজ এই অবুঝ তারুণ্যকে অভিনন্দিত করে তরুণকে পরিয়ে দেয় যৌবনের রাজটীকা। পথের আকাশ তার শিরচুম্বন করে। দূরের দিগ্বলয়

মুক্তির পথ দেখায়। পথিক মুক্তিপাগল। সে ছুটেছে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে। কিন্তু মুক্তবিশ্বের সিংহদ্বার এখনও অনেক দূরে। এ পথে আছে মরণের ভয়। কিন্তু পথিক নির্ভিক - তাকে অনুসরণকারী তরুণের দলও নির্ভিক।
পথের বিভীষিকা মুক্তিকামী পথিকের পথ রোধ করে। কিন্তু তাতে পথিক ভীত নয়। অতীতে যারা এ পথে এসেছে তাদের মাথার খুলি দেখিয়ে বিভীষিকা ভয় দেখাতে চেয়েছে। কিন্তু পথিক বলেছে- তারা কেউ মরেনি - তাদের প্রেরণাতেই পথিক এ পথে এসেছে। অগ্রণীদের কাছে পথিক জেনেছে- জীবন দেওয়াঁটাই জীবনের সার্থকতা। পথিকের মৃত্যুতে আরও সহস্রজনের প্রাণের উদ্বোধন হবে। নিজে মরে অন্যকে জাগানোই তো জীবনের ব্রত। নবীন পথিক অকুতোভয়ে খঞ্জরের নিচে জীবন উৎসর্গ করল। পিছনের তরুণদল কোলাহল করে উঠল। বলল এসো।
এই দুরন্ত, দুর্বার পথিক স্বাধীনতার প্রতীক মানবাত্মার প্রতীক, নির্ভয়তার প্রতীক - সব কিছুকে জয়ের পথিক। কাজী নজরুল ইসলাম দুরন্ত পথিক নিবন্ধে এমনই একজন পথিকের চিত্র এঁকেছেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : 'আমার তো মৃত্যু নাই।' কে, কোন প্রসঙ্গে কেন বলেছে?

উত্তর : উদ্ধৃত বাক্যটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'দুরন্ত পথিক' নামক নিবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। উক্তিটি দুরন্ত পথিকের।
পথিক ছুটে চলেছে স্বাধীনতা ও মানবতার সিংহদ্বারে পথরোধ করেছে বিভীষিকা। সে তাকে মৃত্যুভয় দেখিয়েছে। বলেছে যারা একবার এ পথে যায় তারা আর ফেরে না। বিভীষিকার কথায় পথিক ভয় পায়নি। বলেছে তার মৃত্যু নেই। সে বিভীষিকাকে জয় করার জন্য বারবার আসবে এবং একদিন জয় করবে।

প্রশ্ন ২ : 'তবে চালাও খঞ্জর' কে কাকে কেন বলেছে?

উত্তর : 'তবে চালাও খঞ্জর' উক্তিটি দুরন্ত পথিকের। স্বাধীনতার ও মানবতার পথের পথিক এই দুরন্ত পথিক। বিভীষিকা তার পথ রোধ করেছে। বলেছে মৃত্যুই এ পথের শেষ। পথিক জেনেছে জীবনকে উৎসর্গ করতে পারলেই জীবনের সূচনা হয়। অগ্রবর্তী দল যারা মানুষের কল্যাণের জন্য স্বাধীনতার জন্য এ পথে একদিন প্রাণ দিয়েছে তাদের কণ্ঠস্বর যেন দুরন্ত পথিক শুনতে পেল। তারা বলছে জীবন দেওয়াঁটাই জীবনের সার্থকতা। তাই দুরন্ত পথিক তার বিশাল বক্ষ খঞ্জরের নিচে সমর্পণ করেছে। স্বাধীনতা ও কল্যাণের জন্যই পথিক বলেছে - 'তবে চালাও খঞ্জর।'

ব্যাখ্যা উত্তর

১. ওগো কোথায় তোমার সিংহদ্বার? দ্বার খোলো, আলো দেখাও, পথ দেখাও।

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'দুরন্ত পথিক' নামক নিবন্ধ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে স্বাধীনতাকামী তরুণের অফুরন্ত পথ চলার কথা বলা হয়েছে।
তরুণ পথিক দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে স্বাধীনতা, মানবতা ও কল্যাণের সিংহ দরজায় পৌঁছাতে। পথে চির তরুণেরা তাকে উৎসাহিত করেছে- বনের সবুজ পরিয়েছে যৌবনের রাজটীকা। স্বাধীনতার রক্ত মাতাল করা সঙ্গীত পথিকের কানে আসছে। কিন্তু কোথায় সেই সিংহ দ্বার যেখানে পথিক পৌঁছাতে চায়। এই সিংহ দ্বার খুঁজে পাবার জন্যই পথিক আলো জ্বালাতে বলেছে। কিন্তু পথিক যাকে চায় সে এখনও বহুদূরে।
লেখক এখানে বলতে চেয়েছেন স্বাধীনতার তোরণ বহুদূরে। সেখানে পৌঁছানোর জন্য যে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মদান প্রয়োজন তা এখনও পূর্ণ হয়নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

h¡wm¡ ehho
jqçjc He¡jm qL

লেখক পরিচিতি

মুহম্মদ এনামুল হক ২০ সেপ্টেম্বর ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার বখতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
তিনি ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাস করেন এবং ১৯৩৫ সালে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।
প্রধান শিক্ষক হিসেবে বেসরকারি স্কুলে মুহম্মদ এনামুল হকের কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি বিভিন্ন সরকারি কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচলক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকুরি করেন।
মুহম্মদ এনামুল হক প্রধানত গবেষক। তাঁর বহু গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ, আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য (আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের সঙ্গে), বঙ্গে সুফী প্রভাব, ব্যাকরণ মঞ্জুরী, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, মনীষা মঞ্জুষা ইত্যাদি।
মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৮২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ পরিচিতি

'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধটি মুহম্মদ এনামুল হক রচিত 'মনীষা মঞ্জুষা' (৩য় খণ্ড) থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। 'বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধটি 'বাংলা নববর্ষ' নামে ও সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- 'নববর্ষ' কী ও কেন তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বাংলা নববর্ষের রূপ কিভাবে ধরা পড়ে তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

আজ বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিন। দিনটিকে আমরা সচরাচর 'নববর্ষ' নামে চিহ্নিত করে থাকি। কারণ, নববর্ষ আমাদের কাছে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
পৃথিবীর সর্বত্র 'নববর্ষ' একটি ট্রেডিশন,' - একটা ঐতিহ্য। এটি আবার এমন এক 'ঐতিহ্য' যার বয়সের কোনো গাছপাথর নেই। গোড়ার কোনো সুনির্দিষ্ট বছরের সাথেও এর কোনো যোগ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না; অথচ যে কোনো বছরের প্রথম দিনটি 'নববর্ষ' নামে পরিচিত হয়ে আসছে। এর মানে এ নয় যে, দিনটিই নতুন বছর। বরং এর মানে হচ্ছে, নতুন বছরের আগমন উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য উৎসবের প্রথম দিন। প্রকৃতপক্ষে, 'নববর্ষ' একটা নির্দিষ্ট উৎসবের দিন।
আবার, পৃথিবীর সব নতুন বছরও এক সময়ে আরম্ভ হয় না। এতদসত্ত্বেও নববর্ষের নামের সাথে কতকগুলো ব্যক্তিগত, আর কতকগুলো সমষ্টিগত অনুষ্ঠান চিরকাল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। এগুলোর কোনো কোনোটি ধর্মের রঙে রঙিন, কোনো কোনোটি মর্মের রঙে রঙিন এবং কোনো কোনোটি ধর্ম ও মর্ম উভয় রঙে রঙিন। এগুলোতে রঙের ছোপ কখন কীভাবে লাগল, তার আঁচ পাওয়া তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়, তার জন্য মানব-সভ্যতার ইতিহাস যথেষ্ট বলে গণ্য হওয়া উচিত।
যতগুলো 'অব্দ' বা বৎসর পৃথিবীময় চালু ছিল বা আজও চালু আছে, তার সবগুলোই নির্দিষ্ট কালিক সীমারেখায় চিহ্নিত। অথছ, নববর্ষের অনুষ্ঠানগুলোর অনেকটিতে কালিক সীমারেখায় চিহ্নিত করা যায় না। এগুলো যেন কালাতীত। তা হলে

বুঝতে হয়, পৃথিবীতে পরিচিত বছরগুলোর আগে থেকেই এ অনুষ্ঠানগুলো প্রতিপালিত হত এবং বছর গোনা শুরু হয়েছে এমন কতগুলো অজ্ঞাতকুলশীল অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই।

'নববর্ষে' আমরা অতীত বৎসরের তিরোধান এবং সমাগত বৎসরের আবির্ভাবের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে যাই। যে বছর প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিল, একদিকে তার সুখ-দুঃখের বহু স্মৃতিমাখা চিত্র বিলীয়মান এবং অন্যদিকে যে বছর প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল তার ভাবী, অথচ অনিশ্চিত সম্ভাবনা সুনিশ্চিতরূপে বিদ্যমান। মানুষের মনোরাজ্যের এই অবস্থাটি অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না।

প্রকৃতির রাজ্যে এক ঋতুর বিদায় ও অন্য ঋতুর আগমনে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, তা প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে ফুটে ওঠে। এ দেশের নয়, পৃথিবীর সব দেশের পশু-পক্ষী ও প্রকৃতির পরিবর্তিত প্রভাব থেকে রেহাই পায় না। মানুষগুলোর শরীর ও মনে ছোঁয়া লাগে। আর, তারা নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে থাকে। এ অনুষ্ঠানগুলোর ঢং আর রং সর্বত্র এক নয়। যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের ধ্যান-ধারণা অনুসারে এগুলো ভোল পালটিয়েছে বটে, তবে এ ভোলের আড়ালে তার যে আসল রূপ, তা বের করে নেওয়া এমন কোনো শক্ত কাজ নয়।

'বাংলা নববর্ষে'র রূপ তার আচরিত অনুষ্ঠানগুলোতেই ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর যে কোন জাতীয় উৎসবের রূপ তার প্রতিপালিত অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যই দেখতে পাওয়া যায়। 'বাংলা নববর্ষের' জন্য এ কোনো বিশিষ্ট ব্যবস্থা নয়। 'পয়লা বৈশাখ' বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তচাঞ্চল্যের বহুমুখী অভিব্যক্তিই বড়-ছোঁট নানা অনুষ্ঠানে রূপ গ্রহণ করে থাকে। তাই 'পয়লা বৈশাখ' বা 'বাংলা নববর্ষ' কে বুঝতে হলে এই দিনে প্রতিপালিত অনুষ্ঠানগুলোর একটি মোঁটামুটি হিসাব-নিকাশ করে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হতে হবে। এ অনুষ্ঠানগুলোকে মোঁ দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা- সর্বজনীন অনুষ্ঠান ও স্থানীয় অনুষ্ঠান।

বাংলা নববর্ষের যে সমস্ত অনুষ্ঠান 'স্থান' ও 'পাত্র' সাপেক্ষ নয়, সেগুলোকে 'সর্বজনীন অনুষ্ঠান' নামে চিহ্নিত করা যায়। এ সমস্ত অনুষ্ঠান বাংলায় কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নয়; শুধু হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ এগুলো পালন করে না। এগুলো এখনও সম্পূর্ণ না হলেও বেশ ব্যাপকভিত্তিক অনুষ্ঠান। এককালে এগুলো যে সর্বজনীন ও সর্বব্যাপক ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পয়লা বৈশাখে বাংলার জনসমষ্টি অতীতের সুখ-দুঃখ ভুলে গিয়ে নতুনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওঠে। তারা জানে-এ নতুন অনিশ্চিতের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। তাই মন সাড়া দেয়, চঞ্চল হয়, নতুনকে গ্রহণ করার প্রস্তুতি নেয়। তারা সেদিন প্রাত্যহিক কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে ঘরবাড়ি ধুয়ে মুছে পরিষ্কারকরে আঁটপৌরে জামা কাপড় ছেড়ে, ধোপ-দোরস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ পরে, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা করে পানাহারে মেতে যায়; বটের তলায় জড়ো হয়ে গান গায়, হাতে তালি বাজায়, মুখে বাঁশি ফুকে, মাঠে-ঘাটে খেলায় বসে পড়ে, পুকুরে সাঁতার কাটে, ডুব দেয় ও নদ-নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সব কিছু মিলে দেশটা যেন হয়ে উঠে উৎসবমুখর।

চৈত্রের শেষ ও বৈশাখের প্রথম থেকেই গ্রীষ্মের দাবদাহ শুরু হয়। এ সময় আকাশ থেকে আগুন ঝরে; পশুপক্ষী গাছের ছায়ায় ঝিমুতে থাকে; মানুষের হাতে হাতে তালের পাখা শোভা পায়। বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষগুলো ডাবের জলে তৃষ্ণা মেটায়; ডাবের শাঁসে অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করে। দেশ জুড়ে চাতক 'দে জল দে জল' বলে চেঁচাতে থাকে আর উত্তরবঙ্গের পাড়ায় পাড়ায় সাঁঝের বেলায় 'আল্লা মেঘ দে, পানি দে' বলে যুবক যুবতী, বালক বালিকা সমস্বরে হাহাকার তোলে। মেঘের কাছ থেকে জল ভিক্ষা করা 'বাংলা নববর্ষের' আর একটা সর্বজনীন অনুষ্ঠান।

কাহিনী সংক্ষেপ

নববর্ষ পালনের ঐতিহ্য অনেক পুরাতন। ঠিক কবে থেকে নববর্ষ পালন শুরু, তা বলা যায় না। নতুন বছরের আগমন উপলক্ষে অনুষ্ঠেয় যে উৎসব তার প্রথম দিনটিই 'নববর্ষ'।

নববর্ষে একটি বছরকে আমরা সমাপ্ত করি আর অন্য একটি বছরকে স্বাগত জানাই। অতীতে বছরের সুখ-দুঃখের স্মৃতি আর নবাগত বছরের সম্ভাবনা দুটো মিলিয়ে মনোরাজ্যে একটি অনুভূতি জাগ্রত হয়।

বাংলা নববর্ষের রূপ তার অনুষ্ঠানগুলোতেই ধরা পড়ে। এ অনুষ্ঠানগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়। একটি সর্বজনীন অনুষ্ঠান ও অন্যটি স্থানীয় অনুষ্ঠান। যে অনুষ্ঠান স্থান ও পাত্র সাপেক্ষ নয় তাই সর্বজনীন অনুষ্ঠান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'বাংলা ননবর্ষ' প্রবন্ধটির লেখক কে?
   ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. আবুল ফজল
   গ. মুহম্মদ এনামুল হক ঘ. সৈয়দ মুজতবা আলী

২. নতুন বছরের প্রথম দিনকে আমরা কি বলি?
   ক. নবদিন খ. নববর্ষ
   গ. হালখাতা ঘ. নতুন বছর

৩. 'নববর্ষ' কিসের দিন?
   ক. আনন্দের খ. উৎসবের
   গ. গান বাজনার ঘ. হৈচৈ করার

৪. অব্দ শব্দের অর্থ কি?
   ক. দিন খ. মাস
   গ. বৎসর ঘ. শত বছর

৫. লেখক বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানগুলোকে কিভাবে ভাগ করেছেন?
   ক. গ্রামীণ ও শহুরে অনুষ্ঠান খ. বৃদ্ধ ও যুবকদের অনুষ্ঠানের
   গ. সর্বজনীন ও স্থানীয় অনুষ্ঠান ঘ. নর-নারীদের অনুষ্ঠান

খ. এক কথায়/বাক্যে উত্তর দিন

১. 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধটি কে রচনা করেন?
২. 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত?
৩. বাংলা বছরের প্রথম দিনটিকে আমরা কি বলি?
৪. বাংলা নববর্ষের রূপ কিসে ধরা পড়ে?
৫. বাংলা নববর্ষের যে সমস্ত অনুষ্ঠান স্থান ও পাত্র সাপেক্ষ নয়, সেগুলো কি ধরনের অনুষ্ঠান?
৬. বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন কোনটি?
৭. মেঘের কাছে জল ভিক্ষা করা কি ধরনের অনুষ্ঠান?

ক. উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. গ. মুহম্মদ এনামুল হক ২. খ. নববর্ষ
৩. খ. উৎসবের ৪. গ. বৎসর
৫. গ. সর্বজনীন ও স্থানীয় অনুষ্ঠান

খ.

১. মুহম্মদ এনামুল হক ২. মনীষা মঞ্জুষা ৩. নববর্ষ
৪. নববর্ষের অনুষ্ঠানে ৫. সর্বজনীন অনুষ্ঠান
৬. পয়লা বৈশাখ ৭. সর্বজনীন

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানগুলোর পরিচয় লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলা চিরদিনই কৃষিপ্রধান দেশ। শিল্পের ছোঁয়াচ লাগলেও, এদেশ এখনও শিল্পায়িত হতে অনেক দেরি। আবার এর কৃষি এখনও স্বনির্ভর নয়, বরং তার প্রায় সবটাই বৃষ্টিনির্ভর। বৃষ্টির জন্য চাই মেঘ। মেঘ না হলে বৃষ্টি হয় না; বৃষ্টি না হলে মাঠে লাঙল দেওয়া যায় না; লাঙল দেওয়া না গেলে মাঠে শস্য বোনাও একরূপ অসম্ভব। চাষবাসের সব কাজ বৈশাখ মাস থেকেই শুরু করতে হয়। এই রেওয়াজ এত প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী যে, আজও চাষীদের মধ্যে অনেকেই চৈত্র মাসে বৃষ্টি হলেও, বৈশাখ মাসের আগে মাঠে চাষ দেয় না। তারা মনে করে, চৈত্র মাসে শস্য বুনলে সে শস্য ফলে না। এ লৌকিক ধারণার সত্যতা যাচাই সম্ভব হয়নি।

'বাংলা নববর্ষের' সর্বজনীন অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে 'বার্ষিক মেলার' আয়োজনও একটি। বাংলাদেশের নানা স্থানে সারা বৈশাখ মাস ধরে, বিশেষ করে পয়লা বৈশাখে বড় ছোঁ নানা 'মেলা' বসে। স্থানীয় লোকেরাই এসব মেলার আয়োজন করে থাকে। মেলাগুলোর স্থায়িত্বকাল এক থেকে সাত দিন। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার নেকমর্দানে এখনও পয়লা বৈশাখে যে মেলা বসে, তা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের সবচাইতে বড় মেলা। এ মেলা এক সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। এতে উত্তরবঙ্গের হেন বস্তু নেই, যা পাওয়া যায় না। জনসাধারণের আনন্দ দানের উপযোগী আয়োজন এ মেলায় কম থাকে না। তন্মধ্যে নাচ, গান, নাগরদোলা প্রভৃতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা নববর্ষের 'পুণ্যাহ' নামক আরও একটি অনুষ্ঠান সর্বজনীন। 'পুণ্যাহ' শব্দের মৌলিক অর্থ: 'পুণ্য কাজ অনুষ্ঠানের পক্ষে জ্যোতিষ শাস্ত্রানুমোদিত প্রশস্ত দিন।' কিন্তু বাংলা এর অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে জমিদার কর্তৃক প্রজাদের কাছ থেকে নতুন বছরে খাজনা আদায় করার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানসূচক দিন। এই সেদিন পর্যন্ত জমিদার ও বড় বড় তালুকদারের কাছারিতে 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠিত হত। যদিও অধিকাংশ 'পুণ্যাহ' পয়লা বৈশাখে উদযাপিত হত, বেশ কিছু সংখ্যক 'পুণ্যাহ' সারা মাস ধরে পূর্ব নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত হত। সেদিন অধিকাংশ প্রজা ভাল কাপড়-চোপড় পরে জমিদার তালুকদার বাড়িতে খাজনা দিতে আসতেন। প্রজারা নতুন বছরের অথবা অতীত বছরের খাজনা আংশিক বা পুরোপুরি পরিশোধ করতেন। কোথাও কোথাও জমিদার তালুকদারেরা পান সুপারি দিতেন আর কোথাও কোথাও মিষ্টিমুখও করাতেন। ঐ দিন জমিদার-প্রজার সম্বন্ধের দূরত্ব খুব কমে আসত। তাঁরা পরস্পর মিলিত হতেন পরস্পরের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন, এমন কি পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে এ হিসেবেই এগুলো স্থানীয়।

'হালখাতার' অনুষ্ঠান পয়লা বৈশাখের আর একটি সর্বজনীন আচরণীয় রীতি। আমাদের দেশের সব শ্রেণীর ব্যবসায়ীর, অর্থাৎ দেশীয় ধরনের যারা ব্যবসায়ের হিসাব রাখেন তাঁদের মধ্যেই এই অনুষ্ঠানটির প্রচলন এখনও বর্তমান। তবে, অর্থনৈতিক কারণে এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রভাবে পয়লা বৈশাখের এই অনুষ্ঠানটির জাঁকজমক এখন বেশ কিছুটা কমে গেছে। কিন্তু 'হালখাতা' এখনও যথারীতি খোলা হয়। এখনও ব্যবসায়ীদের বিপণিগুলো পয়লা বৈশাখে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে পতাকা, লতা-পাতা প্রভৃতি দিয়ে সাজানো হয়। এখনও এই দিনে ব্যবসায় কেন্দ্রগুলোতে বেচাকেনার চেয়ে আলাপ আলোচনার ও সামাজিকতার পরিচয় পাওয়া যায় বেশি।

'হালখাতা' নতুন বাংলা বছরের হিসাব পাকাপাকিভাবে টুকে রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের নতুন খাতা খোলার এক আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ। এতে তাঁদের কাজ কারবারের লেনদেন, বাকি বকেয়া, উসল-আদায় সবকিছুর হিসাব-নিকাশ লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। নানা কাজ কারবারে তাঁদের সাথে যাঁরা সারা বছর জড়িত থাকেন অর্থাৎ যাঁরা তাঁদের নিয়মিত গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভার্থী, তাঁদের পত্রযোগে অথবা লোক মারফত দাওয়াত দিয়ে দোকানে একত্র করে সাধ্যমত জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। এ আপ্যায়ন একান্ত সৌজন্যমূলক হলেও এ সুযোগে অনেকে যাঁদের বাকি বকেয়াও শোধ করে দেন, যেন 'হালখাতায়' বাকির ঘরে তাঁদের নাম স্থান না পায়। নেহাত অসমর্থ না হলে কেউ বাকির ঘরে নাম তুলতে চান না। তাঁদের কাছে এটা একটা অপমানজনক ব্যাপার। এ দিক থেকে লক্ষ করলে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যে, 'হালখাতা' অনুষ্ঠান 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানেরই ওপিঠ। উভয় অনুষ্ঠানের সামাজিকতা, লৌকিকতা, সম্প্রীতি ও সৌজন্যের দিকও লক্ষণীয়। যতই রকমারি ও ভিন্ন প্রকৃতির হোক, 'নববর্ষের' উৎসব এ অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা অতি সাধারণ ব্যাপার লক্ষ করা যায়। পৃথিবীব্যাপী নরনারী 'নববর্ষে' অনুভব করে যে, জীবন ধারণের একটা কালচক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত এবং আর একটা কালচক্র সবে আবর্তনোদ্যত। এই আবর্তনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে তারা সবাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নববর্ষের উৎসবে যোগ দিয়ে থাকে। তাদের এ উৎসবের অনুষ্ঠানগুলোতে আশা, নিরাশা, আনন্দ, উল্লাস অথবা ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে।

আজও পৃথিবীতে ঋতুর পরিবর্তন ঘটে। আজও পৃথিবী বিভিন্ন ঋতুতে তার রূপ ঘটায়। আজও মানুষের দেহ মনে তার ছোঁয়া লাগে। আজও মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সময় বিশ্বময় 'নববর্ষ' উদযাপন করে।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

রেওয়াজ – রীতি, **শুভার্থী** – যে বা যিনি শুভ কামনা করেন, **কালচক্র** – সময়ের বৃত্ত।

কাহিনী সংক্ষেপ

বাংলা নববর্ষের সঙ্গে লৌকিক ধারণাও জড়িত হয়ে আছে। যেমন বৈশাখের আগে কখনই কৃষক মাঠে ফসল বুনে না। বাংলা নববর্ষের সর্বজনীন অনুষ্ঠান অনেকগুলো। যেমন- নববর্ষ উপলক্ষে মেলা বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয়। পুণ্যাহ যেটি জমিদার ও প্রজার সম্মিলিত একটি অনুষ্ঠান। পুণ্যাহর দিন প্রজা জমিদারকে কর দেয়।
হালখাতা বাংলা নববর্ষের সর্বজনীন আচরণীয় অনুষ্ঠান। এদিন ব্যবসায়ীরা তাঁদের নতুন খাতা খোলেন। গ্রাহক ও কারবারিদের সঙ্গে নতুন লেনদেনের শুরু হয়। এসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকে নানা লৌকিকতা ও সামাজিকতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. কোনটি নববর্ষের সর্বজনীন অনুষ্ঠান?
   ক. বার্ষিক সাহিত্য সভা খ. বার্ষিক নাঁক
   গ. বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ঘ. বার্ষিক মেলা

২. কোন দিন জমিদার প্রজার সম্বন্ধের দূরত্ব কমে আসত?
   ক. হালখাতার দিন খ. পুণ্যাহর দিন
   গ. নববর্ষের দিন ঘ. আনন্দের দিন

৩. নতুন বাংলা বছরে ব্যবসায়ীদের হিসাব খোলার অনুষ্ঠানটিকে কি বলে?
   ক. মহরৎ খ. হালখাতা
   গ. খেরো খাতা ঘ. শুভদিন

৪. উত্তরবঙ্গে পয়লা বৈশাখের সবচেয়ে বড় মেলা কোনটি?
   ক. সুলতানগঞ্জের মেলা খ. ধামরাইয়ের মেলা
   গ. নেকমর্দানের মেলা ঘ. রংপুরের মেলা

৫. লতা-পাতা দিয়ে কি সাজান হয়?
   ক. বিপনি খ. হাঁ-বাজার
   গ. ঘরবাড়ি ঘ. নাঁমন্দির

খ. সত্য হলে 'স' ও মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. বাংলা নববর্ষ সর্বজনীন
২. পয়লা বৈশাখ থেকে বাংলা নববর্ষ শুরু হয়.
৩. হালখাতা ও পুণ্যাহ একই অনুষ্ঠানের এপিঠ-ওপিঠ।
৪. পৃথিবীর অন্য কোন দেশের মানুষ নববর্ষ পালন করে না।
৫. বৃষ্টি হলেও কৃষকেরা চৈত্রমাসে ফসল বুনে না।
৬. বিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন নববর্ষ উদযাপিত হয়।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. ঘ. বার্ষিক মেলা ২. খ. পুণ্যাহর দিন ৩. খ. হালখাতা ৪. নেকমর্দানের মেলা ৫. ক. বিপনী

খ. ১. মি ২. স ৩. স ৪. মি ৫. স ৬. স

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলা নববর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠানগুলোর পরিচয় দিন।
২. বাংলা নববর্ষ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নববর্ষ উদযাপিত হয় কেন?
২. পুণ্যাহ কী?
৩. হালখাতা কী?

গ. ব্যাখ্যা করুন

১. নববর্ষ আমাদের কাছে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
২. আজও মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সময় বিশ্বময় 'নববর্ষ' উদযাপন করে।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : বাংলা নববর্ষ উযাপনের অনুষ্ঠানগুলোর পরিচয় দিন।

উত্তর : বাংলা নববর্ষের বৈশিষ্ট্য আসলে তার আচরিত অনুষ্ঠানগুলোতেই ধরা পড়ে। পয়লা বৈশাখে নতুন বছরের আগমনে বাঙালির চিত্ত চাঞ্চল্য নানাভাবে ধরা পড়ে।

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। নববর্ষের লৌকিক ধারণার কারণেই কৃষক তার কর্মকাণ্ড শুরু করে বৈশাখ মাসে।

বাংলা নববর্ষের সর্বজনীন অনুষ্ঠানের মধ্যে বার্ষিক মেলা একটি। বাংলাদেশের নানাস্থানে পয়লা বৈশাখে ছোঁ-বড় নানান মেলা বসে। দিনাজপুরের নেকমর্দানে নববর্ষের মেলা বসে। উত্তরবঙ্গে এ ধরনের এটিই সর্ববৃহৎ মেলা। জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন এ মেলায় পাওয়া যায় তেমনি আনন্দেরও নানান ব্যবস্থা থাকে।

'পুণ্যাহ' বাংলা নববর্ষের আরেকটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এদিনে প্রজারা জমিদারের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে। কুশল বিনিময় হয়, প্রজা জমিদারকে খাজনা দেয়। নববর্ষের হালখাতার অনুষ্ঠানটিও বিশেষ জনপ্রিয়। এটি মূলত ব্যবসায়ীদের অনুষ্ঠান। এদিনে ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায় ঘরদোর পরিষ্কার করে লতা-পাতা দিয়ে সাজিয়ে তোলেন। নতুন বছরে নতুন খাতায় হিসাব তোলেন। গতবছরের বাকির খাতায় যেন নাম না থাকে সে প্রচেষ্টা থাকে কারবারিদের। ব্যবসায়ী ছাড়াও অনেক শুভার্থী, পৃষ্ঠপোষক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে আসেন। কুশল বিনিময় ছাড়াও নানান ধরনের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়।

বাংলা নববর্ষের এগুলোই প্রধান অনুষ্ঠান। তবে স্থানভেদে অনুষ্ঠানের অনেক পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। তবে পয়লা বৈশাখে বাঙালির যে চিত্তচাঞ্চল্য, যে আনন্দ ও স্ফূর্তি তাই নববর্ষের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : 'নববর্ষ' উদযাপিত হয় কেন?

উত্তর : আদিম সভ্যতার কাল থেকেই মানুষ লক্ষ করেছে সময়ের কালচক্রকে। একটি বিশেষ চক্রের আবর্তনে ভিন্ন ভিন্ন ঋতু আসে প্রকৃতিতে। এ কালচক্রের আবর্তনকে বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করেছে। পুরাতনের পরে আসে নতুন। পুরাতনের ব্যথা ও বেদনা ভুলে আগামীর প্রত্যাশা ও আনন্দের মধ্যে ডুবে যাবার মানসিক উপলব্ধি থেকেই নববর্ষ পালনের সূচনা। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মানুষ বিভিন্নভাবে নববর্ষ উদযাপন করে। কিন্তু মূল মানসিক উপলব্ধি সর্বক্ষেত্রে একই। এ উপলব্ধির কারণেই সব জাতের মানুষ নববর্ষ উদযাপন করে।

প্রশ্ন : পুণ্যাহ কী?

উত্তর : পুণ্যাহ বাংলা নববর্ষের একটি সর্বজনীন অনুষ্ঠান। পুণ্যাহ শব্দের মূল অর্থ পুণ্য কাজের নির্দিষ্ট দিন। কিন্তু এখন এর অর্থ হচ্ছে- জমিদারের কাছে প্রজার খাজনা দানের প্রারম্ভিক দিন। অধিকাংশ পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হয় পয়লা বৈশাখ। প্রজারা অতীত বছরের অথবা নতুন বছরের খাজনা আংশিক বা পুরোপুরি পরিশোধ করতেন। এ উপলক্ষে পান-সুপারি অথবা মিষ্টিমুখেরও ব্যবস্থা থাকত। পুণ্যাহ ছিল জমিদার প্রজার মিলনের দিন। তাই তারা এদিন পরস্পরের প্রতি সুখ-দুঃখের খবরাখবর নিতেন।

প্রশ্ন : হালখাতা কী?

উত্তর : হালখাতা বাংলা নববর্ষের জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান। ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ অনুষ্ঠানের প্রচলন এখনও আছে। প্রতি ব্যবসায়ী নতুন বছরে হালখাতা খোলেন। এদিন কারবারিরা নতুন হিসাব খোলেন। গত বছরের হিসাব-নিকাশ করে নতুন বছরের শুভ সূচনা করেন। হালখাতা উপলক্ষে শুভার্থী পৃষ্ঠপোষকদেরও আগমন ঘটে। এদের সবাইকে মিষ্টিমুখ করান হয়। হালখাতা বাংলা নববর্ষের একটি সম্প্রীতি ও একটি আদর্শ অনুষ্ঠান।

ব্যাখ্যা উত্তর

নববর্ষ আমাদের কাছে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি মুহম্মদ এনামুল হক রচিত 'বাংলা নববর্ষ' নামক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে নববর্ষের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে।

আমাদের জীবনে নববর্ষের গুরুত্ব অনেক। কালচক্রের আবর্তনে বারবার নববর্ষ ফিরে আসে। নববর্ষের এই ফিরে আসা যেমন ব্যক্তির কাছে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সমষ্টিগতভাবেও। বিগত বছরের ব্যর্থতা ও গ্লানি ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করে। সেই সঙ্গে আগত বছরের উদ্দীপনা ও প্রেরণা সৃষ্টি করে। ব্যক্তিজীবনের মতো সমষ্টিগত জীবনেও নিয়ে আসে সম্ভাবনার প্রাচুর্য। এজন্যই লেখক মন্তব্য করেছেন যে নববর্ষ আমাদের ব্যক্তিজীবন ও সমষ্টিজীবনে গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

লেখক পরিচিতি

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে মোতাহের হোসেন চৌধুরী কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাস করেন। কর্মজীবনে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী যুক্তিবাদী ও সুরুচিসম্পন্ন সংস্কৃতিবান মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রতিষ্ঠান 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও এর মুখপত্র 'শিখা' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল।

'সংস্কৃতি কথা' মোতাহের হোসেন চৌধুরীর একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ। তাঁর মৃত্যুর পরে এটি প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে চিন্তামূলক প্রবন্ধের ধারায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'সভ্যতা' ও 'সুখ' নামে তাঁর দুটি অনুবাদ গ্রন্থ আছে।

১৯৫৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ পরিচিতি

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধগ্রন্থের 'মনুষ্যত্ব' নামক প্রবন্ধের অংশবিশেষ। শিক্ষা মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করে। মানুষের জীবনসত্তাকে অস্বীকার করা যায় না। জীবসত্তার প্রয়োজন মিটিয়ে তবে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। এ বিকাশে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষার কাজ জ্ঞান সৃষ্টি বা বিতরণ করা নয় - মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- জীবসত্তা ও মানবসত্তার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।
- মানব জীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব ওপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীবসত্তার ঘরেও সে কাজ করে; ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্ববোধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায়, শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনের দিকও আছে। আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কি করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কি করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

শিক্ষার এই দিকটা যে বড় হয়ে ওঠে না, তার কারণ ভুল শিক্ষা ও নিচের তলায় বিশৃঙ্খলা জীবসত্তার ঘরটি এমন বিশৃঙ্খল হয়ে আছে যে, হতভাগ্য মানুষকে সব সময়ই সে সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। ওপরের তলার কথা সে মনেই আনতে পারে না। অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি। ধনী-দরিদ্র সকলেরই অন্তরে সেই একই ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে : চাই, চাই, আরও চাই। তাই অন্নচিন্তা তথা অর্থচিন্তা থেকে মুক্তি না পেলে, অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়- একথা মানুষকে ভালো করে বোঝাতে না পারলে মানবজীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারবে না। ফলে শিক্ষার সুফল হবে ব্যক্তিগত, এখানে সেখানে দু-একটি মানুষ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করতে পারবে, কিন্তু বেশিরভাগ লোকই যে তিমিরে সে তিমিরে থেকে যাবে।

তাই অন্নচিন্তার নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার যে চেষ্টা চলেছে তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে সে চেষ্টাও মানুষকে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় না। কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু? প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলে আলো হাওয়ার স্বাদ-বঞ্চিত মানুষ কারাগারকেই স্বর্গতুল্য মনে করে। কিন্তু তাই বলে যে তা সত্যসত্যই স্বর্গ হয়ে যাবে, তা নয়। বাইরের আলো হাওয়ার স্বাদ পাওয়া মানুষ প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলেও কারাগারকে কারাগারই মনে

করবে, এবং কি করে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা-ই হবে তার একমাত্র চিন্তা। আকাশ-বাতাসের ডাকে যে পক্ষী আকুল সে কি খাঁচায় বন্দি হবে সহজে দানাপানি পাওয়ার লোভে? অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়, এই বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয়।

চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই, সেখানে মুক্তি নেই। মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে এই মুক্তির দিকে লক্ষ রেখে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষটিকে তৃপ্ত রাখতে না পারলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না বলেই ক্ষুৎপিপাসার তৃপ্তির প্রয়োজন। একটা বড় লক্ষ্যর দিকে দৃষ্টি রেখেই অন্নবস্ত্রের সমাধান করা ভালো, নইলে তা আমাদের বেশি দূর নিয়ে যাবে না।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

ক্ষুৎপিপাসা – ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, **নিগড়** – শিকল, **অর্থসাধনা** – অর্থ উপার্জনের চেষ্টা, **জীবন সাধনা** – জীবন উন্নয়নের চেষ্টা, **তিমির** – অন্ধকার।

কাহিনী সংক্ষেপ

মানবজীবনের দুটি সত্তা - একটি জীবসত্তা ও অন্যটি মানবসত্তা। জীবসত্তা নিছক জীবন হিসেবে বেঁচে থাকা আর মানবসত্তা হচ্ছে - মনুষ্যত্বের সাধনা। শিক্ষার দুটো দিক - একটি প্রয়োজনের অন্যটি অপ্রয়োজনের। অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়। শিক্ষা অন্নবস্ত্রের সমাধানে সাহায্য করে আবার মনুষ্যত্ব অর্জনেও সাহায্য করে। মনুষ্যত্ব অর্জনের সঙ্গে দরকার চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা। মুক্তি না থাকলে মানুষ জীবন-অমৃতের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
   ক. ১৮৮০ সালে খ. ১৮০১ সালে
   গ. ১৯০৩ সালে ঘ. ১৯২৭ সালে

২. 'সংস্কৃতি চিন্তা' কী ধরনের গ্রন্থ?
   ক. গদ্যগ্রন্থ খ. প্রবন্ধগ্রন্থ
   গ. কাব্যগ্রন্থ ঘ. গল্পগ্রন্থ

৩. লেখক দোতালা ঘরের নিচের তলাকে কী বলেছেন?
   ক. প্রাণীসত্তা খ. জীবসত্তা
   গ. জীবনসত্তা ঘ. প্রাণসত্তা

৪. কী আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে?
   ক. অধ্যবসায় খ. শিক্ষা
   গ. অনুশীলন ঘ. প্রচেষ্টা

৫. কিসের নিগড়ে সকলে বন্দি
   ক. অর্থচিন্তা খ. গৃহচিন্তা
   গ. অন্নচিন্তা ঘ. চাকরি-চিন্তা

৬. অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও কী বড়?
   ক. শক্তি খ. ভক্তি
   গ. মুক্তি ঘ. যুক্তি

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. জীবসত্তা সেই ঘরের .....।
২. মানবসত্তা বা ..... ওপরের তল।
৩. শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি ..... দিকও আছে।

৪. ..... নিগড়ে সকলে বন্দী।
৫. ..... আহারতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু?
৬. অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও ..... বড়।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. গ. ১৯০৩ সালে ২. খ. প্রবন্ধ গ্রন্থ ৩. খ. জীবসত্তা
৪. খ. শিক্ষা ৫. ক. অর্থচিন্তা ৬. গ. মুক্তি

খ. ১. নিচের তলা ২. মনুষ্যত্ব ৩. অপ্রয়োজনের
৪. অর্থচিন্তার ৫. কারারুদ্ধ ৬. মুক্তি

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- মানবজীবনে অন্নবস্ত্রের সমাধান কেন প্রয়োজন তা লিখতে পারবেন।
- মনুষ্যত্বের বিকাশ কিভাবে সম্ভব তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

তাই মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। একটি অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা, আরেকটি শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ানোর সাধনা। এই উভয়বিধ চেষ্টার ফলেই মানবজীবনের উন্নয়ন সম্ভব। শুধু অন্নবস্ত্রের সমস্যাকে বড় করে তুললে সুফল পাওয়া যাবে না। আবার শুধু শিক্ষার ওপর নির্ভর করলে সুদীর্ঘ সময়ের দরকার। মনুষ্যত্বের স্বাদ না পেলে অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েও মানুষ যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকতে পারে; আবার শিক্ষাদীক্ষার মারফতে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলেও অন্নবস্ত্রের দুশ্চিন্তায় মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব নয়।

কোনো ভারী জিনিসকে ওপরে তুলতে হলে তাকে নিচের থেকে ঠেলতে হয়, আবার ওপর থেকে টানতেও হয়; শুধু নিচের থেকে ঠেললে তাকে আশানুরূপ ওপরে উঠানো যায় না। মানব উন্নয়নের ব্যাপারে শিক্ষা সেই ওপর থেকে টানা, আর সসুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা নিচের থেকে ঠেলা। অনেকে মিলে খুব জোরে ওপরের থেকে টানলে নিচের ঠেলা ছাড়াও কোনো জিনিস ওপরে ওঠানো যায়, কিন্তু শুধু নিচের ঠেলায় বেশিদূর ওঠানো যায় না। তেমনি আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষার দ্বারাই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব, কিন্তু শুধু সমাজব্যবস্থার সুশৃঙ্খলতার দ্বারা তা সম্ভব নয়। শিক্ষা-দীক্ষার ফলে সত্যিকার মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অন্নবস্ত্রের সমাধান সহজেই হতে পারে। কেননা, অন্নবস্ত্রের অব্যবস্থার মূলে লোভ, আর শিক্ষাদীক্ষার ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' কথাঁটা বুলিমাত্র নয়, সত্য। লোভের ফলে যে মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে, অনুভূতির জগতে সে ফতুর হয়ে পড়ে, শিক্ষা মানুষকে সে কথা জানিয়ে দেয় বলে মানুষ লোভের ফাঁদে ধরা দিতে ভয় পায়। ছোঁ জিনিসের মোহে বড় জিনিস হারাতে যে দুঃখ বোধ করে না, সে আর যা-ই হোক, শিক্ষিত নয়। শিক্ষা তার বাইরের ব্যাপার, অন্তরের ব্যাপার হয়ে ওঠে নি। লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়। শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি; জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় হিসেবেই আসে। তাই যেখানে মূল্যবোধের মূল্য পাওয়া হয় না, সেখানে শিক্ষা নেই।

শিক্ষার মারফতে মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়; তথাপি অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়। তা না হলে জীবনের উন্নয়নে অনেক বিলম্ব ঘটবে। মনুষ্যত্বের তাগিদে মানুষকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা ভালো; কিন্তু প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি না পেলে মনুষ্যত্বের আহ্বান মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছতে দেরি হয় বলে অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজন। পায়ের কাঁটার দিকে বারবার নজর দিতে হলে হাঁটার আনন্দ উপভোগ করা যায় না, তেমনি অন্নবস্ত্রের চিন্তায় হামেশা বিব্রত হতে হলে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই দু'দিক থেকেই কাজ চলা দরকার। একদিকে অন্নবস্ত্রের চিন্তার বেড়ি উন্মোচন, অপরদিকে মনুষ্যত্বের আহ্বান, উভয়ই প্রয়োজনীয়। নইলে বেড়িমুক্ত হয়েও

মানুষ ওপরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করবে না, অথবা মনুষ্যত্বের আহ্বান সত্ত্বেও ওপরে যাওয়ার স্বাধীনতার অভাব বোধ করবে, পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো উড়বার আকাঙ্ক্ষায় পাখা ঝাপটাবে, কিন্তু উড়তে পারবে না।

কাহিনী সংক্ষেপ

মানুষের মুক্তি আনতে হবে দুদিক থেকে। মানুষকে অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্ত করতে হবে। অন্যদিকে মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাদ লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এজন্য শিক্ষার প্রয়োজন। তবে মনে রাখতে হবে শিক্ষার কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। অন্নবস্ত্রের চিন্তায় সমসময় ব্যস্ত থাকলে মুক্তির আনন্দ পাওয়া যায় না। অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি ও মনুষ্যত্বের আহ্বান দুটোই প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষার প্রকৃত কাজ কী?
   ক. জ্ঞান সৃষ্টি করা — খ. বিদ্যানুরাগ সৃষ্টি
   গ. মূল্যবোধ সৃষ্টি করা — ঘ. বিদ্বান করা

২. শিক্ষার ফলে মানুষ কী করতে পারে?
   ক. জানতে পারে — খ. উপলব্ধি করতে পারে
   গ. ধারণা পায় — ঘ. চেতনা সমৃদ্ধ করে

৩. 'লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়' এই লেফাফাদুরস্তি কী?
   ক. বিদ্যা জাহির করার প্রবণতা — খ. বাইরে ঠিকঠাক কিন্তু ভিতরে ফাঁকা
   গ. অল্পবিদ্যা ভয়ংকরতা — ঘ. প্রতারণা

৪. অন্নবস্ত্রের চিন্তায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকলে মানুষ কিসের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়?
   ক. মুক্তির আনন্দ — খ. স্বাধীনতার আনন্দ
   গ. যা খুশি করার আনন্দ — ঘ. সাহিত্যচর্চার আনন্দ

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. গ. মূল্যবোধ সৃষ্টি করা ২. খ. উপলব্ধি করতে পারে ৩. খ. বাইরে ঠিকঠাক কিন্তু ভিতরে ফাঁকা ৪. ক. মুক্তির আনন্দ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. জীবনসত্তা ও মানবসত্তা বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন? মানব জীবন বিকাশের জন্য এ দুটো সত্তার গুরুত্ব কী?
২. মনুষ্যত্বের বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা কী?
৩. 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষার কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি করা' কথাটির তাৎপর্য কী?
২. মানব জীবনকে দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?

গ. প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা।
২. আকাশ বাতাসের ডাকে যে পক্ষী আকুল, সে কি খাঁচায় বন্দী হবে দানাপানির লোভে?
৩. শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি।

প্রশ্ন ১ : জীবসত্তা ও মানবসত্তা বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন? মানব জীবন বিকাশের জন্য এ দুটো সত্তার গুরুত্ব কী?

উত্তর : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী জীবনকে তুলনা করেছেন একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে। তাঁর মতে একতলা হচ্ছে 'জীবসত্তা' আর দোতলা হচ্ছে মনুষ্যত্ব বা মানবসত্তা। মানুষের জীবন সাধনা হচ্ছে একতলা থেকে দোতলায় উঠার প্রচেষ্টা। জীবসত্তা মানে হচ্ছে মানুষের জীবত্ব বা প্রাণিত্ব। মানুষ প্রথমত একটি জীব। এই জীবত্বকে বাঁচানো মানুষের প্রথম কর্তব্য। মানুষের মানবসত্তা বা মনুষ্যত্বের বোধে পৌঁছাতে সবচেয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে শিক্ষা। শিক্ষার আছে একটি প্রয়োজনের দিক অপরটি অপ্রয়োজনের দিক। শিক্ষা জীবসত্তার প্রয়োজন মেটাতে যেমন সাহায্য করে তেমন শেখায় জীবনকে উপভোগ করতে, অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করতে।

অন্নচিন্তা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে তাকে দিতে হবে মুক্তি ও স্বাধীনতা। শুধু অন্নচিন্তা থেকে মুক্ত হলে সে আরেকটি কারাগারে আবদ্ধ হবে মাত্র। এজন্য মানুষের দরকার চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা। এসব স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হিসেবেই আগে মানুষকে অন্নচিন্তা থেকে মুক্ত করতে হবে। সব সময় যদি অন্নের চিন্তা করতে হয় তবে মনুষ্যত্ব বাধাগ্রস্ত হয়। এজন্য মানুষের পূর্ণ বিকাশের জন্য দরকার অন্নচিন্তা থেকে মুক্তি এবং মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য বাধাবন্ধহীন উপলব্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতা।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন ১ : শিক্ষার কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টিকরা' কথাটির তাৎপর্য কী?

উত্তর : শিক্ষার কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি করা' উদ্ধৃতিটি মোতাহের হোসেন রচিত 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' নামক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে।

শিক্ষা মানুষের জন্য অপরিহার্য। লেখক যে জীবসত্তার কথা বলেছেন তা থেকে মানবসত্তায় উন্নীত হতে হলে মানুষকে শিক্ষার সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে মনে হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য বুঝি জ্ঞান পরিবশেন করা। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য কিন্তু তা নয়। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান পরিবশেন করা হয় ঠিকই কিন্তু শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। মূল্যবোধ একটি মানসিক ধারণা বা আদর্শ। সেটি সফল হলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে - বলা যেতে পারে। সুতরাং লেখকের উক্তি 'শিক্ষার কাজ জ্ঞান পরিবশেন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি করা' - এর সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত পোষণ করতে পারি।

ব্যাখ্যা উত্তর

১. জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা।

উত্তর : আলোচ্য অংশটি মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচিত 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' নামক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

লেখক কল্পনা করেছেন জীবন দুটি ভাগে বিভক্ত। অনেকটা দোতলা ঘরের মতো। একতলাটি হচ্ছে জীবসত্তা অর্থাৎ মানুষের প্রাণীসত্তা। জীবসত্তা বাঁচলেই দ্বিতীয়টি অর্থাৎ মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায়। একতলা না থাকলে দোতলা হয় না। তেমনি জীবসত্তা না বাঁচলে মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায় না। কিন্তু মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হবে অর্থাৎ দোতলায় পৌঁছাতে হবে। এ পৌঁছানোর কাজটি করে দেয় শিক্ষা। মই যেমন ওপরে ওঠার বাহন, শিক্ষা হচ্ছে তেমনি মনুষ্যত্ব অর্জনের বাহন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

রসগোল্লা

সৈয়দ মুজতবা আলী

লেখক পরিচিতি

সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম ১৯০৪ সালে ১৩ সেপ্টেম্বর আসামের কাছাড় জেলার করিমগঞ্জে জন্মগ্রহন করেন। শিক্ষা জীবনের সূচনা কাল তাঁর কেটেছে সিলেট জেলায়। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া করেন। জামার্নির বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯২৭ সালে সৈয়দ মুজতবা আফগানিস্তানের কাবুল কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ইংরেজি ও জার্মান ভাষার অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। তিনি বিশ্বভারতী, বরোদা কলেজ এবং বগুড়া আজিজুল হক কলেজে শিক্ষকতা করেন।

সৈয়দ মুজতবা আলী বহুভাষাবিদ পণ্ডিত। ইংরেজি, আরবি, ফারসি, জার্মানসহ নানা ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। একজন ভ্রমণকারী হিসেবে বিভিন্ন দেশ, সমাজ ও মানুষকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর দেখা নানান অভিজ্ঞতাকে রসমধুর করে তিনি সাহিত্যে পরিবেশন করেছেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাবলির মধ্যে: দেশে বিদেশে, চাচা কাহিনী, পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী, ধূপছায়া, শবনম ইত্যাদি প্রধান। ১৯৭৪ সালে ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ পরিচিতি

রসগোল্লা একটি রম্য রচনা। এটি লেখকের 'ধুপছায়া' গ্রন্থ থেকে সংকলিত। রচনাটির মূল নাম 'চুঙ্গিঘর'।

রসগোল্লা বাঙালির চিরপ্রিয় মিষ্টান্ন। লেখক রসগোল্লাকে কেন্দ্র করে মধুর হাস্যরস যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমনি রসগোল্লার মহিমাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন দেশ থেকে বিদেশের মাটিতে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- ঝাড়ুদার সঙ্গে চুঙ্গিওয়ালার কথোপকথন বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমার এক বন্ধু প্রায়ই ইউরোপ-আমেরিকায় যান। এতই বেশি যাওয়া আসা করেন যে তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা হলে বলবার উপায় নেই, তিনি বিদেশে যাচ্ছেন না ফিরে আসছেন।

ঝাড়ুদা ব্যবসায়ী লোক। তিনি নেমেছেন ইতালির ভেনিস বন্দরে জাহাজ থেকে। চুঙ্গিঘরের যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে শেষটায় লিখেছেন, এক টিন ভ্যাকুয়াম প্যাকড মিষ্টান্ন। মূল্য দশ টাকা।

ঝাড়ুদার বাক্সপেটরায় এত সব জাত-বেজাত হোটেলের লেবেল লাগানো থাকত যে, অগা চুঙ্গিওলাও বুঝতে পারত এগুলোর মালিক বাস্তুভিটার তোয়াক্কা করে না - তার জীবন কাটে হোটেলে হোটেলে। আজকের চুঙ্গিওলা কিন্তু সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করলে, প্রথম ভাগের ছেলে যে-রকম বানান ভুল করে করে বই পড়ে। লোকটার চেহারাও বদখত। টিঙটিঙে রোগা, গাল দুটো ভাঙা।

চুঙ্গিওলা শুধালে, ওই টিনটার ভিতর কী?

: সুইটস।

: ওটা খুলুন।

সে কী করে হয়? ওটা আমি নিয়ে যাব লন্ডনে। খুললে বরবাদ হয়ে যাবে যে!

চুঙ্গিওলা যেভাবে ঝাড়ুদার দিকে তাকালে তা যা টিন খোলার হুকুম হল, পাঁচশ ঢেঁটরা পিটিয়ে কোনো বাদশাও ওরকম হুকুমজারি করতে পারতেন না।

ঝাড়ুদা মরিয়া হয়ে কাতর-নয়নে বললেন, ব্রাদার, এ টিনটা আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর মেয়ের জন্য লন্ডনে, এটা খুললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এবার চুঙ্গিওলা যেভাবে তাকালে, তাতে আমি হাজার ঢেঁটরার শব্দ শুনতে পেলুম।

বিরাঁ লাশ ঝাড়ুদা পিঁপড়ের মতো নয়ন করে সকাতরে বললেন, তাহলে ওটা ডাকে করে লন্ডনে পাঠিয়ে দাও, আমি ওটাকে সেখানেই খালাস করব।

কিন্তু আশ্চর্য, চুঙ্গিওলা তাতেও রাজি হয় না। আমরা সবাই কসাইটাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ঝাড়ুদার প্রস্তাবটি অতিশয় সমীচীন এবং আইনসঙ্গতও বটে। চুঙ্গিওলার ভাবখানা সে পৃথিবীর কোনো ভাষাই বোঝে না।

ঝাড়ুদা তখন চটেছেন। বিড়বিড় করে বললেন, তবে খুলছি। কিন্তু ব্যাঁটা তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ছি নে।

তারপর ইংরেজিতে বললেন, কিন্তু তোমাকে ওটা নিজে খেয়ে পরখ করে দেখতে হবে। ওটা সত্যি সুইটস কিনা।

শয়তানটা চট করে কাউন্টারের নিচে থেকে টিনটাকার বের করে দিল। ঝাড়ুদা টিনকাঁটার হাতে নিয়ে ফের চুঙ্গিওলাকে বললেন, তোমাকে কিন্তু ওই মিষ্টি পরখ করতে হবে নিজে, আবার বলছি।
চুঙ্গিওলা একটু শুকনো হাসি হাসলে। শীতে বেজায় ঠোঁট ফাঁলে আমরা যেরকম হেসে থাকি!

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

ইতালি – ইউরোপ মহাদেশের একটি দেশ, **ভেনিস** – ইতালির একটি বন্দর, **পেটরা** – বাক্স, **বেজাত** – পতিত জাতি। **অগা** – পতিত জাতি, নির্বোধ, **বদখত** – কদাকার, **টিঙটিঙে** – রোগাটে, **বরবাদ** – বাতিল, **ঢ্যাঁরা পিটিয়ে** – ঢাক পিটিয়ে, **সমীচীন** – যথার্থ, উপযুক্ত, **টিন-কাঁটার** – টিন কাঁটার যন্ত্র।

কাহিনী সংক্ষেপ

ঝাড়ুদা ব্যবসায়ী লোক। ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে বেড়ান। একবার তিনি নেমেছেন ইতালির ভেনিস বন্দরে। চুঙ্গিঘরে যাবতীয় মালামালের বিবরণ দেওয়ার পর গোল বাধল একটা টিন নিয়ে। তাতে ছিল রসগোল্লা। ঝাণ্ডুদা কিছুতেই ওটা খুলবেন না আর চঙ্গিওয়ালাও ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত ঝাড়ুদা টিনটা খুলতে উদ্যত হলেন। তবে চুঙ্গিওয়ালাকে বলে দিলেন এ মিষ্টি তাকে পরখ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. রসগোল্লা কোন ধরনের রচনা?
   ক. প্রবন্ধ　　খ. রম্যরচনা
   গ. ছোঁগল্প　　ঘ. নাঁক

২. রসগোল্লা রচনাটির লেখক কে?
   ক. মীর মশাররফ হোসেন　　খ. কাজী ইমদাদুল হক
   গ. সৈয়দ মুজতবা আলী　　ঘ. সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ

৩. ঝাড়ুদার পেশা কী?
   ক. ব্যবসায়　　খ. ভবঘুরে
   গ. দেশভ্রমণ　　ঘ. গল্প লেখা

৪. ঝাড়ুদা কোথায় নেমেছেন?
   ক. মিসরের সুয়েজ বন্দরে　　খ. হিথ্রো বিমান বন্দরে
   গ. ইতালির ভেনিস বন্দরে　　ঘ. সিঙ্গাপুর বন্দরে

৫. চুঙ্গিঘর কী?

ক. থানা ঘর　　খ. হিসাব-নিকাশের ঘর

গ. সংরক্ষিত ঘর　　ঘ. শুল্ক আদায়ের ঘর

খ. সত্য হলে মিথ্যা হলে মি লিখুন

১. 'রসগোল্লা' একটি রম্য রচনা।

২. ঝান্ডুদা একজন কূটনীতিবিদ

৩. ঝান্ডুদার সঙ্গে ছিল 'একটিন ভ্যাকুয়াম প্যাকেট মিষ্টান্ন"।

৪. ঝান্ডুদার সঙ্গে চুঙ্গিওয়ালার ঘটনাটি ঘটেছিল।

৫. চুঙ্গিওয়ালা লোকটার চেহারা ছিল বদখত।

উত্তরগুলো মিটিয়ে নিন।

ক] ১. খ. রম্যরচনা ২. গ. সৈয়দ মুজতবা আলী ৩. ক. ব্যবসায় ৪. গ. ইতালির ভেনিস বন্দরে

৫. ঘ. শুল্ক আদায়ের ঘর।

খ] ১. স ২. মি ৩. স ৪. সি ৫. স

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- রসগোল্লা নিয়ে কৌতুককর ঘটনাটির বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ঝান্ডুদার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ঝান্ডুদা টিন কাঁলেন।

কী আর বেরুবে? বেরুল রসগোল্লা। কাঁটাচামচের তোয়াক্কা না করে রসগোল্লা হাত দিয়ে তুলে প্রথমে বিতরণ করলেন বাঙালিদের। তারপর যাবতীয় ভারতীয়দের, তারপর সবাইকে, অর্থাৎ ফরাসি, জার্মান, ইতালিয় এবং স্পানিয়ার্ডদের।

তামাম চুঙ্গিঘর তখন রসগোল্লা গিলছে। আকাশে বাতাসে রসগোল্লা। চুঙ্গিঘরের পুলিশ-বরকন্দাজ- চাপরাশি সকলেরই হাতে রসগোল্লা।

ওদিকে দেখি ঝান্ডুদা আপন ভুঁড়িটি কাউন্টারের ওপর চেপে ধরে চুঙ্গিওলার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছেন বাংলাতে 'একটা খেয়ে দেখ।' হাতে তার একটি সরেস রসগোল্লা।

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা একটু পিছনের দিকে হটিয়ে গম্ভীর রূপ ধারণ করেছে। ঝান্ডুদা নাছোড়বান্দা। সামনের দিকে আর একটু এগিয়ে বললেন, 'দেখছ তো, সবাই খাচ্ছে। চেখে দেখ, এ বস্তু কী'!

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা আরও পিছিয়ে নিলে। লোকটা অতি পাষণ্ড। একবারের তরে সরি-টরিও বললে না।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, ঝান্ডুদা তামাম ভুঁড়িখানা কাউন্টারের ওপর চেপে ধরে ক্যাঁক করে পাকড়ালেন চুঙ্গিওলার কলার বাঁ হাতে, আর ডান হাতে থেবড়ে দিলেন একটা রসগোল্লা ওর নাকের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে মোঁটা গলায় বললেন, 'তুমি খাবে না? তোমার গুষ্টি খাবে। ব্যাঁটা, তুমি মস্করা পেয়েছ? পইপই করে বললুম, রসগোল্লাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, তা তুমি শুনবে না!

ততক্ষণে কিন্তু তাবৎ চুঙ্গিঘরে লেগে গেছে ধুন্দুমার। আর চিৎকার চেঁচামেচি হবেই না কেন? এ যে রীতিমত বেআইনী কর্ম। কর্মটির জন্য আকছারই জেলে যেতে হয়।

ঝাড়ুদার কোমর জাবড়ে ধরে আমরা জন পাঁচেক তাঁকে কাউন্টার থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করছি। তিনি পর্দার পর পর্দা চড়াচ্ছেন, 'খাবি নি, ও পরান আমার, খাবিনি ব্যাঁটা। চুঙ্গিওলা ক্ষীণকণ্ঠে পুলিশকে ডাকছে! কিন্তু কোথায় পুলিশ? চুঙ্গিঘরের পাইক, বরকন্দাজ, ডাণ্ডাবরদার, আসসরদার বেবাক চাকর-নফর, বিলকুল বেমালুম গায়েব। এ কি ভানুমতী, এ কি ইন্দ্রজাল!

ইতোমধ্যে ঝণ্ডুদাকে বহুকষ্টে কাউন্টারের এদিকে নামানো হয়েছে। চুঙ্গিওলা রুমাল দিয়ে রসগোল্লার থ্যাবড়া মুছতে যাচ্ছে দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'ওটা মুছিসনি, আদালতে সাক্ষী দেবে'।

কে একজন ঝাড়ুদাকে সদুপদেশ দিলে, পুলিশ-টুলিস ফের এসে যাবে! ততক্ষণে আপনি কেটে পড়ুন।

'তিনি বললেন, 'না, ওই যে লোকটা ফোন করছে। আসুন না ওদের বড় কর্তা।'

তিন মিনিটের ভিতর বড়কর্তা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। ঝাড়ুদা বড় সাহেবের সামনে গিয়ে বললেন, 'সিন্নোর, বিফো' ইউ প্রসীড, অর্থাৎ কিনা ময়না তদন্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আপনি একটি সুইটস চেখে দেখুন বলে নিজে মুখে তুললেন একটি, আমাদের সবাইকে আর এক প্রস্থ বিতরণ করলেন।

বড় কর্তা একটি মুখে তুলেই চোখ বন্ধ করে রইলেন আড়াই মিনিট। চোখ বন্ধ অবস্থায়ই আবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফের আবার।

টিন তখন ভোঁ ভোঁ।

চুঙ্গিওলা তাঁর ফরিয়াদ জানাল।

কর্তা বললেন, 'টিন খুলেছ তো বেশ করেছ, না হলে খাওয়া যেত কী করে?' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কী করতে? আরও রসগোল্লা নিয়ে আসুন। 'আমরা সুড়সুড় করে বেরিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলুম। কর্তা চুঙ্গিওলাকে বলছেন, 'তুমিও তো একটা আস্ত গাড়ল। টিন খুললে আর এই সরেস মাল চেখে দেখলে না?'

আমি গাইলুম, রসের গোলক, এত রস কেন তুমি ধরেছিলে হায়।
ইতালির দেশ ধর্ম ভুলিয়া লুটাইল তব পায়।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

স্প্যানিয়ার্ড – স্পেন দেশের অধিবাসী, **তামাম** – সব, **তামাত চুঙ্গিঘর তখন রসগোল্লা গিলছে** – চুঙ্গিঘরে উপস্থিত সকলে রসগোল্লা খাচ্ছে, এ অর্থে ব্যবহৃত, **চাপরাশি** – পেয়াদা, **সরেস** – ভাল, **পাষণ্ড** – নিষ্ঠুর, **থেবড়ে** – চ্যাপ্টা করে, **পইপই** – বারবার, **তাবৎ** – সকল, **ধুন্দুমার** – তুমুল হৈচৈ, গোলমাল, **আকছার** – প্রায়ই, **ডান্ডাবরদার** – ডান্ডাওয়ালা, **আসসরদার** – সরদার অর্থে আসসরদার কৌতুক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

কাহিনী সংক্ষেপ

ঝাড়ুদা টিন কেটে রসগোল্লা বের করলেন। চুঙ্গিঘরে উপস্থিত সকলের মধ্যে রসগোল্লা বিতরণ করলেন। পরে চুঙ্গিওয়ালাকে রসগোল্লা চেখে দেখতে বললেন। কিন্তু গোমড়ামুখো চুঙ্গিওয়ালা কথাটি পর্যন্ত বলে না। শেষে চুঙ্গিওয়ালার জামার কলার টেনে ধরে তার নাকের উপর একটা রসগোল্লা থেবড়ে দিল। হৈচৈ এর খবর পেয়ে পুলিশের বড় কর্তা এলেন। কিন্তু রসগোল্লার স্বাদে তিনি মোহিত হলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'সিন্নোর শব্দটি কোন দেশীয়?

ক. বাংলাদেশীয় খ. ভারতীয়
গ. ইতালীয় ঘ. স্পেনীয়

২. টিন কেটে ঝাড়ুদা কি বের করলেন?

ক. রসগোল্লা খ. চমচম

গ. জিলিপি ঘ. রসমালাই

৩. 'রসের গোলক, এত রস কেন তুমি ধরেছিলে হায়' এখানে রসের গোলক বলতে কি বোঝান হয়েছে?
ক. লাড্ডু ঘ. রসমালাই
গ. চমচম ঘ. রসগোল্লা

৪. ঝান্ডুদা চুঙ্গিওয়াকে রসগোল্লা না খাওয়াতে পেরে কি করলেন?
ক. রসগোল্লা নাকে থেবড়ে দিলেন খ. জোর করে খাওয়ালেন
গ. টাকে রসগোল্লা থেবড়ে দিলেন ঘ. রসগোল্লার টিন ছুঁড়ে মারলেন

৫. 'টিন খুললে আর এই সরেস মাল চেখে দেখলে না'? কাকে বলা হয়েছে?
ক. পুলিশকে খ. চুঙ্গিওলাকে
গ. বরকন্দাজকে ঘ. ঝান্ডুদাকে

খ. এক কথায় উত্তর দিন

১. ঝান্ডুদা টিন কেটে রসগোল্লা বের করলেন।
২. ঝান্ডুদা শুধু বাঙালিদের মধ্যে রসগোল্লা বিতরণ করলেন?
৩. চুঙ্গিওলা রসগোল্লা দেখে ঝটপট খেতে লাগলেন।
৪. বড় কর্তাকে দেখে ঝান্ডুদা বললেন- 'সিন্নোর বিফো ইউপ্রসীড ...।'
৫. রসগোল্লা সেদিন ইতালির ভেনিস বন্দরকে জয় করেছিল।
৬. টিন খুললে আর এই সরেস মাল চেখে দেখলে না? বলেছিলেন ঝান্ডুদা।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. গ. ইতালীয় ২. ক. রসগোল্লা ৩. ঘ. রসগোল্লা ৪. ক. রসগোল্লা নাকে থেবড়ে দিলেন
৫. খ. চুঙ্গিওলাকে.

খ. ১. স ২. মি ৩. মি ৪. স ৫. স ৬. মি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'রসগোল্লা' রচনাটির কৌতুককর ঘটনাটির বর্ণনা দিন।
২. ঝান্ডুদার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো নিজের ভাষায় লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ঝান্ডুদা কে? তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিন।
২. 'চুঙ্গিওলা' লোকটি দেখতে কেমন?
৩. বড়কর্তা চুঙ্গিঘরে প্রবেশ করে কি করলেন?
৪. 'ওটা মুছিস নি' - কে কাকে কেন বলেছিল?

গ. ব্যাখ্যা

১. অগা চুঙ্গিওলাও বুঝতে পারত এগুলোর মালিক বাস্তভিটার তোয়াক্কা করে না - তার জীবন কাটে হোটেলে হোটেলে।
২. তামাম চুঙ্গিঘর তখন রসেগোল্লা গিলছে। আকাশে বাতাসে রসগোল্লা।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : 'রসগোল্লা' রচনাটির কৌতুককর ঘটনাটির বর্ণনা দিন।

উত্তর : সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত 'রসগোল্লা' নামক রম্যরচনাটিতে একটি চমৎকার কৌতুককর ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনার প্রধান চরিত্র ঝান্ডুদা। ঝান্ডুদা ব্যস্ত মানুষ। ব্যবসায়ের কাজে তাকে নানান দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়। আজ ইউরোপ তো কাল আমেরিকা - এমনি তার অবস্থা। তিনি নেমেছেন ইতালির ভেনিস বন্দরে। চুঙ্গিঘরের যাবতীয় কাজ শেষ হল। বাকি শুধু একটি টিন। ঝান্ডুদা চুঙ্গিওলাকে বোঝাতে চাইলেন - এ টিনে আছে মিষ্টান্ন। খুললে এটা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু বদখত চেহারার চুঙ্গিওলা ছাড়তে নারাজ। টিন খুলতেই হবে। শেষে ঝান্ডুদা টিন খুলতে রাজি হলেন। তবে চুঙ্গিওলা এ

মিষ্টি চেখে দেখতে হবে। ঝাড়ুদা খুলে সকলকে রসগোল্লা খেতে দিলেন। কেউ বাদ গেল না। বাংলাদেশের রসগোল্লা জয় করে নিল সকল দেশের মানুষের মন। এবার পালা চুঙ্গিওলা। সেই জোর করে টিন কাটিয়েছে। ঝাড়ুদা তার বিশাল ভুঁড়ি কাউন্টারে ঠেকিয়ে চুঙ্গিওলাকে রসগোল্লা চেখে দেখতে বললেন। কিন্তু সে গম্ভীরভাবে একটু পিছিয়ে গেল - কোন উৎসাহ দেখাল না। তখন ঝাড়ুদা ঝট করে তার শার্টের কলার ধরে ফেললেন ও তার নাকে একটা রসগোল্লা থেবড়ে দিলেন। চুঙ্গিঘরে তখন দারুন হৈচৈ। চুঙ্গিওলা তখন পুলিশ ডাকছে। কিন্তু কে কার কথা শুনে। সবাই বুঁদ হয়ে তখন রসগোল্লা গিলছে।

অবশ্য পুলিশের বড়কর্তা এক সময় এলেন। ঝাড়ুদা তাকেও রসগোল্লা খাইয়ে মোহিত করে ফেললেন। ফলে ঝাড়ুদার কিছুই হল না। উল্টো চুঙ্গিওলাকে বড়কর্তার উপদেশ শুনতে হল - তুমি তো একটা আস্ত গাড়ল। টিন খুললে আর এই সরেস মাল চেখে দেখলে না?

চুঙ্গিওলার বেআদবি আর তার ফলে নাকানিচুবানি খাওয়া - এটাই রসগোল্লা রচনার কৌতুককর ঘটনা। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে রসগোল্লা তার বিশ্ব বিজয় সম্পন্ন করেছে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : ঝাড়ুদা কে? তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিন।

উত্তর : লেখকের কথামতো ঝাড়ুদা তার বন্ধু। তবে ঝাড়ুদার বয়স হয়ত একটু বেশি তাই দাদা সম্বোধন। ঝাড়ুদা ব্যবসায়ী লোক। কোথাও স্থির নন- ঘরবাড়ির ঠিক-ঠিকানাও নেই। ইউরোপ-আমেরিকা তিনি চষে বেড়ান। পৃথিবীর সকল বড় বন্দরে তার ওঠা-নামা। কোথাও দেখা হয়ে গেলে চট করে বোঝা যায় না যে তিনি আসছেন না যাচ্ছেন। পরোক্ষ বর্ণনায় আমরা বুঝতে পারি ঝাড়ুদা বিরাঁ ভুঁড়ির অধিকারী দশাসই চেহারার মানুষ। কিন্তু ভদ্রও বটে। কারণ ভদ্রতার সঙ্গে চুঙ্গিওলাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন টিন কাঁটার দরকার নেই। এমনকি ওটি ডাকেও পাঠিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু চুঙ্গিওলার নিরুত্তাপ ও অন্যায় ব্যবহারের জন্যই ঝাড়ুদা তার নাকে রসগোল্লা থেবড়ে দিয়েছিলেন। স্বল্প পরিসরে বৈশিষ্ট্যসহ ঝাড়ুদাকে আমাদের চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

প্রশ্ন : 'ওটা মুছিস নি' - কে, কাকে কখন বলেছিল?

উত্তর : 'ওটা মুছিস নি' কথাঁটা ঝাড়ুদার। তিনি বলেছিলেন ভেনিস বন্দরের সেই বদখত চেহারার চুঙ্গিওলাকে।

ঝাড়ুদার নিষ্ফল আবেদন ও পরে টিনটি ডাকে পাঠিয়ে দেওয়ার আইন সঙ্গত প্রস্তাবটি চুঙ্গিওলা নাকচ করে দেয়। চুঙ্গিওলা ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিল টিনটি কাঁটার। ঝাড়ুদা মহা বিরক্তির সঙ্গে টিনটি কাটেন। কিন্তু মনটা দারুন বিষিয়ে যায়। টিনটা কেটে ঝাড়ুদা সকলকে মিষ্টি বিতরণ করেন। তারপর একটা রসগোল্লা হাতে করে চুঙ্গিওলাকে খেতে বলেন। চুঙ্গিওলা ঘাড় পিছিয়ে নেয়, তখন ঝাড়ুদা ভুঁড়িটাকে কাউন্টারে চেপে ধরে প্রথম এক হাতে লোকটির অন্যহাতে রসগোল্লা চুঙ্গিওলার নাকে থেবড়ে দেয়। চুঙ্গিওলা পুলিশ ডাকে। কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দেয় না। ঝাড়ুদাকে কাউন্টার থেকে কোনক্রমে নামান হল। ওদিকে চুঙ্গিওলা রুমাল দিয়ে নাকের উপর থেবড়ানো রসগোল্লা মুছতে যায়। তখন ঝাড়ুদা চেঁচিয়ে বলেন - ওটা মুছিস নি, আদালতে সাক্ষী দেবে।' উক্তিটি বিদ্রূপাত্মক। এতে ঝাড়ুদার সাহস ও ব্যঙ্গ করার দৃষ্টি ফুটে উঠেছে।

ব্যাখ্যা উত্তর

১. অগা চুঙ্গিওলাও বুঝতে পারত এগুলোর মালিক বাস্তুভিটার তোয়াক্কা করে না - তার জীবন কাটে হোটেলে হোটেলে।

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত 'রসগোল্লা' নামক রচনা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে ঝাড়ুদার পরিচিতির কথা বলা হয়েছে। ঝাড়ুদা ব্যবসায়ী লোক। ব্যবসার খাতিরে তামাম দুনিয়া তিনি চষে বেড়ান। আজ এখানে তো কাল সেখানে। পৃথিবীর বড় বড় শহর-বন্দরে তার নিত্য আনাগোনা। তাই হোটেলে হোটেলেই তার জীবন কাটে। মানুষ সাধারণত বাস্তুভিটার প্রতি আগ্রহী সেখানেই ফিরতে চায়। কিন্তু ঝাড়ুদা অন্য রকম মানুষ। হোটেলই তার প্রকৃত ঠিকানা।

ঝাড়ুদার সুটকেসে এদেশের নগর বন্দরের লেবেল লাগান থাকে যে তা দেখেই চুঙ্গিওলা বুঝতে পারে এলোক ঘরের নয় - বাইরের। ঝাড়ুদা যে বাস্তুভিটা প্রেমিক নন, বরং ঘোর ভ্রমণ বিলাসী - একথাটিই উক্তিটিতে ফুটে উঠেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

পারী

অন্নদাশঙ্কর রায়

লেখক পরিচিতি

অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯০৪ সালের ১৫ মার্চ ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের ঢেঙ্কানাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঁনা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। ১৯২৬ সালে প্রতিযোগিতামূলক ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম হন ও সরকারি শাসন বিভাগে উচ্চপদে যোগদান করেন। অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন।

অন্নদাশঙ্কর রায় কথাশিল্পী। তিনি বেশ কিছু উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে- আগুন নিয়ে খেলা, পুতুল নিয়ে খেলা, অসমাপিকা, সত্যাসত্য ইত্যাদি উপন্যাস ও পথে প্রবাসে, জাপানে ইত্যাদি ভ্রমণ কাহিনী।

অন্নদাশঙ্কর রায় কিছু কবিতাও লিখেছেন। তাছাড়া তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ ছড়াকার। ২০০২ সালের ২৯ অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ পরিচিতি

'পারী' একটি ভ্রমণ কাহিনী। এটি অন্নদাশঙ্কর রায় রচিত 'পথে প্রবাসে' নামক গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত।

আধুনিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র পারী। এই পারীর শিল্প সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে রূপসী পারীর সুগন্ধি শিল্প, রাজপথসহ বহুবিধ বিষয়ে লেখক আকর্ষণীয় বর্ণনা করেছেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- পারীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- পারীর প্রকৃত সৌন্দর্য সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ফরাসিদের পারী নগরীর নামে পৃথিবীসুদ্ধ লোক মায়াপুরীর স্বপ্ন দেখে। আরব্য রজনীর বাগদাদ আর কথাসাহিত্যের পারী উভয়ের সম্বন্ধে বলা চলে, 'অর্ধেক নগরী তুমি অর্ধেক কল্পনা'। পৃথিবীর ইতিহাসে পারীর তুলনা নেই। দুই হাজার বৎসর তার বয়স তবু চুল তার পাকল না। কতবার তাকে কেন্দ্র করে দিগ্বিজয়ী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল, কতবার তার পথে পথে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার রক্তগঙ্গা ছুটল, কত ত্যাগী ও কত ভোগী, কত জ্ঞানী ও কত কর্মী, কত রসজ্ঞ, কত দুঃসাহি বিপ্লবে ও সৃষ্টিতে, স্বাধীনতায় ও প্রেমে তাকে অমর মানবের অমরাবতী করলেন। সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, ন্যাঁকলায়, সুগন্ধিশিল্পে, পরিচ্ছদকলায়, স্থাপত্য ও বাস্তুকলায় সে সভ্যজগতের শীর্ষে উঠল। পারীই তো আধুনিক সভ্যতার সত্যিকারের রাজধানী, অগ্রসরদের তপস্যাস্থল, অনুসারকদের তীর্থ। এর একটি দ্বার প্রতি দেশের কাঞ্চনবানদের জন্য খোলা, অন্য দ্বারটি প্রতিদেশের নিঃসম্বল শিল্পী, ভাবুক বিদ্যার্থীদের জন্য মুক্ত। একদিক থেকে দেখতে পারী রূপপোজীবিনী, অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে পারী অন্নপূর্ণা, সর্বদেশের পলাতকদের আশ্রয়দাত্রী, তার জাতিবিদ্বেষ নেই, সে পোল, রুশ, রুমানিয়াকেও শ্রমের বিনিময়ে অন্ন দেয়, নিগ্রোকেও শ্বেতসেনার নায়ক করে এবং নানা দেশের যে অসংখ্য বিদ্যার্থীতে তার প্রাঙ্গণ ভরে গেছে তাদের কত বিদ্যার্থীকে সে বিদ্যার সঙ্গে জীবিকাও যোগায়।

পৃথিবীর অন্য কোনো নগর দেখতে পৃথিবীর এত দেশের এত ট্যুরিস্ট আসে না। পারী দেখতে প্রতি বৎসর যে কয় লক্ষ বিদেশি আসে, তাদের পনেরো আনা আমেরিকান ও ইংরেজ। আমেরিকানদের চোখে পারীই হচ্ছে ইউরোপের রাজধানী, আর ইউরোপের চোখে পারী হচ্ছে লন্ডন, ভিয়েনা, বার্লিন, মস্কোর চেয়েও আন্তর্জাতিক। আয়তন ও লোকসংখ্যায় পারী লন্ডনের প্রায় অর্ধেক।

পারীতে ট্রাম মেট্রো বাস ট্যাক্সি ধোঁয়া কাদা বস্তি ব্যারাক লন্ডনের মতো সমস্তই আছে, কিন্তু মোঁরগাড়ি কিছু বেশি সংখ্যক, বাড়িগুলো কিছু স্বাধীন গড়নের, কাদাঁটা কিছু গভীর ও গাঢ়। মোটের ওপর পারী লন্ডনের মতো ফিটফাঁ নয়, বেশ একটু নোংরা এবং অনেক বেশি গরিব। উঁচুদরের বাস্তুকলা আর কয়েকটি প্রাসাদসৌধ থাকলেও লন্ডনের সৌষ্ঠব তার অধিকাংশ বাড়ির নেই। ঐতিহাসিক প্রাদাসসৌধের ছবি দেখে পারীকে যা ভাবি সর্বসাধারণের বাসগৃহ দেখলে সে কল্পনা ছুটে যায়। কিন্তু পারীর আসল সৌন্দর্য তার প্রশস্ত সরল রাজপথগুলো, তার বৃহৎ চতুষ্কোণ প্লাসাগুলো, তার সপ্তসেতুবেষ্টিত সর্পিণী নদীটি, সর্পিণীর দুই রসনার মতো যেন সিন নদীর দুটি অর্ধেক মধ্যবর্তী দ্বীপটি এবং নগরীর দুই উপান্তে প্রমোদোদ্যান দুটি। পারীতে লন্ডনের মতো পার্ক বিরল; তবে তার একটি রাজপথ এক একটি সরলরেখাকৃতি পার্ক বিশেষ।

পারীর নিতান্ত মাঝারি রাজপথগুলো সেন্ট্রাল এভিনিউর চেয়ে চওড়া। সাঁজেলিসীর একপাশ থেকে আর এক পাশ দেখা যায় না, পাশাপাশি দশটা চৌরঙ্গীর মতো। সে তো একটি রাজপথ নয়, এক সঙ্গে অনেকগুলো রাজপথ, রাজপথের মাঝখানে এক সারি বাগান, রাজপথের ওপরে এক একটা দোকান বা প্রাসাদ বা থিয়েটার। এক একটা বুলভার্দ এক একটা বিরাঁ ব্যাপার, যেমন দীর্ঘ তেমন প্রস্থ। অধিকাংশ রাস্তার সম্বন্ধে একথা খাটে যে, একটা রাস্তা মানে একটি রাস্তা নয়, সমান্তরাল দুটি-তিনটি রাস্তা কোনো কোনো স্থানে পাঁচটি রাস্তা। অর্থাৎ প্রতি রাস্তার অনেকগুলো করে ভাগ আছে, যেমন ইন্দ্রধনুর সাতটি ভাগ। প্রথম ফুটপাতের পর রাস্তা, রাস্তার পরে গাছের সারি, গাছের সারির পরে ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, সে রাস্তার পরে গাছের সারি ও বসবার বেঞ্চ, তারপরে আবার ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, তারপর আবার গাছের পার্টিশন, তারপরে আবার রাস্তা, তারপরে আবার ফুটপাত। সব রাস্তার অবশ্য একই রকম ভাগ নয়, তবে অধিকাংশ রাস্তাই অসাধারণ চওড়া আর অনেক রাস্তার ফুটপাতের ওপরে স্থলে স্থলে ছোঁ ছোঁ দোকান আছে। এক একটা ফুটপাত রাস্তার মতো চওড়া, স্থলে স্থলে এসব দ্বীপের মতো দোকান, অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের খেলনার বা মেয়েদের এটা-ওটার দোকান। ঠিক আমাদের দেশের মতো সেসব দোকানে ভিড় জমেছে, দরদস্তুর চলেছে, হইচই হট্টগোল।

শব্দার্থ

পারী — প্যারিস, ফ্রান্সের রাজধানী। **রসজ্ঞ** — রসবোধ আছে যার।

কাহিনী সংক্ষেপ

পারীর তুলনা ইতিহাসে মেলা ভার। কতবার এ নগরীকে কেন্দ্র করে শাসকের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করল, কতবার এখানে ধ্বনিত হল সাম্য ও মৈত্রীর বাণী। সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও নানান শিল্পকলায় পারীর স্থান সবার উপরে। পারী যেমন ধনী ও রূপপোজীবিনীদের শহর তেমনি এ শহর বিদ্যার্থী, নিঃসম্বল শিল্পী ও ভাবুকদের।

পারীর আসল সৌন্দর্য তার প্রশস্ত-সরল রাজপথগুলো এবং প্লাসাগুলো। এখানে রাস্তাগুলোর অনেক ভাগ আছে। প্রথমে ফুটপাতের পরে রাস্তা রাস্তার পরে গাছের সারি, গাছের সারির পরে ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, সে রাস্তার পরে গাছের সারি ও বসবার বেঞ্চ তারপর আবার ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, তারপর গাছগাছালি, তারপর আবার রাস্তা, তারপর গাছগাছালি, তারপর আবার রাস্তা, তারপর আবার ফুটপাত। তবে সব রাস্তাই একই রকম নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'পারী' রচনাটি কোন শ্রেণীর?
   ক. ভ্রমণকাহিনী　　খ. ছোঁগল্প
   গ. প্রবন্ধ　　ঘ. নিবন্ধ

২. 'পারী' রচনাটির লেখক কে?
   ক. মোহিতলাল মজুমদার　　খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
   গ. অন্নদাশঙ্কর রায়　　ঘ. সুনীল চট্টোপাধ্যায়

৩. 'অর্ধেক নগরী তুমি অর্ধেক কল্পনা' কোন নগর সম্পর্কে বলা হয়েছে?
   ক. নিউইয়র্ক　　খ. লন্ডন
   গ. ভিয়েনা　　ঘ. পারী

৪. পারীর একটি দ্বার 'কাঞ্চনবানদের' জন্য খোলা, অন্যটি কাদের জন্য খোলা?
ক. গরিবদের জন্য খ. ছাত্রদের
গ. শিল্পী ভাবুক ও বিদ্যার্থীদের জন্য ঘ. নিঃসম্বল শিল্পীদের জন্য

৫. পারীর রাস্তাকে লেখক কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?
ক. উন্মুক্ত মাঠ খ. সরল রেখাকৃতি পার্ক
গ. বক্রাকৃতি জলরেখা ঘ. বনানী

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. ক. ভ্রমণকাহিনী ২. গ. অন্নদাশঙ্কর রায় ৩. ঘ. পারী ৪. গ. শিল্পী ভাবুক ও বিদ্যার্থীদের জন্য ৫. খ. সরল রেখাকৃতি পার্ক।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- ফরাসিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
- ফ্রান্সের কাফে ও পাতিসেরির পরিচিতি লিখতে পারবেন।
- ফরাসিদের মিউজিয়াম প্রীতির বিবরণ দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমাদের সঙ্গে ফরাসি, ইতালিয়ান প্রভৃতি দক্ষিণ ইউরোপীয়দের প্রকৃতিগত মিল আছে। এরাও খুব গোলমাল ভালবাসে, অতিরিক্ত রকম বাচাল, আর বাদশাহী কুড়ে। কুঁড়ে বললে বোধ হয় ঠিক হবে না, বরং বিশ্রামপ্রিয়। সময়ের দাম এরা ইংরেজ আমেরিকানদের মতো বোঝে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেয়। তা বলে এরা কম খাটে না। পারীর যারা আসল অধিবাসী, খুব খাঁতে পারে বলে তাদের সুনাম আছে। মেয়েরা গল্প করার সময়ও জামা সেলাই করছে, সৌখিন জামা। জামা-কাপড়ের শখটা ফরাসিদের অসম্ভব রকম বেশি, বিশেষ করে ফরাসি মেয়েদের ও শিশুদের। পুরুষেরা কতকটা বেপরোয়া। তাদের প্রধান সম্পদ জাঁদরেলি গোঁফ, তাদের সেই ব্রহ্মাস্ত্রটিতে শান দেবার দিকে তাদের যত নজর, তত নজর তাদের স্নান- নাকরা গাত্রের দিকে নেই। সুগন্ধিশিল্প পারীকে আশ্রয় করবার কারণ হয়ত এই। হ্যাঁ, পারীর লোক খুব খাঁতে পারে বটে, খুব ভোরে উঠে খাঁতে আরম্ভ করে দেয়, অনেক রাত অবধি খাটে। আহার সম্বন্ধে এদের মোগলাই রুচি, গোপালের মতো যা পায় তা খায় না, রন্ধনশিল্প ইউরোপের কোথাও থাকে যদি, তা পারীতে। এত দুনিয়ার সব দেশের খানার এরা সমঝদার সেই জন্য যে কোনো রেস্তোরাঁয় সব নেশনের খাদ্যের একটা না একটা নমুনা পাওয়া যাবেই। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, পারীতে অল্প খরচে অনেকখানি তৃপ্তির সহিত খেতে পারা যায়। রান্নাটা উচুদরের তো বটেই, রান্নাটা টাঁকা। শাকসবজি ও মাংসের জন্য ইংল্যান্ড অন্য দেশের মুখাপেক্ষী, ফ্রান্স তেমন নয়।

পারীতে গলিতে গলিতে একটা নয় দুটা নয় পঞ্চাশটা কাফে। লন্ডনে কাফে নেই, কাফে নামধেয় যা আছে আসলে তা রেস্তোরাঁ। লন্ডনের রেস্তোরাঁর সংখ্যা পারীর তুলনায় আঙুলে গোনা যায়।

এই কাফে জিনিসটি ফরাসি সভ্যতার একটা অঙ্গ। ফ্রান্সের আধুনিক ইতিহাস তার কাফেগুলোতে তৈরি হয়েছে, ইংল্যান্ডের ইতিহাস যেমন তৈরি হয়েছে তার স্কুলগুলোর প্লে গ্রাউন্ডে। এটা একটা মস্ত জিনিস যে কাফে ভয়ানক সস্তা। দুচার আনা খরচ করে দুঘণ্টা এক স্থানে বসা ও প্রাণ খুলে গল্প করা যায়, লন্ডনে এমন সুযোগ নেই। আমাদের দেশে চায়ের দোকানগুলোতে তর্কসভা বসে-সেইগুলোই আমাদের ভাবি যুগের কাফে। তাই থেকে আমাদের ভাবিসাহিত্যিকদের উদ্ভব হবে, ভাবিরাষ্ট্রনেতাদের অভ্যুত্থান ঘটবে। ব্যয়সাধ্য ক্লাব যে আমাদের মাটিতে শিকড় গেড়ে আমাদের বট অশ্বত্থের মতো দীর্ঘজীবী হবে এমন মনে হয় না। ঐ চায়ের আড্ডাগুলোর সঙ্গে একটা করে পাঠাগার জুড়ে দিলে ঐগুলোই হবে জনসাধারণের বিশ্রাম, আমোদ ও শিক্ষার স্থান।

কাফের মতো পাতিসেরিগুলোতেও আড্ডা বসে। পাতিসেরি মানে কেক রুটির দোকান, ওখানে গিয়ে কেক কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে পারা যায়। অনেক পাতিসেরিতে চা-কফি খাবার জন্য একটু টাটাই করে দেওয়া হয়, সেই সুযোগে গল্প জমে, তর্ক ওঠে, আলাপ-পরিচয় হয়, দেশের মানুষেরা দেশের মানুষকে চিনতে চিনতে দেশকে চেনে, বিদেশের মানুষকে চিনতে

চিনতে বিদেশকে চেনে। ফরাসিরা ইংরেজদের মতো নীরব প্রকৃতির নয়, গম্ভীর প্রকৃতির নয়, ওরা ভদ্রতার খাতিরে আবহাওয়া সম্বন্ধে দু একটা তুচ্ছ প্রশ্ন করে চুপ করে না, ওরা বকে আর বকায়।

ফরাসিদের জাতীয় সম্পদ তাদের মিউজিয়ামগুলো। জগৎ প্রসিদ্ধ লুভর ছাড়া লুকশাবুর্গ ত্রোকাদেরো, গীমে ইত্যাদি আরও ডজনখানেক ছোঁ বড় মিউজিয়াম আছে পারীতে। লুভরের ঐশ্বর্যের তুলনাই হয় না। তার আকার এত বড় যে, একটা জাদুঘর নয় একটা জাদুপাড়া, সমস্তটি একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে দু দিন লেগে যায়। Venus de Milo-কে একটা স্বতন্ত্র ঘর দেওয়া হয়েছে, সে ঘরে তার বন্ধুদের জন্য চমৎকার বসবার বন্দোবস্ত রয়েছে, সে সব আসনে বসে যে কোনো কোণ থেকে তাকে নিরীক্ষণ করতে পারা যায়। বলা বাহুল্য, যেদিক থেকেই দেখি না কেন সবদিক থেকেই সে সমান সুদর্শনা। তাজমহলকে যেমন বার বার নানা আলোকে দেখেও চির অপূর্ব মনে হয়, গ্রিক ভাস্করের এই মানসী মূর্তিটিকেও তেমনি।

লুভর মিউজিয়ামে 'মোনালিসা' (লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চিকৃত) - কেও দেখলাম। তার সেই রহস্যময় হাসি মানুষের পিছু নেয়, তাকে ভোলবার সাধ্য নেই, ইচ্ছা করলেও চেষ্টা করলেও ভুলতে পারি নে। লুভরে কিছু না হোক লাখখানেক ছবি আছেই, পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের আঁকা।

ফরাসিরা এসব ছবি-মূর্তি নানা উপায়ে সংগ্রহ করেছে, সব উপায় সাধুও নয়। এদের অনেকগুলো যুদ্ধলব্ধ। রাজ্য জয় করে অনেক বিজেতা অনেক রত্নই হরণ করে, কিন্তু ফরাসিরা হরণ করেছে শিল্পসম্ভার। ফরাসিদের হারিয়ে দিয়ে বিসমার্ক অনেক কোটি স্বর্ণমুদ্রা আদায় করেছিলেন, সে সোনা এতদিনে ধুলো হয়ে গেছে। কোন জাতি কোন জিনিসকে বেশি দাম দেয় তাই নিয়েই তার ইতিহাস।

ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ দেখে যা মনে হয়েছিল, ফ্রান্সের লুভর, ত্রোকাদেরো প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ দেখে তাই মনে হল। ভাবলুম, ইংল্যান্ড-ফ্রান্সে জন্ম নিলে আত্মিক সুবিধা আছে, বাল্যকাল থেকেই মিউজিয়াম দেখতে দেখতে মানুষ হব। চোখ পাকবে কিন্তু মন পাকবে না, প্রতিদিন একটু একটু করে বড় হব, কিন্তু বুড়ো হব না। আমার প্রাচীন দেশের পরিপক্ক শিক্ষাকে আমার চিরতরুণ অন্তরে ধারণ করব এবং প্রতি দেশের নিজস্ব শিক্ষাকে আমার নিজস্ব শিক্ষার মধ্যে গ্রহণ করব।

ফরাসি জাতিটা হচ্ছে যাকে বলে কসমোপলিটান। এর মানে এ নয় যে বিশ্বপ্রেমিক, এর মানে ওরা বিশ্বচেতন। প্রমাণ ওদের পথঘাটের নামগুলো। পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাস ও সব দেশের ভূগোল পড়বার যাদের সময় নেই তাঁরা কেবল পারীর মানচিত্রখানার উপরে চোখ বুলিয়ে যান, দেখবেন রাস্তার নাম Moscou, Tokio, Constantinople ইত্যাদি। রেলস্টেশনের নাম George V,St. Francis Xavier, Michel-Angelo ইত্যাদি ও President Wilson Edward VII, Garibaldi ইত্যাদি। এছাড়া স্বদেশের মহাপুরুষ মাত্রেরই ও স্বদেশের প্রতি অংশের নাম পারীর সর্বাঙ্গে ছাপা। ফ্রান্সের লোকদের দেশাত্মজ্ঞান অমনি করেই হয় বলেই তাদের দেশাত্ববোধ আপনা আপনিই জন্মায়। শৈশব থেকেই তারা পথ চলতে চেনে তাদের জাতীয় পূর্বপুরুষদের নিয়ে, যাদের নিয়ে তাদের ইতিহাস লেখা হয়েছে। আর দেশের প্রতি জেলার প্রতি পর্বতের নাম- যাঁদের কোলে তাদের অখণ্ড জাতি লালিত হয়েছে। স্বদেশকে চেনে বলেই তারা বিশ্বকেও চিনতে পারে।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

কুঁড়ে – অলস, **বিশ্রামপ্রিয়** – যারা বিশ্রাম করতে ভালবাসে, **মোগলাই রুচি** – মোগলকের মতো রুচি, **ব্রহ্মাস্ত্র** – অব্যর্থ অস্ত্র, **প্লে-গ্রাউন্ড** – খেলার মাঠ, **যুদ্ধলব্ধ** – যুদ্ধ করে পাওয়া।

কাহিনী সংক্ষেপ

ফরাসিরা কিছুটা বাচাল ও বিশ্রামপ্রিয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে এরা ভালবাসে। তবে তারা যে কাজ করে না তা নয়। প্রচুর খাঁতেও পারে তারা। মেয়েরা যখন গল্প করছে - তখনও কিছু করছে - পোশাক সেলাই করছে। মেয়ে আর শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদের শখটা বেশি। পুরুষদের বেশিরভাগ সময় চলে যায় জাঁদরেলি গোঁফের পরিচর্যাতেই। রন্ধনশিল্পেও ফরাসিদের আলাদা রুচিবোধ আছে।

কাফে আর পাতিসেরি ফরাসিদের নিজেদের জিনিস। কাফে ফরাসি সভ্যতার একটি অঙ্গ। পাতিসেরিতেও আড্ডা বসে। ফরাসিদের জাতীয় সম্পদ তাদের মিউজিয়ামগুলো। অনেক যত্নে অনেক কষ্টে ফরাসিরা তাদের এই মিউজিয়ামগুলো গড়ে তুলেছে।

ফরাসি জাতটা আসলে আন্তর্জাতিক। এর রাস্তায় চললে শুধু দেশের নয় বিদেশেরও বহু মনিষী ও জ্ঞানীগুণীদের নাম নজরে পড়ে। স্বদেশকে তারা চেনে বলে বিশ্বকেও সহজে চিনতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'এরাও খুব গোলমাল ভালবাসে, অতিরিক্ত রকম বাচাল, আর বাদশাহী কুঁড়ে' - লেখক কাদের সম্পর্কে বলেছেন?
   ক. ইউরোপীয়দের খ. ফরাসিদের
   গ. ইংরেজদের ঘ. আমেরিকানদের

২. ফরাস পুরুষদের প্রধান সম্পদ কি বলে লেখক জানিয়েছেন?
   ক. ধোপদুরস্ত পোশাক খ. শোলার হ্যাঁ
   গ. লম্বা চুল ও দাড়ি ঘ. গোঁফ

৩. লেখক ফরাসি সভ্যতার অঙ্গ বলেছেন কোনটিকে?
   ক. কাফে খ. পাতিসেরি
   গ. রেস্তোরা ঘ. হোটেল

৪. পাতিসেরি কি?
   ক. আড্ডা দেবার স্থান খ. নিখরচায় খাবার দোকান
   গ. কেক-রুটির দোকান ঘ. চা-এর দোকান

৫. মোনালিসার শিল্পী কে?
   ক. জয়নুল আবেদীন খ. লিওনার্দো দা ভিঞ্চি
   গ. কামরুল ইসলাম ঘ. এস এম সুলতান

৬. ফরাসিদের যুদ্ধে হারিয়ে বিসমার্ক কি আদায় করেছিল?
   ক. অনেক কোটি স্বর্ণমুদ্রা খ. দেশের কিছু অঞ্চল
   গ. একটি দ্বীপ ঘ. ফ্রান্সের অর্ধাংশ

৭. স্বদেশকে চেনে বলে ফরাসিরা সহজে কাকে চিনতে পারে?
   ক. বিশ্বের মানুষকে খ. প্রতিবেশি দেশকে
   গ. ইউরোপকে ঘ. বিশ্বকে

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. খ. ফরাসিদের ২. ঘ. গোঁফ ৩. ক. কাফে ৪. গ. কেক-রুটির দোকান
৫. খ. লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি ৬. ক. অনেক কোটি স্বর্ণমুদ্রা ৭. ঘ. বিশ্বকে

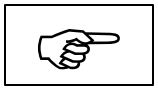

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পৃথিবীর ইতিহাসে পারীর তুলনা নেই - লেখক কেন একথা বলেছেন?
২. 'পারী' রচনা অবলম্বনে ফরাসিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।
৩. ফরাসীদের জাতীয় সম্পদ মিউজিয়ামগুলোর পরিচিতি দিন।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পারীর রাস্তাগুলো কেমন? বর্ণনা দিন।
২. "... কাফে জিনিসটি ফরাসি সভ্যতার একটি অঙ্গ"। কেন একথা বলা হয়েছে?
৩. লুভর মিউজিয়ামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৪. টীকা লিখুন - ভেনাস দ্যা মিলো, মোনালিসা।

গ. ব্যাখ্যা করুন

১. "অর্ধেক নগরী তুমি অর্ধেক কল্পনা"।
২. স্বদেশকে চেনে বলেই তারা বিশ্বকে চিনতে পারে।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : পৃথিবীর ইতিহাসে পারীর তুলনা নেই" - লেখক কেন এ কথা বলেছেন?

উত্তর : 'পারী' রচনার এক জায়গায় লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে পারীর তুলনা নেই।' এ মন্তেব্যের একটু আগেই লেখক পারী সম্পর্কে আরও বলেছেন, 'অর্ধেক নগরী তুমি অর্ধেক কল্পনা'। রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি লাইন হচ্ছে - অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।' এ লাইনটি অনুসরণ করেই লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় উক্তিটি করেছেন। এ উক্তির অর্থ হচ্ছে পারী শহরের সৌন্দর্য অর্ধেকটুকু চোখে দেখার আর অর্ধেকটুকু উপলব্ধি করার। পারীর সাহিত্য-সৌন্দর্য শিল্প উপলব্ধির, চর্মচক্ষে দেখার নয়। আর এ সৌন্দর্য এত গভীর ও ব্যাপক যে এর তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।

পারীর বয়স হল প্রায় দুহাজার বছর। কিন্তু এ নগরীর বার্ধক্য নেই। এ নগরী চির নতুন ও চির তরুণ। নগরীতে এ সময় দিগ্বিজয়ী শাসক তার পতাকা উত্তোলন করেছে, পারীতেই সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার জন্য কতজন আত্মত্যাগ করল তার হিসেব নেই। দুঃসাসী বিপ্লবে ও সৃষ্টিতে কতবার পারী কেন্দ্র হল। সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্যে, ন্যাঁকলায় সভ্যতার শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছে পারী। পারী আধুনিক সভ্যতার রাজধানী, অগ্রসরদের তপস্যাস্থল, অনুসারকদের তীর্থভূমি। পারীর দ্বার ধনীদের জন্য খোলা। রূপপসারিদের রূপ এখানে কাঞ্চন মূল্যে বিক্রি হয়। কিন্তু অপর দিকে পারীর দ্বারটি নিঃসম্বল গুণীদের জন্য উন্মুক্ত। শিল্পী, ভাবুক, বিদ্যার্থী সবাইকে গ্রহণ করার জন্য পারী উন্মুখ। পারীর জাতিবিদ্বেষ নেই। সকল দেশের সকল জাতের মানুষের সেখানে আমন্ত্রণ। শ্রমের বিনিময়ে পারী অন্ন দেয়।

মানুষের প্রতি ভালবাসার বাণী পারীর মতো আর কোনো শহরে ধ্বনিত হয় না। এ ইতিহাস একেবারেই অন্যরকম। তাই লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন - 'পৃথিবীর ইতিহাসে পারীর তুলনা নেই।' কথাটি যথার্থ।

প্রশ্ন : 'পারী' রচনাটি অবলম্বনে ফরাসিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।

উত্তর : 'পারী' রচনাটি বিখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় রচিত 'পথে প্রবাসে' নামক ভ্রমণ কাহিনী থেকে সঙ্কলিত। 'পারী' ক্ষুদ্রকায় রচনা হলেও ফরাসিদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

ফরাসিদের সঙ্গে আমাদের প্রকৃতিগত মিল আছে। লেখক ফরাসিদের সম্পর্কে বলেছেন -"এরাও খুব গোলমাল ভালবাসে, অতিরিক্ত রকম বাচাল, আর বাদশাহী কুঁড়ে।" এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে ভালবাসে। তাই বলে এরা কম পরিশ্রম করে না। পারীর যারা আসল অধিবাসী তার খুব খাঁতে পারে। দেখা যাবে মেয়েরা গল্প করার সময় কিছু করছে - হয়ত সৌখিন জামা তৈরি করছে। পোশাকের প্রতি এরা সচেতন বিশেষ করে মেয়ে ও শিশুরা। তবে পুরুষদের বেশিরভাগ সময়ই চলে যায় জাদরেল গোফের পরিচর্যা করতে। পারীর লোক কাজ শুরু করে খুব ভোরে - অনেক রাত অবধি খাটে। আহারে এদের রুচি মোগলাই অর্থাৎ উন্নত রুচি।

ফরাসিদের মায়াপুরি পারী। এর নগর পরিকল্পনা, প্রাসাদ, সৌধ, সর্বত্র আছে সুপারিশকল্পনা ও সুরুচির ছাপ। এর প্রশস্ত রাজপথ, চারকোণাকৃতি নগরচত্বর, প্রমোদ-উদ্যান সর্বত্র। সাহিত্য, চিত্রকলা, ন্যাঁকলা, সুগন্ধিশিল্প সবস্থানেই আছে ফরাসিদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সুরুচি ও সৌন্দর্যের বিকাশ। সবকিছু মিলিয়ে ফরাসিরা সৌন্দর্যের পূজারী। সেজন্যই তিল তিল করে পারীকে সৌন্দর্যের তিলোত্তমা করে গড়ে তুলতে পেরেছে।

ফরাসিরা জাত হিসেবে অত্যন্ত ঐতিহ্য প্রিয়ও বটে। যার জন্য তাদের দেশে গড়ে উঠেছে ছোঁবড় নানা মিউজিয়াম। সে মিউজিয়ামগুলোতে যেমন স্বদেশের ঐতিহ্যকে সব দিক মিলিয়ে ফরাসি জাতটা পৃথিবীর এক অনন্য বৈশিষ্ট্যর অধিকারী জাত।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ১ : পারীর রাস্তাগুলো কেমন? বর্ণনা দিন।

উত্তর : অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'পারী' নামক রচনায় পারীর রাস্তার বর্ণনা দিয়েছেন। আত্মসচেতন জাত ফরাসিদের রাস্তা পরিকল্পনাতেও আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

পারীর আসল সৌন্দর্য তার রাস্তায়। পারীর রাজপথগুলি সরলরেখাকৃতি একেকটি পার্ক বিশেষ। রাজপথ একটি নয়- একটি রাজপথ যেন অনেকগুলো রাজপথের সমাহার। রাজপথের মাঝখানে এক সারি বাগান। রাজপথের ওপরে একটি দোকান, বা প্রাসাদ বা থিয়েটার। একটি রাস্তায় অনেকগুলো করে ভাগ। প্রথমে ফুটপাত, তারপরে রাস্তা, রাস্তার পরে গাছের সারি, তারপর ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, যে রাস্তার পরে গাছের সারি ও বসবার বেঞ্চ, তারপর আবার ক্রমিকভাব ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, গাছের সারি, আবার রাস্তা, আবার ফুটপাত। তবে সব রাস্তাই এক রকম নয়। তবে সব রাস্তাই অসাধারণ চওড়া।

প্রশ্ন ২ : "কাফে জিনিসটি ফরাসি সভ্যতার একটি অঙ্গ" - কেন বলা হয়েছে?

উত্তর : প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'পারী' নামক রচনায় ফরাসির কাফে সম্পর্কে এ মন্তব্যটি করেছেন।

কাফে হচ্ছে হাল্কা খাবার ও পানীয়ের দোকান। এখানে বসে আলসেমি করবার, তর্ক করার বিস্তৃত সময় ও স্থান। পারীতে বহু কাফে আছে। এখানে প্রতিদিন পরিচিত, অপরিচিত, দেশি, বিদেশি, লেখক- শিল্পী, ভাবুকের মেলামেশার অবারিত দ্বার। সাধু-সজ্জন ও গুণী ব্যক্তিদের মিলনের ফলেই দেশের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়। যেমন বলা হয় ইংল্যান্ডের ইতিহাস তৈরি হয়েছে খেলার মাঠে তেমনি ফ্রান্সের ইতিহাস তৈরি হয়েছে কাফেতে। পারীতে কাফেগুলো খুব সস্তা-প্রাণখুলে গল্প করার মতো জায়গা। নতুন ভাবনার অঙ্কুর এসব কাফেতেই হয়ে থাকে। তাই লেখক বলেছেন- 'কাফে সভ্যতার একটি অংশ'।

ব্যাখ্যা উত্তর

২. স্বদেশকে চেনে বলেই তারা বিশ্বকেও চিনতে পারে।

উত্তর : উদ্ধৃত বাক্যটি সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় রচিত 'পারী' নামক রচনা থেকে চয়ন বলা হয়েছে। এখানে ফরাসিদের চিন্তা চেতনার কথা বলা হয়েছে।

ফরাসিরা জাত হিসেবে আন্তর্জাতিক। এদেরকে লেখক বলেছেন, 'কসমোপলিটান'। ফরাসিরা অতিমাত্রায় বিশ্বসচেতন। তার অর্থ এ নয় যে তাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও দেশাত্মবোধ নেই। দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলের নাম পারীর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। স্বদেশের মহাপুরুষরাও পারীর সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ফরাসিরা শৈশব থেকেই চেনে জাতীয় পূর্বপুরুষদের যাঁদের কথা তাদের জাতীয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। পারীতে আছে যেমন তাদের জেলার নাম - তেমনি প্রত্যেকটি পর্বতের নাম - যাদের কোলে এ জাতি লালিত হচ্ছে। স্বদেশকে এত ভাল করে জানে ও চেনে বলে বিশ্বকেও তাদের চিনতে দেরি হয় না। স্বদেশের প্রতি ভালবাসা আছে বলেই বিদেশের সবকিছুকে একান্ত করে তারা গ্রহণ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

মহাপতঙ্গ

আবু ইসহাক

লেখক পরিচিতি

আবু ইসহাক ১৯২৬ সালে ১ নভেম্বর শরীয়তপুর জেলার শিরঙ্গল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ ও ১৯৬০ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাস করেন। তিনি বিভিন্ন সরকারি কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। আবু ইসহাক ২০০৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা।

উপন্যাস : সূর্য দীঘল বাড়ী (১৯৫৫)

গল্পগ্রন্থ : হারেম (১৯৬৩), মহাপতঙ্গ (১৯৬৩)

আবু ইসহাক ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন।

পাঠ পরিচিতি

'মহাপতঙ্গ' গল্পটি লেখক আবু ইসহাকের 'মহাপতঙ্গ' নামক গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

'মহাপতঙ্গ' একটি রূপক গল্প। এখানে ফড়িং এর মতো যে মহাপতঙ্গের কথা বলা হয়েছে তা আসলে উড়োজাহাজ বা বিমান। মানব সভ্যতার অনেক উপকরণেরই ভূমিকা দ্বিমুখী, কখনও কল্যাণের কখনও অকল্যাণকর। বন্যা থেকে বিপদগ্রস্ত মানুষকে যে মহাপতঙ্গ বাঁচিয়েছিল, সে পতঙ্গই যুদ্ধের সময় এলো মারণাস্ত্র নিয়ে– এটিই এ গল্পের মূল বিষয়।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- চড়ুই পাখির জীবনের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মহাপতঙ্গের পরিচিতি লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ছোঁ এক শহরের ছোঁ এক বাড়ি। সেই বাড়ির উত্তর দিকের দেয়ালের ফোকরে থাকত একজোড়া চড়ুই পাখি। একদিন কুড়িয়ে খেতে মাঠে গিয়েছিল ওরা। হঠাৎ কেমন অদ্ভুত শব্দ শুনে ওরা সচকিত হয়ে ওঠে। মাথা তুলে একে অন্যের দিকে তাকায়।

দূর থেকে বোঁ-বোঁ শব্দ ভেসে আসছে।

চড়ুই দুটো ভয় পায়। ফুড়ুৎ করে ওরা গাছের ডালে গিয়ে বসে। শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। চারদিকের পাখ-পাখালি ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। চড়ুই পাখি দুটো পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে। দূরদিগন্ত থেকে প্রকাণ্ড একটা কি এদিকেই উড়ে আসছে। ভয়ে ওরা ঘন পাতার ভেতর লুকিয়ে পড়ে। ভয়ঙ্কর বোঁ-বোঁ আওয়াজ করতে করতে ওদের মাথার ওপর দিয়েই ওটা চলে যায়।

বুক দুরু দুরু করে দুটোরই। কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চড়ুই ওর সঙ্গিনীকে বলে,

- চিনতে পেরেছ তো?

- উঁহু।

- আরে! বাবা তো এটার কেচ্ছাই শুনিয়েছিল একদিন, মনে নেই?

- অহ হো মহাপতঙ্গ?

- হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই।

চড়ুই পাখি দুটোর শিশুকালের কথা। পুরাতন এক বাড়ির দেওয়ালের ফোকরে ছিল ওদের মা-বাবার নীড়। মা-বাবার ডানার মধ্যে মুখ লুকিয়ে ওরা তখন রাক্ষস-খোক্ষস আর দেও-দুরাচারের কেচ্ছা শুনত। ছোঁ-রাক্ষস, ম্যাও-খোক্ষস, কুণ্ডলী-ফোঁসফোঁস ও কা-ভক্ষুসের কথাই বেশি করে বলত মা-বাবা। কারণ এগুলোই ওদের প্রধান শত্রু।

এক অন্ধকার রাতে মা ছোঁ-রাক্ষসের গল্প বলছিল। ছোঁ-রাক্ষস আমাদেরই মতো পাখাওয়ালা আকাশচারী জীব। ওদের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। ওরা মাটির দিকে চোখ রেখে আকাশে ভেসে বেড়ায়। সুযোগ পেলে চোখের পলকে ছোঁ মেরে বাঁকা নখে বিধিয়ে ধরে নিয়ে যায়। তারপর গাছে বসে ঠোকর মেরে মেরে চোখ খায়, বুক খায়, কলজে খায়।

ছানা দুটো ভয়ে ওদের মার ডানার মধ্যে মুখ লুকায়। জোছনা উঠলে ওদের ভয় কমে। তখন নর-ছানাঁটা শুধায়, আচ্ছা মা, সবচেয়ে বড় পাখি কোনটা?

-তোর বাপকে জিজ্ঞেস কর। উনি দেখেছেন। বল না গো, সেই বড় পাখির গল্পটা।

-হ্যাঁ বলছি। অনেক আগে। আমরা তখন ছিলাম অনাবৃষ্টির দেশে। তোদের মা ডিমে তা দিচ্ছিল। আমি গিয়েছিলাম কুড়িয়ে খেতে। হঠাৎ শুনি বিকট শব্দ। চেয়ে দেখি অতি প্রকাণ্ড এক পাখি বোঁ-বোঁ আওয়াজ তুলে উড়ে যাচ্ছে। উড়ে যাচ্ছে অনেক দূর দিয়ে-আকাশ যেখানে গাছের মাথায় ঠেকেছে সেখান দিয়ে। এত বড় বিরাঁ পাখি আর কখনও দেখিনি।

-এটা কি ছোঁ-রাক্ষসের মতো ছোঁ মারে? মাদি ছানাঁটা রীতিমতো কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

-তা-তো দেখিনি, মা। ঐ একদিনই দেখেছি ওটা। ওটা দেখতে? ইতস্তত করে চড়ুই। হ্যাঁ, ওটা দেখতে অনেকটা ফড়িং-এর মতো। লেজ-লম্বা ফড়িং দেখেছিস তো? ঐ যে বৃষ্টির দিন একটা মেরে এনে তোদের খাইয়েছিলাম।

হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি, দুটো ছানাই বলে।

- সেই ফড়িং-এর মতো পাখা আর লম্বা লেজ। সে এক মহাপতঙ্গ। কত যে বড়, না দেখলে বোঝা যাবে না। বোঁ বোঁ শব্দ করে উড়ে বেড়ায়।

পিতার বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। আজকের এ আকাশচারী জীবটা মহাপতঙ্গ না হয়ে যায় না।

পক্ষিরাজ্য ভীত-সন্ত্রস্ত। এরকম পাখি এর আগে কেউ কখনও দেখেনি এদেশে। গাছে গাছে পাখিদের জরুরি সভা বসে।

এক পাখি বলে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমার মনে হয় এটা শস্যভোজী। মাংসভোজী রাক্ষস নয়। প্রতিবাদ করে অন্য পাখি বলে, না, না, এটা নিশ্চয় রাক্ষস পাখি। রাগের চোটে কেমন বোঁ বোঁ করছিল।

আর এক পাখি সমর্থন করে বলে, ঠিকই, এটা রাক্ষস পাখিই। তর্জন-গর্জন শুনেও বুঝতে পার না তোমরা? এটা খপাখপ ধরবে আর টপাঁপ গিলবে। যদি বাঁচতে চাও তবে এ দেশ ছেড়ে পালাও।

পালিয়ে যায় অনেক পাখিই। বেশিরভাগ যায় অনাবৃষ্টির দেশে। চড়ুই পাখি দুটো কিন্তু দেশ ছাড়ে না। কারণ ঘনবৃষ্টির দেশে ঝড়-বৃষ্টিতে কষ্ট হলেও পেট ভরে খেতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া-এ মহাপতঙ্গ অনাবৃষ্টির দেশেও দেখা দিয়েছে। ওদের জনক স্বচক্ষে দেখেই গল্প বলেছিল। চড়ুই দম্পত্তি তুলো, পালক, শুকনো খড় ঠোঁটে করে ফোকরে এনে জমা করে। সাজিয়ে গুজিয়ে সেখানে নীড় রচনা করে। বাড়ির বাসিন্দা দোপেয়ে দৈত্য ওদের দেখে খুশি হয়। স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের ডেকে বলে, লক্ষণ শুভ। ঐ দ্যাখো, চড়ুই পাখি বাসা বাঁধছে। এগুলো ভালো দেখে আসে, মন্দ দেখে চলে যায়। এ বছরটা সুখে-শান্তিতে কাঁবে।

কিন্তু সুখে-শান্তিতে দিন কাটে না। বন্যায় দেশ ডুবে যায়। দিনদিন পাখি বাড়তে থাকে। বাড়ির মালিক দোপেয়ে দৈত্য এবং আরও অনেকে দেশ ছেড়ে চলে যায়। যারা যেতে পারে না তারা প্রাণের দায়ে বাড়ির ছাদে, ঘরের চালে, গাছের ডালে উঠে হা-হুতাশ করে। চড়ুই পাখি দুটোরও দুর্দশার অন্ত নেই। ওদের প্রতিবেশী চড়ুই পাখিগুলো অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু ওদের পালাবার উপায় নেই। বাসায় রয়েছে কলজের টুকরো দুটো কচি ছানা। ওদের ফেলে আর যাওয়া যায় না।

এমন দুঃসময়ে বোঁ বোঁ আওয়াজ তুলে আসে এক মহাপতঙ্গ। চড়ুই দুটো উঁচু গাছের ডালে ঘন পাতার আড়ালে বসে চেয়ে দেখে। মহাপতঙ্গটা কয়েক পাক ঘুরে একটা জলা মাঠে নামে।

দোপেয়ে দৈত্যরা হৈ-চৈ শুরু করে দেয়। মহাপতঙ্গটা সাঁতার কেটে একটা বড় বাড়ির ছাদে সিঁড়ির কাছে গিয়ে থামে। কী অবাক কাণ্ড। একটা দোপেয়ে দৈত্য মহাপতঙ্গের পেট থেকে বেরিয়ে আসে। তার আহ্বানে এক এক করে একপাল দোপেয়ে দৈত্য মহাপতঙ্গের পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ওরা এবার বোঁ বোঁ ডাক দিতে দিতে আকাশে ওঠে। দুপাক ঘুরে সোজা সূর্যাস্তের দিকে চলে যায়।

ঐ দিন আরও কয়েকবার মহাপতঙ্গ আসে। বাড়ির ছাদে, ঘরের চালে, গাছের ডালে ছিল যেসব দোপেয়ে দৈত্য তাদের পেটে পুরে কোথায় উধাও হয়ে যায়।

চড়ুই পাখি দুটোর বিস্ময়ের সীমা নেই। রাতে বাসায় বসে স্ত্রী চড়ুই বলে, দোপেয়ে দৈত্যরা তো যেমন তেমন টেটন নয়।

- হ্যাঁ, জবর টেনন। পুরুষ চড়ুই বলে, ওরা মহাপতঙ্গকেও দেখছি পোষ মানিয়েছে।

- সত্যি, ওদের বুদ্ধি কৌশলের তারিফ করতে হয়।

- কেন, মা? বুকের তলা থেকে নর-ছানাটা জিজ্ঞেস করে।

-হ্যাঁরে, হ্যাঁ। বড় হয়ে যখন বাইরে যাবি তখন দেখতে পাবি। হাম্বা-হাম্বা, ভ্যাঁ-ভোম্বল, ঘেঁউ-পা-চাঁটা, কুক্কুরুত, প্যাঁক-টেটে, ম্যাও-খোক্কস, শুশুধর, চিহিঁ টগবগ আরও কত জীব-জানোয়ারকে যে ওরা পোষ মানিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

-এই হাম্বার-হাম্বা অবস্থা দেখে আমার হাসিও পায় দুঃখও লাগে। পুরুষ চড়ুই বলে, বেচারাকে নানান কাজে খাটিয়ে তো মারেই। উপরন্তু ওর পেটের নিচের ঝুলে-পড়া চামড়া টেনে টিপে সাদা রস রেব করে করে দোপেয়ে দৈত্যরা নিজেদের গলা ভিজায়।

স্ত্রী চড়ুই হেসে বলে, আবার দ্যাখো বিরাঁকায় শুশুধর, চিহিঁ টগবগ। ওদের পিঠে চড়ে কেমন মনের সুখে ঘুরে বেড়ায়।

- এতেও সাধ মেটেনি। এবার মহাপতঙ্গের পেটের মধ্যে জায়গা করেছে। দল বেঁধে ওর পেটের মধ্যে বসে এখন মহানন্দে আকাশে পাড়ি জমাতে শুরু করেছে।

স্ত্রী চড়ুই বলে, এবার দোপেয়ে দৈত্যরা কিন্তু ভারি বিপদে পড়েছিল। মহাপতঙ্গকে পোষ পানিয়েছিল তাই রক্ষা।

কিছুদিন পরে পানি শুকিয়ে যায়। দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল যে সব দোপেয়ে দৈত্য তারা দেশে ফিরে আসে। কিন্তু দেশে খাবার নেই। ক্ষেতের ফসল ভেসে গেছে বন্যায়। চারদিকে হাহাকার। চড়ুই পাখি দুটোরও দুর্দশার অন্ত নেই। বন্যার সময় দোপেয়ে দৈত্যরা বাড়ির ছাঁদে যে সব খাদ্যশস্য ফেলে গিয়েছিল তাই কাড়াকাড়ি করে খেয়ে এতদিন চলেছে। কিন্তু এখন দুটো ঘাসের দানাও কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। এই দুর্দিনে আবার পেটে দুরন্ত ক্ষুধা নিয়ে দুটো নতুন ঠোঁটের আবির্ভাব হয়েছে। ক্ষুধার জ্বালায় সেগুলো খালি ট্যাঁও ট্যাঁও করে। বাসায় ঢুকবার সাথে সাথে ঠোঁট ফাঁক করে এগিয়ে আসে আ-দে-দে-দে।

চড়ুই পাখি দুটো মাঠে খাবার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এমন দিনে আবার শব্দ শোনা যায়, বোঁ-বোঁ-বোঁ।

মহাপতঙ্গ এসে মাঠে নামে। দোপেয়ে দৈত্যরা তার পেট থেকে বস্তা কী সব নামিয়ে নেয়। এটা উড়ে চলে গেল আর একটা মহাপতঙ্গ আসে। তারপর আরেকটা আরও কয়েকটা। সবগুলোই বস্তা বস্তা কী সব দিয়ে চলে যায়। চড়ুই দুটোর কৌতূহল জাগে। ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ লাফ দিয়ে ওরা এগিয়ে যায়। কাছাকাছি গিয়ে দেখে ওদের স্বজাতি কয়েকটা গিয়ে হাজির হয়েছে ওখানে। খুঁটে খুঁটে কি যেন খাচ্ছে।

ফুড়ুৎ করে উড়ে ওরাও ছুটে যায়।

কি আশ্চর্য! খাবার দিয়ে গেছে মহাপতঙ্গ! ক্ষুধার খাবার! আনন্দ। আনন্দ। কী আনন্দ! বস্তা থেকে ঝরে পড়ছে কত খাবার! দুটো ঠেসে পেট পুরে খায়। বাসায় ফিরে বাচ্ছা দুটোকে খাওয়ায়। আঃ কী শান্তি!

কাহিনী সংক্ষেপ

একটি ছোঁ বাড়ির দেয়ালের ফোকরে থাকত একজোড়া চড়ুই। একদিন এল মহাপতঙ্গ। মহাপতঙ্গ দেখে পাখ-পাখালি অনেকেই দেশ ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু চড়ুই দুটো গেল না। যদিও তারা ভয় পেয়েছিল- তবুও যায়নি। কারণ এখানে খাবার আছে। আর যেখানে যেতে পারে-সেখানে খাবারের বড় অভাব।

এক সময় দেশ বন্যায় ডুবে যায়। মানুষ, পাখ-পাখালির কষ্টের শেষ নেই। আবার আসে মহাপতঙ্গ। চড়ুইগুলো দেখে মহাপতঙ্গ তার পেটে করে জলবদ্ধ মানুষদের কোথায় কোথায় যেন নিয়ে যায়। পানি সরে যায়। আবার মানুষেরা ফিরে

আসে। কিন্তু কোথাও খাবার নেই। আবার আসে মহাপতঙ্গ। বস্তা বস্তা কী যেন দিয়ে যায়। চড়ুই দুটো আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করে - বস্তাভর্তি খাবার শুধু খাবার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. মহাপতঙ্গ গল্পটি কার রচনা?

ক. শওকত ওসমান — খ. আবু ইসহাক

গ. সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ — ঘ. মুনীর চৌধুরী

২. 'সূর্য দীঘল বাড়ী' কিসের নাম?

ক. একটি ছায়াছবির — খ. একটি চিত্রকর্মের

গ. একটি বাড়ির — ঘ. একটি উপন্যাসের

৩. 'মহাপতঙ্গ' রচনায় কাদের গল্প আছে?

ক. শালিকের — খ. চড়ুইয়ের

গ. কাকের — ঘ. কোকিলের

৪. মহাপতঙ্গ দেখতে কেমন

ক. প্রজাপতির মতো — খ. ফড়িং-এর মতো

গ. বাঘের মতো — ঘ. খরগোসের মতো

৫. দোপেয়ে দৈত্য কী?

ক. রাক্ষস — খ. দানব

গ. মানুষ — ঘ. মহাপতঙ্গ

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

১. ১. খ. আবু ইসহাক   ২. খ. একটি উপন্যাসের   ৩. খ. চড়ুই-এর

৪. খ. ফড়িং-এর মতো   ৫. গ. মানুষ

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- চড়ুইদের জীবন কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- মহাপতঙ্গের সর্বনাশা ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অনেক দিন পরে আজ চড়ুই দম্পত্তি খোশ মেজাজে গল্প করে। গল্প ঠিক নয়। দোপেয়ে দৈত্যের গুণকীর্তন।

পুরুষ চড়ুই বলে, দোপেয়ে দৈত্য সমস্ত দুঃখ-শান্তি দূর করতে পারে। ওরা ইচ্ছে করলে আরও সুন্দর করতে পারে পৃথিবীকে।

-হ্যাঁ তা পারে। ওরা যদি করে পণ, করে দুঃখ বিমোচন। স্ত্রী চড়ুইটা কৃতজ্ঞতায় গানই জুড়ে দেয়। ওর সঙ্গীও যোগ দেয় সে গানে। ছানা দুটো মুগ্ধ হয়ে শোনে।

মহাপতঙ্গ যে খাদ্যশস্য দিয়ে যায়, সেগুলো দোপেয়ে দৈত্যদের ঘরে ঘরে আসে। দেয়ালের ফোকরে আবার চড়ুই দম্পতির সুখের ঘরকন্না চলে। স্ত্রী চড়ুই জোড়া ডিম পাড়ে। দুটিতে পালা করে তা দেয়। জোড়া জোড়া বাচ্চা ফোটে। সারাদিন ধরে শস্যকণা কীট-পতঙ্গ কুড়িয়ে এনে বাচ্চাদের ঠোঁটে ঢুকিয়ে খাওয়ায়। ওরা বড় হয়ে ওঠে। ওদের কাছে ছোঁ-রাক্ষস, ম্যাও-

খোক্ষস, কুণ্ডলী-ফোঁসফোঁস ও রাক্ষুসের কেচ্ছা বলে। এসব রাক্ষস-খোক্ষস ও দেও দুরাচারের কেচ্ছা শুনে বাচ্চাগুলো মুষড়ে পড়ে। তখন ওরা সুন্দর পৃথিবীর গল্প শুরু করে দেয়। রং-রূপ-রসের বৈচিত্র্যে প্রাণবন্ত এ পৃথিবী। পানি আর বাতাসের প্রাচুর্যে প্রাণবন্ত এ পৃথিবী। ফুল-ফল-শস্যের সম্ভারে সমৃদ্ধ এ পৃথিবী। দুঃখের তুলনায় অনেক সুখ এখানে। গল্পে গল্পে দোপেয়ে দৈত্যের প্রসঙ্গ এসে যায়। এদের বুদ্ধি, কৌশল ও গুণ হেকমতের অনেক গল্প চলে। তারপর চলে মহাপতঙ্গের গল্প। বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময় কত মহান কাজ করেছে এগুলো।

এভাবে দিন যায়। মাস পেরোয়। বছর ঘোরে। একদিন ভোর বেলা। উড়ু উড়ু বাচ্চা দুটোকে খেলার ছলে আত্মরক্ষার নানা কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছিল পাখি দুটো। হঠাৎ স্ত্রী চড়ুই বলে ওঠে, ঐ যে শব্দ। মহাপতঙ্গ আসছে।

-হ্যা, তাই তো! মহাপতঙ্গই আসছে। পুরুষ চড়ুই বলে, এবার আবার কী নিয়ে এল?

-নিশ্চয়ই ভাল খাবার-টাবার নিয়ে এসেছে। চলো না দেখে আসি।

-আমরাও যাব, মা? ছানা দুটো আবদার করে।

-না রে, না। তোরা এখনও ভাল করে উড়তে পারিস নে। আমরা গিয়ে দেখে আসি।

-আমাদের ভয় করবে যে। মাদি ছানাঁট বলে।

-ভয়! দিনে-দুপুরে আবার কিসের ভয়?

-ম্যাও-খোক্ষক আসে যদি?

-দূর বোকা! ম্যাও-খোক্ষস এ দেয়াল বেয়ে উঠতেই পারবে না।

-কুণ্ডলী-ফোঁসফোঁস যদি আসে?

-উঁহু, কুণ্ডলী-ফোঁসফোঁসও এ খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠতে পারবে না। তোরা বড় হয়ে এরকম জায়গা বেছে নিয়ে বাসা বাঁধবি। এ রকম জায়গায় যদি আসে তো কা-ভক্ষুস পারে।

কা-ভক্ষুস!

বাচ্চা দুটো ভয়ে শিউরে ওঠে। ওদের মা বুঝতে পেরে বলে, থাক-সে কথা, আমি ওদের কাছে থাকি। তুমিই গিয়ে দেখে এসো।

-আচ্ছা, তুমি থাক ওদের নিয়ে। আমি গিয়ে দেখে আসি। মহাপতঙ্গ খাবার নিয়ে এলে তোমাদের জন্য পোঁটলা ভরে নিয়ে আসব। পুরুষ চড়ুই ঢেউয়ের তালে নাচতে নাচতে উড়ে যায়।

মহাপতঙ্গ ঠিকই। আর এসেছে একটা নয়, এক জোড়া নয়, পাঁচ জোড়া। চড়ুই খুশি হয়। অনেক খাবার নিয়ে এসেছে নিশ্চয়।

চোঁও করে একটা মহাপতঙ্গ নেমে যায় অনেক নিচে।

একি! ছোঁ মারবে নাকি? ঐ তো ওপর দিকে উঠছে আবার, কিন্তু ওটার পেট থেকে পড়ছে কী ও?

চড়ুই ভাবে, নিশ্চয়ই ডিম। বা রে বা, বড় পাখির বড় রং, আন্ডা পাড়ার দেখ ঢং।

বুম-ম্-ম্-

প্রচণ্ড শব্দে মূর্ছা যায় চড়ুই পাখি। ঘুরতে ঘুরতে সে একটা ঝোপের ওপর পড়ে।

বেলা যখন গড়িয়ে যায় তখন জ্ঞান ফিরে আসে। কিন্তু শরীরে এতটুকু বল নেই। সে চোখ মেলে। ঝোপের ওপর কাত হয়ে শুয়েই সে মিটমিট করে তাকায় এদিক-ওদিক।

এ কোথায় সে? কেমন করে সে এল এখানে, এ ঝোপের ওপর? কী হয়েছিল তার?

চড়ুইটি প্রথমে কিছুই মনে করতে পারে না।

অনেকক্ষণ ধরে ঘটনাঁটা মনে করার চেষ্টা করে সে। তারপর আস্তে আস্তে সব মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে আর বিস্ময় জাগে-ডিমটা বুঝি ফেটেই গেছে। তাই তো এমন শব্দ। বড় পাখির বড় ডিম। এরকম শব্দ তো হবেই। চড়ুই ভাবে, কিন্তু এভাবে ডিম পেড়ে লাভটা কী? মাটিতে পড়ে ফেটেই তো গেল, তা দিয়ে বাচ্চা ফোঁটাতে পারল না আমাদের মতো।

বাচ্চা ফোঁটানোর কথা ভাবতে গিয়ে নিজের বাচ্চা দুটোর কথা মনে পড়ে যায় তার। বাচ্চা দুটো নিয়ে স্ত্রী সেই সকাল থেকে ওর পথ চেয়ে বসে আছে। ক্ষুধার জ্বালায় কত না জানি কষ্ট পাচ্ছে ওরা। কিন্তু একটা দানাও যে যোগাড় হয় নি? কী ব্যাপারটাই না ঘটে গেল। ওরা কি শুনতে পেয়েছে ডিম ফাঁটার শব্দ?

চড়ুই কোনো রকমে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। ফুড়ুৎ করে সে উড়াল দেয়। হঠাৎ নিচে চোখ পড়ে চড়ুই পাখির। পথ ভুল হল নাকি। চড়ুই চমকে ওঠে, কোন পথে এল সে? এরকম দেখাচ্ছে কেন? না, পথ ভুল হবার কথা তো নয়।

তালগাছ ডানে রেখে দুই আমগাছের ফাঁক দিয়েই তো এসেছে সে। কিন্তু আন্ডা রঙের উঁচু বাড়িটা কোথায় গেল? ঐ দিকে নারকেলের গাছটা তো ঠিকই আছে।

চড়ুই উড়ে যায় দুদিকে নিশানা ঠিক রেখে। কিন্তু সব নিশানা পাওয়া যাচ্ছে না। ঐ যে তেঁতুল গাছ। কিন্তু ওটার এমন ছিন্ন-ছিন্ন চেহারা কেন? কিছুই ভেবে পায় না চড়ুই। যাকগে, আর একটু গেলেই কাউন রঙের বাড়িটা।

কিন্তু কোথায় সে কাউন রঙের বাড়ি?

চড়ুই পাখির বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে। নিচে চেয়ে দেখে ধ্বংসস্তূপ। লণ্ড-ভণ্ড সব। সে চিৎকার করে ওঠে। স্ত্রীর নাম ধরে ডাকে। বাচ্চা দুটোর নাম ধরে ডাকে। কিন্তু সে ডাক ফিরে আসে প্রতিধ্বনি হয়ে।

ইটের ফাঁকে ফাঁকে খোঁজে চড়ুই। কিন্তু কোনো চিহ্ন নেই তার স্ত্রী আর বাচ্চা দুটোর। শুধু এক জায়গায় মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে বাড়ির বাসিন্দা দোপেয়ে দৈত্য।

ব্যথায় ছটফট করে চড়ুই। ডানা ঝাপটায়। ঠোঁট দিয়ে বুকের পালক কাটে। বিলাপ করতে করতে সঙ্গিনী ও ছানা দুটোর কত কথাই না ইনিয়ে বিনিয়ে বলে যায়।

নিঃসঙ্গ এক চড়ুই পাখিকে প্রায়ই দেখা যায় জানালার ধারে, রেলিং-এর ওপর। ঘৃণার স্বরে সে ডেকে যায়,

ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ।
এ ছিঃ ছিঃ কিসের জন্য? এ ধিক্কার কাদের জন্য? এ নিশ্চয় তাদের জন্য যারা ডিম্ববতী মহাপতঙ্গিনীর পেটে চড়ে উড়ে বেড়ায়, আর অশান্তি ডেকে আনে।

কাহিনী সংক্ষেপ

চড়ুই দম্পত্তি তাদের বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে খোশ মেজাজেই ছিল। একদিন মহাপতঙ্গ এল- একটি নয়, দুটি নয় দশটি। চড়ুই ভাবল অনেক খাবার এনেছে মহাপতঙ্গ। কিন্তু মহাপতঙ্গের পেট থেকে ডিমের মতো কিছু বেরিয়ে এল। প্রচণ্ড শব্দ হল। সব কিছু লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেল। ভাঙল ঘরবাড়ি। চড়ুই তার স্ত্রী আর ছানাদের খুঁজে পেল না। সুখের সংসার ভাঙল মানুষেরও। মহাপতঙ্গ পৃথিবীতে নিয়ে এল অশান্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. 'ওরা ইচ্ছে করলে সুন্দর করতে পারে পৃথিবীটা' - ওরা কারা?
   ক. রাজা খ. সেনাপতি
   গ. সরকার ঘ. মানুষ
২. শেষ দিন কটা মহাপতঙ্গ এসেছিল?
   ক. ৩ জোড়া খ. ৫ জোড়া
   গ. ৪ জোড়া ঘ. ২ জোড়া
৩. 'ইটের ফাঁকে ফাঁকে খোঁজে চড়ুই' কি খোঁজে?
   ক. স্ত্রী ও বাচ্চা দুটোকে খ. বাচ্চাগুলোকে
   গ. শস্যকণা ঘ. মহাপতঙ্গকে

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন

ক. ১. ঘ. মানুষ ২. খ. ৫ জোড়া ৩. ক. স্ত্রী ও বাচ্চা দুটোকে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন

১. রূপক কী? রূপকের আড়ালে 'মহাপতঙ্গ' গল্পে লেখক কি বলতে চেয়েছেন।
২. 'মহাপতঙ্গ' গল্প অবলম্বনে চড়ুইদের জীবনকাহিনী রচনা করুন।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ছোঁ রাক্ষস কী?
২. মহাপতঙ্গ কিভাবে অশান্তি সৃষ্টি করে?
৩. 'ওরা ইচ্ছে করলে আরও সুন্দর করতে পারে পৃথিবীকে' - কাদের কথা বলা হয়েছে?

গ. ব্যাখ্যা করুন

১. ওরা ইচ্ছে করলে আরও সুন্দর করতে পারে পৃথিবীকে।
২. এ ছি! ছি! কিসের জন্য? এ ধিক্কার কাদের জন্য?

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : রূপক কি? রূপকের আড়ালে 'মহাপতঙ্গ' গল্পে লেখক কী বলতে চেয়েছেন?

উত্তর : বাহ্যিক রূপের আড়ালে গূঢ় ও গভীরতর যা বলা হয় তাই রূপক। যে কথা বা ভাবটি এখানে ব্যক্ত করা হচ্ছে তাই মূল কথা নয় - ব্যক্ত কথার আড়ালে যখন আর একটি অর্থ লুকিয়ে থাকে তখনই তাকে বলে রূপক।

'মহাপতঙ্গ' একটি রূপক গল্প। এ গল্পে আমরা এক চড়ুই দম্পত্তি ও তাদের ছানা-পানাদের গল্প পাই। এ গল্পে লেখক পৃথিবীকে দেখেছেন চড়ুই এর দৃষ্টিতে। চড়ুই একটি শান্তিপ্রিয় পাখি। সে আমাদের কোনো ক্ষতি করে না। গল্পে আমরা দেখি চড়ুইটি তাদের বাচ্চা-কাচ্চাদের সাবধান করে দিচ্ছে নানা রাক্ষস-খোক্কসদের সম্পর্কে। এরা তাদের জীবন নাশ করে। একদিন তারা দেখে এক বিশালকায় মহাপতঙ্গ উড়ে আসে। এ মহাপতঙ্গগুলো বন্যার পানি থেকে বাঁচিয়ে মানুষকে নিয়ে যায়। চড়ুই ভাবে মানুষ মহাবুদ্ধিমান - তাই অন্য অনেক প্রাণীর মতো মহাপতঙ্গকেও বশ করে ফেলেছে। বন্যার পরে এই মহাপতঙ্গ অনেক খাবার এনে দেয়। সে খাবার খেয়ে চড়ুইরাও বাঁচে। সুখে-শান্তিতে দিন কাটে চড়ুইদের। মহাপতঙ্গ আসে আবার - অনেকগুলো এক সাথে। মহাপতঙ্গের পেট থেকে ডিমের মতো কিছু বেরিয়ে আসে। প্রচণ্ড শব্দ হয়। জ্ঞান হারায় চড়ুই। যখন জ্ঞান ফেরে তখন দেখে চারদিকে ধ্বংসস্তূপ। চড়ুইটি তার স্ত্রী আর ছানাদের খুঁজে পায় না।

এটি চড়ুই-এর গল্প হলেও আসলে মানুষেরই গল্প। মহাপতঙ্গ মানুষের আবিষ্কার উড়োজাহাজ। যে আবিষ্কার মানুষের অশেষ উপকার করে। জীবনকে সুখ-শান্তিতে পূর্ণ করে তুলতে মানুষের মেধা ও শক্তি ব্যয় হয়। কিন্তু সেই মেধা ও শক্তি যখন বিপথে যায় তখন ডেকে আনে সর্বনাশ ও অশান্তি। শেষের দিকে মহাপতঙ্গ বা উড়োজাহাজের আগমন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। যে মানুষ সুখে শান্তিতে থাকতে চায় সে মানুষই নিয়ে আসে অশান্তি ও বিপর্যয়। মানুষের মনের জঘন্যতম এ দিকটিকে লেখক রূপকের আড়ালে 'মহাপতঙ্গ' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন : ছোঁ রাক্ষস কী?

উত্তর : 'ছোঁ রাক্ষস' মানে যে রাক্ষস ছোঁ মারে। রাক্ষস হচ্ছে অপশক্তি - যে মৃত্যু ডেকে নিয়ে আসে, অশান্তি সৃষ্টি করে। মানব শিশুরা রাক্ষস-খোক্কসের গল্প শুনতে ভালবাসে। চড়ুই-শিশুও তাদের বাবা-মার কাছে রাক্ষস-খোক্কসের গল্প শোনে। যে সব প্রাণী থেকে তাদের বিপদ আসে তারাই রাক্ষস। চিল ও বাজ চড়ুই শিশুদের জন্য আতঙ্ক। এরা আকাশ থেকে নেমে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় চড়ুই শিশুকে। তারপর তাদের শরীরটা ঠুকরে যায়। এজন্যই চিল-বাজ তাদের কাছে রাক্ষস। আর এদের প্রকৃতি ছোঁ মেরে চড়ুইকে নিয়ে যাওয়া। তাই লেখক এদের নাম রেখেছেন - ছোঁ রাক্ষস।

প্রশ্ন : মহাপতঙ্গ কিভাবে অশান্তি সৃষ্টি করে?

উত্তর : 'মহাপতঙ্গ' শব্দের অর্থ অনেক বড় কীট বা পোকা। মানুষের সৃষ্টি উড়োজাহাজকে চড়ুই বলেছে মহাপতঙ্গ। কারণ এরা উড়ে যায় পোকা, মাকড়ের মতো। তবে এটির আকৃতি বৃহৎ।

মহাপতঙ্গ খাদ্য এনে একবার মানুষ ও প্রাণীদের রক্ষা করেছিল। কিন্তু শেষবার মহাপতঙ্গ এসেছিল অশান্তি আর ধ্বংস নিয়ে। অনেকগুলো মহাপতঙ্গ আকাশে উড়ছিল। তাদের পেটের ভিতর থেকে এল ডিমের মতো কিছু। যা ছিল আসলে বোমা। বোমার আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হল - ঘরবাড়ি, দোকানপাঁ, মানুষজন, পশু-পাখি। শান্তির জনপদে নেমে এল ধ্বংস ও অশান্তি।

মহাপতঙ্গ এভাবেই অশান্তি সৃষ্টি করেছিল।

ব্যাখ্যা উত্তর

১. ওরা ইচ্ছা করলে আরও সুন্দর করতে পারে পৃথিবীকে

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি আবু ইসহাক রচিত 'মহাপতঙ্গ' নামক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে মানুষদের কথা বলা হয়েছে।

চড়ুই যদিও মানুষকে বলেছে দোপেয়ে দৈত্য, তবু মানুষের বন্ধুত্ব ও শুভবুদ্ধিকে তারা অভিনন্দিত করেছে। চড়ুই এর কাছে মানুষের আকার-আকৃতি দৈত্যের মতোই। কিন্তু মানুষের অনেক গুণ। তারা চাইলে এ পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে পারে। এ পৃথিবীকে মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-গাছালি দিয়ে শান্তির নিবাস করতে পারে। চড়ুই-এর বিশ্বাস বুদ্ধিমান মানুষ অন্য প্রাণীকে যেমন তেমনি মহাপতঙ্গকে বশ করে ফেলেছে। আর সেজন্যই মহাপতঙ্গ বস্তা বস্তা খাবার দিয়ে গেছে।

চড়ুই শান্তিপ্রিয়। তারা শান্তি ভালবাসে। কিন্তু পৃথিবীতে যত অঘটন ঘটায় মানুষ। কিন্তু এই মানুষই চাইলে সুখের পৃথিবী গড়তে পারে - চড়ুই দম্পত্তির এই বিশ্বাস।

পাঠোত্তর মূল্যায়নের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি সেগুলোর জন্য মূলপাঠ, বস্তুসংক্ষেপ এবং প্রয়োজনে আপনার টিউটোরিয়াল শিক্ষকের সাহায্য নিন।

বীর শ্রেষ্ঠদের কথা

আলাউদ্দিন আল আজাদ

লেখক পরিচিতি

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন আল আজাদ নরসিংদী জেলার রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি বাংলায় বি.এ. (অনার্স) ও এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীকালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পি.এইচ. ডি. লাভ করেন।

কর্মজীবনে আলাউদ্দিন আল আজাদ বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি কিছুদিন কাজ করেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদের রচনা বিচিত্রমুখী। তিনি গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাসগুলো হচ্ছে-

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০), শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন (১৯৬২), ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪), কর্ণফুলী (১৯৬২)।

গল্পগ্রন্থ : জেগে আছি (১৯৫৩), ধানকন্যা (১৯৫১), মৃগনাভি (১৯৫৪), অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৮), আমার রক্ত আমার স্বপ্ন (১৯৭৫) ইত্যাদি। অন্যান্য গ্রন্থ - শিল্পীর সাধনা, ফেরারী ডায়েরি ইত্যাদি।

আলাউদ্দীন আল আজাদের রচনায় সমাজ সচেতনতার পরিচয় আছে। তাঁর কোনো কোনো রচনা বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

পাঠ পরিচিতি

স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এ স্বাধীনতা অর্জন করতে যেয়ে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিরল দৃষ্টান্ত যাঁরা উপস্থাপন করেছেন - তাঁরাই আমাদের বীরশ্রেষ্ঠ। এই বীরশ্রেষ্ঠদের অম্লান বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল কাহিনী এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে পারবেন।
- সিপাহী মোস্তফা কামালের আত্মত্যাগের বর্ণনা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমাদের দেশ বাংলাদেশ - যাকে কবি বলেছেন 'সোনার বাংলা'। মধ্যযুগের বিদেশি পর্যটকেরা তার নাম দিয়েছেন 'স্বর্গের দরজা'।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের আরও অনেক বর্ণনা, অনেক প্রশংসা ইতিহাসে, কিংবদন্তিতে ছড়িয়ে আছে।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশ ছিল একদিকে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, অন্যদিকে প্রাচুর্যের মহাভাণ্ডার। তার উত্তরে বিশাল হিমালয় পর্বতশ্রেণী, দক্ষিণে উত্তাল বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে রুক্ষ প্রান্তর এবং পূর্বে শৈলমালা। গাছে গাছে ফুল-ফল, শস্যভরা খামার। হাজারো পাখির কলকাকলিতে মুখরিত ঝোপঝাড় অরণ্যানী নদীর মেখলা কোমরে জড়িয়ে যেন পাহাড়ি কন্যার মত সগর্বে হেঁটে বেড়াচ্ছে। বাংলার বিচিত্র প্রকৃতি বাংলার মানুষকে করেছে কখনও বাউল, কখনও কবি এবং কখনও সংগ্রামী কৃষক।

বাংলাদেশের উর্বরতা যুগে যুগে বিদেশিদের হাতছানি গিয়ে ডেকেছে। তারা এসেছে সাতসমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে, জাহাজ ভাসিয়ে কিংবা স্থলপথে পর্যটকের বেশে, বণিকের বেশে। কখনও বা আক্রমণকারী হিসেবে সৈন্যসামন্ত নিয়ে। পিছনে তাকালে আমরা দেখতে পাই, ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা হারিয়েছে, বিদেশিদের পদানত হয়েছে। কিন্তু এও সত্য যে, তা ছিল নিতান্ত সাময়িক। বেশি দিন কারুর বশ্যতা স্বীকার করে নি এদেশের মানুষ, তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অস্ত্র হাতে নিয়েছে স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছে কালো মেঘের আড়াল থেকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সেই সত্যকে নতুনভাবে প্রমাণ করল।

উনিশ শ একাত্তর সাল, পঁচিশে মার্চ। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনী রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশের ঘুমন্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হায়েনার মত। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের মানুষ তখন সারাদেশে প্রতিরোধ গড়ে তুলল।

আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ বিশ শতকের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা। শত্রুরা চরম পৈশাচিকতার সঙ্গে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, গণহত্যা এবং নারী নির্যাতন চালায়। অবশেষে শত্রু পর্যুদস্ত হয়ে যায়, তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। আমাদের বিজয় দিবস ষোলই ডিসেম্বর।

স্বাধীনতা আমাদের আবহমান কালের সাধ ও সাধনা, সেই স্বাধীনতা আমরা লাভ করলাম। জন্ম নিল পৃথিবীর মানচিত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, গাঢ় সবুজের পটে সূর্যের মত লালবৃত্ত পতাকা পতপত করে উড়তে লাগল।

কিন্তু এই স্বাধীনতাকে আমরা লাভ করলাম তিরিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের মূল্যে, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে। শত্রুর বিরুদ্ধে নয় মাসের মরণপণ সংগ্রামে দেশের জনগণ বীরত্বের দুর্লভ প্রমাণ রেখেছেন। দেশের জন্য, জাতির জন্য এবং শান্তি ও প্রগতির আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য অনেকে অতুলনীয় আত্মত্যাগ করেছেন। হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের কথা আমরা কখনও ভুলতে পারব না। তাঁদের মহৎ দৃষ্টান্ত আমাদের গৌরব। বর্তমানের প্রেরণা এবং ভবিষ্যতের অঙ্গীকার।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অমর শহীদ সাত বীরশ্রেষ্ঠের কথা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁদের অসীম বীরত্ব ও অপূর্ব আত্মত্যাগের ফলেই আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ নিশ্চিত বিজয়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

১৮ এপ্রিল, ১৯৭১। চারদিকে প্রচণ্ড শব্দ, অস্ত্রের গর্জন। হানাদার বাহিনী আমাদের আখাউড়া প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওপরে আঘাত হানছে। পুরো এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য আক্রমণ চালাচ্ছে। বাংলাদেশের এক প্লাটুন সৈন্য যুদ্ধ করছিলেন শত্রুর বিরুদ্ধে। প্রচণ্ড যুদ্ধে একজন্য সৈন্য গুলিবিদ্ধ হলেন। তাঁর সাথী এলেন এগিয়ে, নিমেষে হাতে তাঁর অস্ত্রটা তুলে নিলেন। একে একে শাহাদৎ বরণ করেন নয় জন সৈনিক, যার ফলে কোম্পানি পশ্চাদপসরণের কৌশল বেছে নিতে বাধ্য হয়, কিন্তু কভারিং ফায়ারের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন সেই সৈনিক, যিনি মৃত্যুপথযাত্রী সহযোদ্ধার অস্ত্রটি হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ক্রমে পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে শত্রুসেনা আরও এগুতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই সৈনিক বীরবিক্রমে বাধা দিয়ে যাচ্ছিলেন বলে সে কাজ সহজ হল না। ফলে বাংলাদেশের পুরো কোম্পানি পশ্চাদপসরণে সক্ষম হয়। উপায়ান্তর না দেখে বহু সৈন্য অন্যদিক দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে এগিয়ে আসে এবং তাঁকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু আত্মসমর্পণ তাঁর জানা ছিল না আর তাই মৃত্যু অবধারিত জেনেও তিনি বাঘের মত শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত্রুকে পুরো ঘায়েল করতে পারেননি তিনি, কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন নিজের একটি কোম্পানিকে। আর তাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি বেঁচে রইলেন চিরকালের জন্য। বাংলার এই বীর সন্তান সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল। জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত করেছে।

মোস্তফা কামাল বীরশ্রেষ্ঠ ১৯৪৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভোলা জেলার দৌলতখান থানার পশ্চিম হাজিপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাবিবুর রহমান। পিতা ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন হাবিলদার। মোস্তফা কামালের প্রথম জীবন কাটে বাপমায়ের সঙ্গে কুমিল্লা সেনানিবাসে, সেখানকার সুশৃঙ্খল পরিবেশ তাঁর ভাল লেগেছিল। ছোঁবেলা থেকেই ছিলেন সাহসী ও ডানপিটে। বেশি লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি তাঁর। উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে যে বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম।
যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি জাতি বেঁচে থাকবে পৃথিবীতে, ততদিন সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল বীরশ্রেষ্ঠের কথা আমরা ভুলব না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এই প্রথম অবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় তখন মুক্তিবাহিনী গঠিত হচ্ছে এবং তাঁরা দখলদার শত্রুর বিরুদ্ধে মরণপণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।

কাহিনী সংক্ষেপ

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের প্রশংসা ইতিহাস ও কাহিনীতে ছড়িয়ে আছে। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ আর প্রাচুর্যের ভাণ্ডার। বাংলার প্রকৃতি এদেশের মানুষকে কখনও করেছে বাউল, কখনও কবি কখনও সংগ্রামি।

বিদেশিরা এদেশে বারবার হানা দিয়েছে সম্পদ আর প্রাচুর্যের লোভে। এদেশকে তারা পদানত করেছে। তবে এদেশের মানুষ তা কখনও মেনে নেয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সেই সত্যকে আবার প্রমাণিত করল। উনিশ শত একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানিরা হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এদেশের নিরীহ মানুষের ওপর। ২৬শে মার্চ থেকে শুরু হল মুক্তিযুদ্ধ। আমরা স্বাধীনতা লাভ করলাম তিরিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে। শত্রুর বিরুদ্ধে নয় মাসের যুদ্ধে এ দেশের মানুষ যে ত্যাগ ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা নেই। এদের মধ্যেই যাঁরা দেশের জন্য হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছেন - দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন আমরা কোনদিন তাঁদের ভুলব না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অমর শহীদ সাত বীরশ্রেষ্ঠ। তাঁরা দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠ সন্তান।

বীর সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল বীরত্বের অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখেছেন- তাই তিনি বীরশ্রেষ্ঠ। আখাউড়া রণাঙ্গনে নিজের সহযোদ্ধা এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধাকে অসমসাহসিকতার সঙ্গে তিনি বাঁচিয়েছিলেন। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে সহযোদ্ধাদের জন্য সেদিন তিনি প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন। এই অসমসাহসিকতার জন্যই তিনি বীরশ্রেষ্ঠ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. মধ্যযুগের বিদেশি পর্যটকরা বাংলাদেশকে কী বলেছেন?
   ক. সোনার বাংলা　　খ. স্বর্গের দরজা
   গ. সম্পদের দেশ　　ঘ. নদীর দেশ

২. শত্রুর বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে কতদিন যুদ্ধ করতে হয়েছিল?
   ক. তিনমাস　　খ. ছয় মাস
   গ. নয় মাস　　ঘ. বার মাস

৩. শত্রুকে পুরো ঘায়েল করতে পারেন নি তিনি, কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন নিজের একটি কোম্পানিকে। কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?
   ক. সিপাহি মোস্তফা কামাল　　খ. মুন্সি আব্দুর রব
   গ. মুহম্মদ জাহাঙ্গীর　　ঘ. নূর মোহাম্মদ

৪. জাতি সিপাহি মোস্তফা কামালকে কৃতজ্ঞ চিত্তে কী উপাধি দিয়েছে?
   ক. বীরাত্তম　　খ. বীরশ্রেষ্ঠ
   গ. বীর প্রতীক　　ঘ. বীর

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন।

১. খ. স্বর্গের দরজা ২. গ. নয় মাস ৩. ক. সিপাহি মোস্তফা কামাল ৪. খ. বীরশ্রেষ্ঠ

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- মুন্সি আব্দুর রব, মতিউর রহমান ও নূর মোহাম্মদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

২০ এপ্রিল, ১৯৭১ সেই দুঃসাহসী প্রতিরোধের একটি রক্তাক্ত তারিখ। চট্টগ্রামে বন্দরনগর ছাড়িয়ে রাঙামাটি ও মহালছড়ির সংযোগপথ, সেখানে তখন মুক্তিবাহিনীর প্রধান অবস্থান। কিন্তু এখানে আঘাত করাই শত্রুর প্রধান লক্ষ্য। শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের একটি কোম্পানি বুড়িঘাঁট এলাকার চিংড়ি খালের দুপাশের প্রতিরক্ষাব্যূহ গঠন করে। এই কোম্পানির মেশিনগানের দায়িত্বে একজন তরুণ ল্যান্সনায়েক। পাকিস্তানি দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাঁটালিয়নের সংখ্যা ও অস্ত্রে অধিকতর শক্তিশালী একটি কোম্পানি সকাল সাড়ে এগারোঁটার দিকে অভিযান শুরু করল সাতটা স্পীড বোঁ ও দুটো মোঁর লাভ করে। সেগুলোর মধ্য থেকে দুটো স্পীডবোঁট ক্ষিপ্রগতিতে তখন অগ্রগামী ভূমিকায় এগিয়ে আসছিল, উদ্দেশ্য মর্টারের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ছত্রছায়ায় আমাদের কোম্পানিটিকে ছত্রভঙ্গ করে দেবে এবং এগিয়ে যাবে মুক্তিবাহিনীর প্রধান অবস্থান মহালছড়ির দিকে। প্রবল আক্রমণে তারা আরও এগিয়ে আসতে লাগল। অবিরাম চলছে মর্টারের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ ও অগ্রগামী শত্রুবাহিনীর সমর্থনকারী অস্ত্রশস্ত্রের গোলাগুলি, কিন্তু এদেশেরই মাটির সন্তান সেই তরুণ ল্যান্সনায়েক সেসব উপেক্ষা করে দৃঢ়চিত্তে ও মেশিনগানের নির্ভুল নিশানায় গোলাবর্ষণ অক্ষুণ্ন রাখেন আক্রমণকারী শত্রুর ওপর। ফলে শত্রুর স্পীডবোঁট ডুবে যায় এবং হতাহত হয় প্রায় দুই প্লাঁন সৈন্য। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে, মৃতদেহগুলোকে ভাসমান অবস্থায় ফেলে রেখে একটি লঞ্চে তারা পালাতে বাধ্য হয়। তরুণ ল্যান্সনায়েক পলায়নপর শত্রুর ওপরে আক্রমণ চালাতে থাকেন; এমন সময় শত্রুর মর্টারের গোলার সরাসরি আঘাত তাঁর মেশিনগান উড়িয়ে দেয় এবং তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁর অস্ত্রাঘাতে শত্রুপক্ষকে বিরাঁ মাসুল দিতে হয় এবং জীবিত শত্রুরা বেসামাল অবস্থায় পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরযোদ্ধা এই তরুণ ল্যান্সনায়েকের নাম মুন্সি আবদুর রব।

মুন্সি আব্দুর রব ১৯৪৩ সালের মে মাসে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার অন্তর্গত সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সি মেহেদী হোসেন এবং মাতার নাম মোসাম্মৎ মুকিদুননেসা। এঁরা খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন। মেহেদী হোসেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও ধর্মীয় শিক্ষক ছিলেন। আব্দুর রব তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি আরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁরা অভাব অনটনে পড়লে তিনি তৎকালীন ই.পি.আর (বর্তমানে বি.ডি.আর)-এ ভর্তি হন। তিনি ঢাকার পিলখানায় সামরিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন মাঝারি মেশিনগান বিভাগের এক নম্বর মেশিনগান চালক। স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রাথমিক দিনগুলোতে আব্দুর রব ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাঁটালিয়নের সাথে সংযুক্ত থেকে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যুদ্ধ করেছিলেন।

যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি জাতি বেঁচে থাকবে পৃথিবীতে, ততদিন ল্যান্সনায়েক মুন্সি আব্দুর রব বীরশ্রেষ্ঠর কথা আমরা ভুলব না।

বাংলাদেশে স্বাধীনতার জন্য অসমসাহসিক বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আরেকটি উজ্জ্বল তারিখ ২০ আগস্ট, ১৯৭১। এই দিনে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে বাংলার আরেক বীর সন্তান ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান শাহাদাত বরণ করেছিলেন। সে এক অপূর্ব কাহিনী, রূপকথা যেন।

সেদিন ছিল শুক্রবার, স্থান পাকিস্তান বিমান বাহিনীর মসরুর ঘাঁটি। সকাল দশটা সতেরো মিনিটে মূল দালানের ফ্লাইং ইউনিট থেকে বেরিয়ে এল রশিদ মিনহাজ। একজন তরুণ ফ্লাইং অফিসারের সঙ্গে একজন ইস্ট্রাকটর। টি-৩৩ বিমানগুলো যেখানে পার্ক করা ছিল, সেদিকে তাঁরা হেঁটে গেলেন।

রশিদ একটি বিমানের ককপিটে প্রবেশ করল। তার পিছনে ইনস্ট্রাকটর। নিজের পালা এলে রশিদ ছুটে গেল রানওয়ের দিকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হল কুয়াশার ভিতরে।

অল্পক্ষণ পরেই বিমানটি নেমে এল মাটিতে এবং রশিদ বিমানটিকে ট্যাকসিং করে নিয়ে গেল যথাস্থানে।

ইনস্ট্রাকটর এগিয়ে এলেন। তিনি ছাত্রের উড্ডয়ন কৌশল দেখে সন্তুষ্ট হয়েছেন। রশিদকে তিনি দ্বিতীয়বার আকাশে একক-উড়ালে যেতে বলে ওদিকে চলে গেলেন। টাওয়ার থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকল রশিদ মিনহাজ।

কন্ট্রোল টাওয়ার অনুমতি দিল। ওদিকে তখন অপর ইনস্ট্রাকটর মতিউর নিজের গাড়িতে উঠলেন এবং এগিয়ে চললেন।

টেক অফের জন্য মূল রানওয়েতে যাওয়ার আগে দশ গজের মতো একফালি জায়গা পেরিয়ে যেতে হয়, যার কিছুটা ছোট্ট পাহাড়ের আড়ালে পড়ায় কন্ট্রোল টাওয়ারের দৃষ্টিগোচর হয় না।

অনুমতি পেয়ে রশিদ মিনহাজ এগোতে লাগল প্রধান রানওয়ের দিকে। মতিউরের গাড়ি এল, ট্যাকসিং ট্যাক দিয়ে ঘুরে ঘুরে রশিদের বিমানকে ছাড়িয়ে গেল। তারপর একটা নিপুণ মোড় নিয়ে থেকে যায়। বিমানের পুচ্ছের দিকে সংকেত করেন মতিউর। তিনি রশিদকে জানালেন বিমানের পুচ্ছের দিকে কিছু গোলমাল আছে। বিমানটি থামাল রশিদ। মতিউর তাঁকে বিমানের অসুবিধাঁটা সম্পর্কে অবহিত করার ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু নিমেষে ঘটে গেল অন্য ব্যাপার। মতিউর লাফিয়ে উঠলেন পাখায়, মুখটা বাড়িয়ে দিলেন রশিদের কাছে-ইঞ্জিনের গোলমাল সম্পর্কে যেন কিছু বলবেন। কিন্তু আসলে সে কৌশলমাত্র। নিমেষে তিনি দু আসন-বিশিষ্ট বিমানটির পিছনের আসনে লাফিয়ে পড়লেন। সেই সঙ্গে রশিদের স্পীকার ও হেডফোন থেকে রেডিও টেলিফোনসূত্র বিচ্ছিন্ন করতে লাগলেন। অক্সিজেনের নলেও ছটকা মারেন। তারপর অপূর্ব দক্ষতায় মতিউর রশিদ মিনহাজকে ক্লোরোফরম করেন এবং বিমানটির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নেন। বিমানটি ট্যাকসিং ট্যাক ছাড়িয়ে প্রধান রানওয়েতে গিয়ে আকাশে উড়ল।

পরবর্তী ঘটনা এইরূপ। বিমানের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ নিজের হাতে নিয়ে তাকে গাছের মাথার ওপর দিয়ে চালিয়ে তীব্রবেগে উড়ে যেতে লাগলেন ভারতীয় সীমান্তের দিকে। সীমান্তে এসেও গেল, চার মিনিটের কম উড্ডয়নপথের দূরত্ব। কিন্তু পূর্ণ হল না মতিউরের সাধ, রূপ নিতে পারল না স্বাধীন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গড়ে তোলার গোপনে লালিত পরিকল্পনা। মরু অঞ্চলে এসে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

হতে পারে বিমানটি গুলি খেয়ে ভূপাতিত হয়েছিল কিংবা হতে পারে এ একটি দুর্ঘটনা। কিন্তু মতিউর মৃত্যুবরণ করেছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের জন্ম হয় ১৯৪৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকা নগরীতে। তাঁর পিতা আবদুস সামাদ নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার রামনগর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। মায়ের নাম সৈয়দা মুবারকুন্নেসা খাতুন। তাঁদের নয় ছেলে, দুই মেয়ে। মতিউর অষ্টম সন্তান। মতিউর ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ষষ্ঠ শ্রেণী পাস করার পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সারগোদায় পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে ডিস্টিংশনসহ প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। অতঃপর বি এ এফ কলেজ থেকে বাষট্টি সালের ডিসেম্বরে কমিশন লাভ করে জেনারেল ডিউটি পাইলট হন।

ছোঁবেলা থেকে পশ্চিমে মানুষ হয়েছেন বলেই যেন বাংলাদেশের প্রতি মতিউরের ছিল আশ্চর্য অনুরাগ। একাত্তর সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ঢাকায় আসেন ছুটিতে, তখন সারাদেশে গণজাগরণের জোয়ার। পঁচিশে মার্চ দুপুরের গাড়িতে তিনি গ্রামের বাড়ি রামনগরে যান তাঁর মাকে দেখতে। পঁচিশে মার্চের ঘটনা তাঁকে ভীষণ উত্তেজিত করল। তিনি দৌলতকান্দিতে জনসভা করলেন, ভৈরববাজারে গেলেন বিরাঁ মিছিল নিয়ে। ভৈরববাজার আক্রান্ত হলে তিনি বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই.পি.আর-এর সঙ্গে থেকে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করেন। ভারতে গিয়ে বাংলাদেশে বিমান বাহিনীর ভিত্তি স্থাপন তাঁর স্বপ্ন ছিল, কিন্তু এখানে ছিল জঙ্গি বিমান লাভের অনিশ্চয়তা। ভৈরব-আশুগঞ্জের ওপর বিমান আক্রমণের দৃশ্য দেখে তাঁর মাথায় এল নতুন চিন্তা। তিনি ঠিক করলেন কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে একটি জঙ্গি বিমান দখল করবেন এবং সেটা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবেন।

মতিউর সাফল্যলাভ না করলেও তাঁর বিমান দখলের ঘটনা পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতিতে এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি জাতি বেঁচে থাকবে, ততদিন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান বীরশ্রেষ্ঠর কথা আমরা ভুলব না।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের আরেকটি স্মরণীয় দিন ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১। এই দিনে বাংলাদেশের আরেকজন বীর সন্তান আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। তিনি ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ।

তখন সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরাঁ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। শত্রুপক্ষের প্রবলতর আক্রমণের মুখে মুক্তিবাহিনীর মরণপণ প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সেক্টরে। ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ যশোর আঁ নম্বর সেক্টরে সাবেক ই.পি.আর এবং বাঙালি সেনাদের নিয়ে গঠিত একটি কোম্পানিতে যুদ্ধ করছিলেন। সেদিন তিনি গোয়ালহাটি গ্রামের সম্মুখে একটি স্থায়ী টহলে মোতায়েন। সঙ্গী ছিলেন আরও চারজন সৈন্য। তাঁরা ঘুটিপুর ঘাঁটিতে পাকিস্তানি বাহিনীর গতিবিধির ওপর নজর রাখছিলেন। শত্রুরা এগিয়ে এল, তাদের লক্ষ্য ছিল বিপজ্জনক অবস্থার মুখে টহলদারী সৈন্যদের ফাঁদে ফেলা। সেই জন্য তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ থেকে ঘুরপথে তিন দিক দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। আমাদের টহলদারীদের প্রধান অস্ত্র একটি হাল্কা মেশিনগান। নানু মিয়া নামক একজন সিপাহি তা ব্যবহার করছিলেন। লড়াই বেঁধে গেল। মারাত্মকভাবে আহত হলেন নানু মিয়া। তাঁর পক্ষে এল.এম.জি চালানো সম্ভব ছিল না। ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ মুহূর্তেই সেটা হাতে তুলে নেন।

একটি কৌশল অবলম্বন করলেন তিনি। মুক্তিবাহিনীর অবস্থান ও শক্তি সম্পর্কে মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্য তিনি সহযোগীদের নিয়ে বার বার অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকেন। সেই সঙ্গে আহত নানুকেও বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময়ে তিনি নিজেই মারাত্মভাবে আহত হয়ে পড়েন শত্রুর মর্টার বোমার স্প্লিন্টারের আঘাতে।

মৃত্যু আসন্ন জেনে তিনি সিপাহি মোস্তফা কামালকে নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান এবং আহত সিপাহি নানু মিয়াসহ টহলদারী মুক্তিসৈনিকদের রক্ষা করার জন্য তাঁকে ফেলে রেখে সরে যেতে বলেন। উপায়ান্তর না দেখে ওঁরা তাই করলেন, কিন্তু একটি এস.এল.আর রেখে যান মারাত্মক আহত কমান্ডারের কাছে। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে নিকটবর্তী ঝোপে নূর মোহাম্মদের মৃতদেহ দেখতে পান তাঁরা। শত্রুর বেয়নেটের নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত দেহ। তাঁর চোখ দুটি কোঁর থেকে উপড়ে ফেলেছিল শত্রু সৈন্য। ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ যে অসাধারণ শৌর্যবীর্য, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং তাঁর সহযোগী সৈনিকদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করেন, তার তুলনা নেই। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ বীরশ্রেষ্ঠ ১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নড়াইল জেলার মহেশখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আমানত শেখ এবং মায়ের নাম মোসাম্মৎ জেন্নাতা খানম। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন। ১৯৫৯ সালের ১৪ মার্চ তারিখে নূর মোহাম্মদ তৎকালীন ই.পি.আর-এ ভর্তি হন এবং প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা সমাপনান্তে ১৯৫৯ সালের ৩ ডিসেম্বর দিনাজপুর সেক্টরে বদলি হন। সেখান থেকে ১৯৭০ সালের ১ জুলাই যশোর সেক্টর হেড কোয়ার্টারে বদলি হয়েছিলেন।

যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি জাতি যতদিন বেঁচে থাকবে পৃথিবীতে, ততদিন বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদের কথা আমরা ভুলব না।

কাহিনী সংক্ষেপ

যাঁদের সুমহান আত্মত্যাগে দেশ স্বাধীন হল তাঁদের একজন মুন্সি আব্দুর রব। রাঙামাটি ও মহালছড়ির সংযোগপথে তখন মুক্তিবাহিনীর প্রধান অবস্থান।। সেখানে পাকিস্তানি বাহিনী প্রচণ্ড শক্তিতে আক্রমণ চালায়। তরুণ ল্যান্সনায়েক মুন্সি আব্দুর রব সেখানে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। শত্রু বিপর্যস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। তরুণ ল্যান্সনায়েক এখানেই মর্টারের আঘাতে নিহত হন।

প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে পাকিস্তানে ছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান। দেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য কৌশলে বিমানের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে ছুটে চলেন ভারত সীমান্তের দিকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য মতিউরের সীমান্তের কাছাকাছি বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। শাহাদত বরণ করেন মতিউর রহমান।

ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ যশোরে যুদ্ধরত ছিলেন। সেদিন তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গতিবিধির উপর নজর রাখছিলেন। তাঁর সঙ্গে মাত্র চারজন সহযোদ্ধা। এমন সময় যুদ্ধ বেধে গেল। সঙ্গী আহত হলে নূর মোহাম্মদ নিজের হাতে এল এম জি তুলে নেন। আহত সঙ্গী ও সহযোদ্ধাদের কৌশলের সঙ্গে ফিরিয়ে আনার সময় মর্টারের আঘাতে আহত হন। সঙ্গীরা নিরাপদে চলে গেলেন। নূর মোহাম্মদকে পরবর্তীতে পাকিস্তানিরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. ১৯৭১ সালের কোন দিনটিকে লেখক দুঃসাহি প্রতিরোধের রক্তাক্ত তারিখ বলেছেন?
   ক. ২২ জুন খ. ৮ মে
   গ. ২০ এপ্রিল ঘ. ২৬ মার্চ

২. ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রব কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
   ক. ১৯৪৩ সালে খ. ১৯৪১ সালে
   গ. ১৯৩৮ সালে ঘ. ১৯৩৫ সালে

৩. ১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট কে দেশ মাতৃকার জন্য জীবনদান করেছিলেন?
   ক. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান খ. বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর
   গ. সিপাহী মোস্তফা কামাল ঘ. এম এ জি ওসমানি

৪. ফ্লাইট মতিউর রহমানের বিমানটির কি হয়?
   ক. সীমান্ত পার হয়ে যায় খ. বিধ্বস্ত হয়
   গ. ঘাঁটিতে ফিরে আসে ঘ. পাহাড়ে বাধাগ্রস্ত হয়।

৫. আহত সঙ্গীর এস এম জি নিয়ে কে অস্ত্র চালনা শুরু করেন।
   ক. সহকারী সঙ্গী খ. মতিউর রহমান
   গ. হামিদুর রহমান ঘ. ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন।

১. ক. ২০ এপ্রিল ২. ক) ১৯৪৩ সালে ৩. ক. ফ্লাইট লেপটেন্যান্ট মতিউর রহমান ৪. খ. বিধ্বস্ত হয় ৫. খ. ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ.

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- হামিদুর রহমান, মোহাম্মদ রুহুল আমিন ও মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

সিপাহি হামিদুর রহমান বীরশ্রেষ্ঠ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আরও একটি সোনালি পাতা সংযোজন করেছেন। সেদিন ছিল ২৮ অক্টোবর, ১৯৭১। হামিদুর রহমান প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ইউনিটে সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গল থানার সীমান্ত চৌকির নিকটবর্তী একস্থানে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর একটি শক্তিশালী অবস্থানের কাছে চা বাগানের ভিতর দিয়ে ক্রলিং করে শত্রু পক্ষের অধিনায়কসহ কয়েকজন জোয়ানকে সামনা-সামনি গুলি করে হত্যা করেন। সেই মুহূর্তেই সামনের দিক থেকে শত্রুর একটি বুলেট তাঁর কপালে বিদ্ধ হয় এবং তিনি ঘটনাস্থলেই শাহদাত বরণ করেন।

বাংলার অন্যতম বীর সন্তান সিপাহি হামিদুর রহমান ১৯৫৩ সালের দোসরা ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার খোরদা খালিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা আক্কাস আলি মন্ডল এবং মা কায়সুন নেসা। তাঁদের দুঃখ দারিদ্র্যের সংসার। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তাঁরা চব্বিশ পরগনা জেলার চাপড়া থানার ডুমুরিয়া গ্রাম ছেড়ে এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। অভাব অনটনের জন্য হামিদ বেশি লেখাপড়া করতে পারেন নি, কিন্তু তিনি ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, খেলাধুলায় তাঁর সুনাম ছিল। সমাজকর্মে, তিনি ছিলেন সকলের অগ্রণী। সততা ও চরিত্রমাধুর্যে সকলের ভালবাসা অর্জন করেছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালের দোসরা ফেব্রুয়ারি তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি

বাহিনীর আক্রমণের পরে মাত্র একদিনের জন্য তিনি বাড়িতে এসেছিলেন মায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। ফিরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধে।

যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি জাতি বেঁচে থাকবে পৃথিবীতে, ততদিন সিপাহি হামিদুর রহমান বীরশ্রেষ্ঠের কথা আমরা ভুলব না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সামগ্রিকভাবে একটি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম। এতে শ্রমিক-কৃষক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-শিক্ষক সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তেমনি অংশগ্রহণ করেছিলেন সৈন্যবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর বাঙালি বীর সন্তানেরাও। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মোহাম্মদ রুহুল আমিন বীরশ্রেষ্ঠ।

রুহুল আমিন পাকিস্তান নৌবাহিনীর চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালে বাঙালিদের প্রতি তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের তাৎপর্য অনুধাবন করেন। একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তিনি চট্টগ্রামের নৌঘাঁটির অধীনস্থ পি.এন.এস. কুমিল্লা গানবোঁ ইঞ্জিনিয়ার অফিসারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক পঁচিশে মার্চের বর্বরোচিত হামলার পর কর্মস্থল ত্যাগ করে তিনি গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন। সেখানে তিনি গ্রামের ছাত্র যুবক ও সেনাবাহিনীর লোকদের সংগঠিত করে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। প্রায় পঁচিশ জন ছাত্র যুবকসহ তিনি মে মাসে আগরতলা সেক্টর হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত হন এবং তৎকালীন মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সেনাবাহিনী প্রধান কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীর নির্দেশক্রমে তিনি ভারত থেকে প্রাপ্ত নৌজাহাজ বি.এন.এস. পলাশ-এ যোগদান করেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের অপর রণতরী বি.এন.এস 'পদ্মা' সহ উভয় নৌজাহাজের স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

সেদিন ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১। মংলাবন্দরে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণকালে 'পদ্মা' ও 'পলাশ' মংলা বন্দর হয়ে আরও অভ্যন্তরে খুলনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। ভৈরব নদী বেয়ে খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছে পৌঁছলে ভারতীয় বোমারু বিমান বোমাবর্ষণ করতে থাকে সেগুলোর ওপরে, ফলে রণতলী দুটিতে আগুন ধরে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ডুবে যায়। বিমান হামলাকালে জাহাজকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানোর সময় রুহুল আমিন তাঁর ডান হাতটি হারান। জাহাজের ইঞ্জিনরুমে আগুন লেগে গেলে জাহাজে রক্ষিত গোলাবারুদগুলো ফুটতে থাকে। তখন তিনি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু তীরে উঠার পর পিছন দিক থেকে রাজাকাররা ক্রমাগত গুলিবর্ষণ করতে থাকলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। রাজাকারদের অমানুষিক নির্যাতনের ফলে অবশেষে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মোহাম্মদ রুহুল আমিন ১৯৩৪ সালের নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাঘচাপটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মোহাম্মদ আজাহার মিয়া এবং মায়ের নাম মুসাম্মৎ জুলেখা খাতুন। তিনি বাঘচাপটা প্রাইমারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি সোনাইমুড়ী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অধ্যয়ন ও জ্ঞানান্বেষণে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল।

মোহাম্মদ রুহুল আমিন ১৯৫১ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে নাবিক হিসেবে যোগদান করেন। নৌবাহিনীর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ এবং প্রকৌশল শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি করাচিতে অবস্থিত পি.এন.এস বাহাদুর ও পি.এন.এস কারাজ নৌঘাঁটিতে কর্মরত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি পাকিস্তান নৌবাহিনীর জাহাজ পি.এন.এস বাবর. পি.এন.এস খাইবার এবং পি.এন.এস তুগ্রিল এ দক্ষতা ও কৃতিত্বের সঙ্গে কর্তব্য পালন করেন। এই সময় তিনি ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে শুভেচ্ছা সফরে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিরহংকার এবং অনাড়ম্বর। তিনি ছিলেন একজন দুঃসাহি যোদ্ধা এবং অনাড়ম্বর। তিনি ছিলেন একজন দুঃসাহি যোদ্ধা এবং অসাধারণ দেশপ্রেমিক।

যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি জাতি বেঁচে থাকবে পৃথিবীতে, ততদিন মোহাম্মদ রুহুল আমিন বীরশ্রেষ্ঠের কথা আমরা ভুলব না।

অবশেষে এল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্ব। বীরের রক্তস্রোত ও মাতার অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে স্বাধীনতা সূর্যের রক্তিম আভা যখন দেখা দিচ্ছে দূরের আকাশে তখন আরেকটি তারিখ জ্বলজ্বল করে উঠল। সেদিন ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১। এই দিনে বাংলাদেশের অসমসাহসী বীর সন্তান ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর দুর্জয় শক্তিতে শত্রুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

তখন তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নির্দেশে চাঁপাইনবাবগঞ্জে সীমান্ত এলাকার সাত নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে কাজ করছিলেন। তাঁর অধিনায়কত্বে মুক্তিবাহিনীর এই অংশ শত্রুর কাছে মহাত্রাস হিসেবে দেখা

দিয়েছিল। তাঁদের আক্রমণের ধারা এত প্রবল ও প্রচণ্ড ছিল যে একবার একটি শত্রু লাইনের ওপর হামলা চালাবার পরমুহূর্তে প্রায় সহস্রাধিক শত্রুসৈন্য প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যায়।

১৩ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর মহানন্দা নদী অতিক্রম করে নবাবগঞ্জের দিকে অগ্রসর হন। ১৪ ডিসেম্বর তিনি শত্রুদের কঠিন ব্যূহ ভেদ করার জন্য দুর্ভেদ্য অবস্থানগুলো ধ্বংস করছিলেন। আর একটি মাত্র শত্রু অবস্থান যখন বাকি ছিল তখন মুখোমুখি সংঘর্ষে বাংকার চার্জে শত্রুর বুলেটের আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

অমর শহীদ ক্যাপ্টেন মহীউদ্দিন জাহাঙ্গীরের মরদেহ ১৪ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে আনা হয়। অগণিত মুক্তিযোদ্ধা, জনগণ ও অসংখ্য মা বোনের অশ্রুতে সিক্ত করে এই বীর সৈনিককে সমাহিত করা হয় সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে।

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর বীরশ্রেষ্ঠর জন্ম হয় বরিশালের রহিমগঞ্জ গ্রামের শ্যামল ছায়ায়। তিনি মুলাদী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ, নিষ্ঠাবান ও বন্ধুবৎসল। তাঁর সতেজ প্রাণের স্পর্শে তিনি সকলকে আপন করে নিয়েছিলেন।

জাহাঙ্গীর ১৯৬৭ সালের ৫ অক্টোবর কাবুলের পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে যোগদান করেন। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর ১৯৬৮ সালের দোসরা জুন তিনি প্রথমে মূলতানের মেলগি সেনানিবাসে সেনা ১৭৩ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাঁটালিয়নে যোগদান করেন। সেখানে ছয় মাস চাকরি করার পর তিনি রিসালপুরে মিলিটারি কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যোগদান করেন। সেখানে সুদীর্ঘ তের মাসের বেসিক কোর্সে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

এরপর তিনি 'বোম্বে ডিসপোজাল কোর্স' করেন এবং কোর অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন সুদক্ষ অফিসার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

একাত্তরে পাকিস্তান বাহিনী যখন বাংলাদেশে তাদের ধ্বংসাত্মক ও ব্যাপক পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছিল, তখন জাহাঙ্গীর কারাকোরামের দুর্গম পার্বত্য এলাকায় পাকিস্তান চীন সংযোগকারী মহাসড়ক নির্মাণে নিয়োজিত ছিলেন। একাত্তরের জুন মাসের দশ তারিখে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে তিনি রিসালপুর ইঞ্জিনিয়ার সেন্টারে যান। সেখানে একদিন মাত্র অপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি সীমান্তরক্ষীদের দৃষ্টি এড়িয়ে ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করেন। পরে বাংলাদেশের সীমান্তে পৌঁছেন।

যতদিন বাংলাদেশ বেঁচে থাকবে, বাঙালি জাতি বেঁচে থাকবে পৃথিবীতে, ততদিন আমরা মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর বীরশ্রেষ্ঠর কথা ভুলব না।

আমরা জানি স্বাধীনতা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে আমাদের সমগ্র জাতির যেমন অবদান রয়েছে, তেমনি আমাদের বীরশ্রেষ্ঠদের অবদানও অপরিসীম। তাঁরা আমাদের সত্তা, আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের গর্ব। আমাদের সম্মুখে এগিয়ে চলার পাথেয় হয়ে থাকবে তাঁদের মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতি। তাঁরা আছেন আমাদের মাঝখানে, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে, আমাদের রক্তধারায়, হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি কম্পনে। একটি শোষণমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য তাঁরা তাঁদের অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে গেছেন। তাঁদের স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়িত করব কঠোর শ্রমে ও সততায়- এই হোক আমাদের নতুন সংগ্রাম।

এই সংগ্রাম শুধু বর্তমানে নয়, অনাগত ভবিষ্যতের দিকে, অন্ধকার থেকে ক্রমাগত আলোর দিকে যাত্রা। পৃথিবীর আর সব মানুষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা এগিয়ে যাব, কোন অপশক্তিই আমাদের রুখতে পারবে না। আমাদের বীরশ্রেষ্ঠদের আদর্শে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরাও হব বীরশ্রেষ্ঠ।

কাহিনী সংক্ষেপ

১৯৭১ এর ২৮ অক্টোবর সিপাহী হামিদুর রহমান শ্রীমঙ্গল থানার একটি সীমান্ত চৌকিতে কর্মরত ছিলেন। তিনি চা বাগানের ভিতর দিয়ে ক্রলিং করে করে সরাসরি শত্রুপক্ষের অধিনায়কসহ কয়েকজন জোয়ানকে হত্যা করেন। সেই মুহূর্তে একটি বুলেট এসে বিদ্ধ হয় তার কপালে। ঘটনাস্থলেই হামিদুর রহমান মৃত্যুবরণ করেন।

রুহুল আমিন নৌবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগদান করেন। বি.এন এস পলাশ ও বি.এন এস পদ্মায় তিনি স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণের কয়েকদিন আগে মংলাবন্দর হয়ে খুলনার দিকে যাত্রা করেছিল। ভারতীয় বোমারু বিমান সেগুলোর উপর বোমাবর্ষণ করে। এক সময়ে জাহাজে আগুন ধরে যায়। রুহুল আমিন জাহাজ দুটি বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন। পরে তিনি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরবর্তীতে স্থানীয় রাজাকারদের নির্যাতনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্বে শহীদ হলেন ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। ১৩ ডিসেম্বর মহিউদ্দিন মহানন্দা নদী অতিক্রম করে চাঁপাইনবাবগঞ্জের দিকে অগ্রসর হন। ১৪ ডিসেম্বর তিনি শত্রুর দুর্ভেদ্য অবস্থানগুলো ধ্বংস করছিলেন। মুখোমুখি বাংকার চার্জের সময় হঠাৎ বুলেটের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। অসীম সাহসী যোদ্ধা মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর আমাদের একজন বীরশ্রেষ্ঠ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. শ্রীমঙ্গল সীমান্তচৌকিতে কর্মরত ছিলেন কে?
   ক. হামিদুর রহমান — খ. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর
   গ. মতিউর রহমান — ঘ. রুহুল আমিন

২. রুহুল আমিন কোন বাহিনীর সদস্য ছিলেন?
   ক. বিমান বাহিনী — খ. নৌবাহিনী
   গ. স্থল বাহিনী — ঘ. সীমান্ত বাহিনী

৩. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কত নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন?
   ক. তিন নং সেক্টরের — খ. পাঁচ নং সেক্টরের
   গ. সাত নং সেক্টরের — ঘ. এক নং সেক্টরের

৪. লেখকের মতে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কী?
   ক. স্বাধীনতা — খ. ধনদৌলত
   গ. সততা — ঘ. দৃঢ়তা

৫. আমাদের বীরশ্রেষ্ঠর সংখ্যা কতজন?
   ক. ৫ জন — খ. ৭ জন
   গ. ৮ জন — ঘ. ১০ জন

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন।

ক. ১. ক. হামিদুর রহমান ২. খ. নৌবাহিনীর ৩. গ. সাত নং সেক্টরের ৪. ক. স্বাধীনতা
৫. খ. ৭ জন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. রচনামূল প্রশ্ন

১. 'বীরশ্রেষ্ঠ' শব্দটির অর্থ কী? বাংলাদেশে কাদের, কি কারণে বীরশ্রেষ্ঠ নামে অভিহিত করা হয়েছে?
২. আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল বাংলাদেশের বীর সন্তানদের যে কাহিনী লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন তার পরিচয় দিন।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশকে কবি কী বলেছেন? বাংলাদেশকে কারা বলেছেন স্বর্গের দরজা?
২. আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অমর শহীদ ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠর নাম লিখুন।

গ. ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. বাংলার বিচিত্র প্রকৃতি বাংলার মানুষকে করেছে কখনও বাউল, কখনও কবি এবং কখনও সংগ্রামী কৃষক।
২. আমরা জানি স্বাধীনতা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
৩. তাঁরা আমাদের সত্তা, আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের গর্ব।

প্রশ্ন : বীরশ্রেষ্ঠ শব্দটির অর্থ কী? বাংলাদেশে কাদের, কি কারণে বীরশ্রেষ্ঠ নামে অভিহিত করা হয়েছে?

উত্তর : 'বীরশ্রেষ্ঠ' শব্দের অর্থ বীরদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য দেশের সর্বোচ্চ খেতাব বীরশ্রেষ্ঠ। এ খেতাব মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মাত্র সাতজন যোদ্ধা অর্জন করেছেন। এঁরা স্বাধীনতার জন্য, এদেশের মানুষের জন্য শুধু মৃত্যুকে বরণই করেননি - মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এ বীর সন্তানেরা যে অকুতোভয় সাহস, বীরত্ব, দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করেছেন তা তুলনারহিত। এদেরই বলা হয় বীরশ্রেষ্ঠ।

স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রতিটি বাঙালিই কোনো না কোনোভাবে অবদান রেখেছেন। তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তে গড়া আমাদের স্বাধীনতা। কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠদের যে আত্মদান তাদের কাহিনী আর সবার চেয়ে উজ্জ্বল। দেশমাতৃকার এই সাতজন বীরসেনানী হচ্ছেন-

(১) সিপাহী মোস্তফা কামাল, (২) ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রব, (৩) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, (৪) ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ, (৫) সিপাহী হামিদুর রহমান, (৬) স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন ও (৭) ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর।

বীরশ্রেষ্ঠ এই সাতজন বীর স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে দেশপ্রেম ও কর্মতৎপরতার পরিচয় রেখেছেন তার তুলনা হয় না। তাঁদের অতুলনীয় অবদানের কথাকে জাতি চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যই তাঁদের বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দান করেছে। নিচে বীরশ্রেষ্ঠরের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের ও অবদানের পরিচয় তুলে ধরা হল।

সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল - ৮ এপ্রিল ১৯৭১ সাল। এদিনে আখাউড়ায় পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড লড়াই হয়। সিপাহী মোস্তফা কামাল অসীম সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেন ও নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে এক কোম্পানি সহযোদ্ধার জীবন রক্ষা করেন।

ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রব - ১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল রাঙামাটি ও মহালছড়ির সংযোগস্থলে প্রচণ্ড লড়াই করেন। সেখানেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান - মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান পাকিস্তানের একটি বিমান নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ - যশোরে যুদ্ধরত ছিলেন ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ। এখানেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। নিজের জীবন দিয়ে সহযোদ্ধাদের বাঁচার পথ করে দিয়েছিলেন।

সিপাহী হামিদুর রহমান : সিপাহী হামিদুর রহমানের অবস্থান ছিল সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গলে। চা বাগানে ক্রলিং করে যেয়ে পাকিস্তানি অধিনায়ক ও কয়েকজন জোয়ানকে হত্যা করেন। পরে সেখানেই তিনি নিহত হন।

রুহুল আমিন - সাহসী নাবিক তার জাহাজ রক্ষার জন্য যখন আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন তখন ইঞ্জিন রুমে আগুন ধরে যায়। তিনি বাধ্য হয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন। পাকিস্তানিদের এদেশীয় দোসর রাজাকারদের নির্যাতনে তিনি মারা যান।

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর : বিজয়ের প্রাক্কালে বীর সৈনিক মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর মৃত্যুবরণ করেন। ১৪ই ডিসেম্বর শত্রুর কঠিন ব্যূহ ভেদ করে যখন তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন শত্রুর গুলির আঘাতে নিহত হন।

আমরা বাঙালি। মুক্তিযুদ্ধের জন্য আমরা গর্বিত। আমরা গর্বিত আমাদের বীর সৈনিক বীরশ্রেষ্ঠদের নিয়ে। যতকাল বাংলাদেশ থাকবে ততকাল বীরশ্রেষ্ঠরা আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন : বাংলাদেশকে কবি কী বলেছেন? বাংলাদেশকে কারা বলেছেন স্বর্গের দরজা।

উত্তর : বাংলাদেশ চিরকালই প্রকৃতির সৌন্দর্যে অপরূপা। এর শস্য শ্যামল মাঠ, এর ঐশ্বর্য এদেশের মানুষকে যেমন তেমনি বিদেশিদেরও চিরকাল মুগ্ধ করেছে। তাই বাংলাদেশকে কবি বলেছেন 'সোনার বাংলা'। আর বিদেশি পর্যটকরা বাংলাদেশকে বলেছেন - স্বর্গের দরজা। স্বর্গে বা বেহেশতে যে অঢেল প্রাচুর্যের কথা বলা আছে তেমন প্রাচুর্য আছে বাংলাদেশেও। তাই একে বলা হয়েছে স্বর্গের দরজা।

গ. ব্যাখ্যা উত্তর

বাংলার বিচিত্র প্রকৃতি বাংলার মানুষকে করেছে কখনও বাউল, কখনও কবি এবং কখনও সংগ্রাম কৃষক।

উত্তর : আলোচ্য অংশটি আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত 'বীরশ্রেষ্ঠদের কথা' নামক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিচিত্র প্রকৃতির দেশ। এদেশের শস্যশ্যামল প্রান্তর, পাখির ডাক, উদাস করা মাঠ চিরকাল মানুষকে করেছে ভাবুক- করেছে কবি। কিন্তু বাংলাদেশের প্রকৃতি কেবল কোমল নয়। এর আছে রুদ্র রূপও। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে তার রুদ্র রূপ বর্ষায় তার ভয়ঙ্করী আকৃতি। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রচণ্ড খরা, আর বর্ষার প্রতিকূলতাকে জয় করেছে। বারেবারে কৃষকের স্বপ্ন ভেঙেছে -ভেসে গেছে ফসলের মাঠ। তবু প্রকৃতির কাছে সে হেরে যায়নি। সংগ্রামী কৃষক জীবনপণ করে প্রকৃতিকে জয় করেছে।

লেখক বাংলাদেশের প্রকৃতির এই কোমল ও রুদ্ররূপকেই দেখেছেন। তাই মন্তব্য করেছেন এদেশের প্রকৃতি মানুষকে করে কবি-ভাবুক, আবার এ প্রকৃতিই এদেশের কৃষককে করেছে সংগ্রামী।